

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রকাশনায়
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৬৫ প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১

মুদ্রণে
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২এ কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদশিল্পী
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রস্তাবনা

বীরভূমের রুক্ষ মাটির দেশের মানুষ তারাশঙ্কর যেদিন বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় সসঙ্কোচ পদার্পণ করলেন, সেদিন তাঁর কোন দাবী ছিল না। আপন সাধনবলে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আসন পাততে তিনি আশাবাদী হলেও, সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় ছিল মনে। কিন্তু 'কল্লোলে'র দপ্তরে পাকা জহুরীর দৃষ্টি নিয়ে বসেছিলেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তারাশঙ্করকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি, তাঁর নিজের ভাষাতেই—

> "রসকলির মত অমন একটি গল্প বাংলাদেশের কথাসাহিত্য পাঠক সমাজকে উপহার দিতে পারার আত্মপ্রসাদে মন আমার ভরে গিয়েছিল। 'আগুন'-এর বেলায় এই কথাই মনে হয়েছিল যে একটি পাবক অগ্নিশিখা তার দীপ্তিতে বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশ আলোকিত করার জন্য প্রকাশোন্মুখ, তার প্রকাশের মুখের সামান্য বাধাটুকু সরিয়ে দেবার সুযোগ আমার এসেছে, সেটি না করলে প্রত্যবায় ঘটবে, উত্তরকালের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো আমি, যদি চ তাতে বসুধাতল থেকে উদিত জ্যোতিপ্রভার আত্ম-প্রকাশ ও আদিগন্ত বিকিরণ আটকে থাকতো না।"[১]

১। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ঃ বন্ধু বৎসল তারাশঙ্কর (কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮) পৃঃ ৫১৫।

অর্ধশতাব্দী ধরে অতঃপর তারাশঙ্করের লেখনী আর বিশ্রামের অবকাশ পায়নি। প্রাথমিক পর্বে যে মৃদু স্বীকৃতি তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল, পরবর্তী কালে ক্রমশ তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছে। পাঠকদের অনুরাগ, সমালোচকদের প্রশংসা তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সম্মান, গুণীজনের স্বীকৃতি, পদক ও পুরস্কার। সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্যায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁকেও অবতীর্ণ হতে হয়েছিল বটে, কিন্তু তবুও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর জীবনের এই বিগত পঞ্চাশ বৎসরকাল আগাগোড়াই একটি আরোহণ পর্ব। উত্তরোত্তর তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে, নানাভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে এবং সাহিত্যিক হিসাবে আমাদের এদেশের কোন পুরস্কার থেকেই তিনি বঞ্চিত হননি। ১৯২৮-এর সেই সলজ্জ আগন্তুক যখন ১৯৭১-এ তিরোধান করলেন, তখন তিনি বাংলা সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট।

সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই তারাশঙ্কর অনায়াসে বিচরণ করেছেন। তাঁর হাতেখড়ি 'ত্রিপত্র' কাব্য দিয়ে—কবিতা, গান পরেও লিখেছেন অনেক। ছোটগল্পে মুন্সীয়ানা ছিল তাঁর যথেষ্ট এবং রসিকজন তাঁর গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন ছোটগল্প পড়েই। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি অসাধারণ গল্পের রচয়িতা তিনি। মঞ্চসফল কয়েকটি নাটকও তিনি লিখেছেন এবং একসময় তাঁর সাহিত্যিক আগ্রহ কেবলমাত্র নাটকেই সীমিত ছিল। গান-কবিতা-ছোটগল্প-নাটকে এই কৃতিত্ব সত্ত্বেও তারাশঙ্কর মূলত ছিলেন ঔপন্যাসিক—পঞ্চাশেরও বেশি উপন্যাস তিনি লিখে গেছেন। তারাশঙ্কর তাঁর টালার বাড়ীতে পড়ার ঘরে বসে একদিন বলছিলেন :

"তোমরা কিন্তু আমায় কবি, ছোট গল্পকার, গীতিকার বা নাট্যকার বলবে না কোনদিন। উপন্যাস লিখতেই আমি

ভালবাসি, সুতরাং আমি মূলত ঔপন্যাসিক। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম লিখে আমি উপন্যাস রচনার পূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছি।"[১]

এই পরিতৃপ্তি তারাশঙ্করের পাঠকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। দেশ, কাল, সমাজ ও জীবনের বিশাল পরিসরে তাঁর উপন্যাসের সযত্ন বিন্যাস—আবেগ ও ভাবালুতার সাথে যুক্ত হয়েছে বাস্তব জীবনের বিশ্বস্ত বর্ণনা এবং তাতে জীবনের সত্য হয়েছে উদ্ঘাটিত। জীবন-জিজ্ঞাসার তীব্রতা, গভীরতা ও ব্যাপ্তি না থাকলে ঔপন্যাসিক সার্থকতা আসে না—উপন্যাস বৃহত্তর পরিধিতে একটি কাহিনী মাত্র নয়, মানবজীবনের শৈল্পিক প্রকাশ—সম্পূর্ণ মানুষ সেই শিল্পের উপজীব্য। তারাশঙ্কর এই সম্পূর্ণ মানুষের জীবনাঙ্কনে, মানবজীবনের সকল সত্যকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন। শিল্পবিচারের নিরিখে তারাশঙ্করের প্রতিটি উপন্যাস অবশ্যই সাফল্য দাবী করতে পারবে না, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি স্বধর্মচ্যুত হননি, অর্থাৎ মানব-জীবনের বৈচিত্র্য অন্বেষণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না কোনদিন। পরম মমতায় তিনি বাস্তব জীবন থেকে তাঁর বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন।

বিশেষ যুগের বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক আলেখ্যই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। "তারাশঙ্করের রচনাবলী একটা বিরাট সামাজিক উপপ্লবের ইতিহাস। বহু প্রকারের বহু চরিত্র তাঁহার উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। সকলকে লইয়া সমাজের একটি গোটা প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।"[২] উপন্যাস জীবনের চলচ্চিত্র। জীবনপ্রবাহের নিত্যনূতন তরঙ্গের উদ্ভব ও বিলয় সম্পর্কে ঔপন্যাসিক তাই উদাসীন থাকতে পারেন না। জীবনের খণ্ড-বিক্লিষ্ট বহু উপকরণ শিল্পীর চেতনায়-চৈতন্যে

১। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ২১শে মে, ১৯৭০।

২। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়: ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর (কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮) পৃঃ ৫৭৬।

মনে-মননে অবগাহন করে একটি পূর্ণ অবয়ব লাভ করে। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে শিল্পীমানসে যে ক্রমিক প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়, তারই প্রত্যক্ষ পরিণতিতে আমরা পাই তাঁর রচিত উপন্যাস। সমালোচনার দৃষ্টিতে উপন্যাসকে যথাযথ অনুসরণ করতে গেলে তাই শিল্পীমানসের স্বরূপটি সযত্নে লক্ষ্য করতে হয়। মানুষের জীবনের বিচার করতে গেলে প্রকাশের বিভিন্ন স্তরে তার আচরণকে বিশ্লেষণ করে যেমন সামগ্রিক ধারণা লাভ সম্ভব হয়, তেমনি সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে শিল্পীমানসের যে নানা অনুভূতির প্রকাশ থাকে—সেই দৃষ্টি-কোণ থেকেই শিল্প ও শিল্পীকে নিরীক্ষণ করা উচিত। সেইজন্য শিল্পীমানসের ভাঙাগড়ার তরঙ্গ অনুসরণ করে তাঁর শিল্পকর্মের সম্যক অনুধাবন অতি সঙ্গত।

তারাশঙ্করের উপন্যাসকেও এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিচার করা বাঞ্ছনীয়। যে-কোন খাঁটি শিল্পীর মতই তারাশঙ্করের উপন্যাসেও তাঁর জীবন ও রচনার আত্মিক যোগসূত্র দৃষ্টিগোচর হয়। যে পারিবারিক, গ্রামীণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁর জীবনে বিস্তারলাভ করেছিল, শিল্পীমানসের বিবর্তনেও সেই প্রভাব প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের যথাযথ অনুধাবনে এবং তাঁর রচনাবলীর উৎস ও ক্রমবিকাশের সূত্র নির্ধারণে শিল্পী ও শিল্পকে তাই সমসাময়িক দেশকাল, পরিবেশ ও সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকায় সংস্থাপন করা প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। গ্রন্থের নাম যথাক্রমে ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ ও ‘তারাশঙ্কর’। ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ ‘বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়ে’ আধুনিক ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশঙ্কর সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন। সম্প্রতি ডঃ নিতাই বসু ‘শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের

সামাজিক চেতনার তুলনামূলক বিচার' এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা শেষ করেছেন। অবশ্য তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে 'তারাশঙ্করের শিল্পীমানস' নামে কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে। তারাশঙ্করের রচনার বৈচিত্র্য ও সংখ্যাবাহুল্য সম্পর্কে সাহিত্য-রসিক মাত্রই অবগত আছেন। এই বিভিন্ন স্বাদের রচনাবলীর আলোচনার সুযোগও আছে যথেষ্ট। বর্তমান আলোচনার বিষয় "ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর"। তারাশঙ্করের উপন্যাসের আঙ্গিক, গঠন-প্রণালী ও কলাকৌশল বর্তমান আলোচনায় স্থান পায়নি। এই বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এখানে তারাশঙ্করের শিল্পীমানসের কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবধারা ও উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে তাঁর উপন্যাসগুলির মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, তারাশঙ্করের সাহিত্যের মূল্যায়ন এখানেই শেষ হবে না। কালের অগ্রগতিতে, সময়ের ব্যবধানে, সাহিত্য বিচারেরও তারতম্য হয় এবং সমালোচক নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেন। তখন সাহিত্যেরও নব নব মূল্য নির্ধারিত হয়। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না আশা করা যায়। এই গ্রন্থের সীমিত পরিসরে তারাশঙ্করের উপন্যাসের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ অনুসারে পরবর্তী অধ্যায়গুলি সংযোজিত হয়েছে, তারাশঙ্করের উপন্যাস এখানে রচনাকাল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়নি।

১। রচনাকালের পটভূমিকা:

তারাশঙ্কর প্রধানত যুগসন্ধির লেখক, এই সন্ধিপর্বের উত্থান-পতন, আরোহণ-অবরোহণ নিরীক্ষণ করার সুযোগও পেয়েছেন তিনি। এই যুগসন্ধির দেশ-কাল-সমাজ তাই তাঁর উপন্যাসের নেপথ্য নায়ক। এই দেশ-কালের পটভূমিকাটি না জানলে তাঁর উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ ক'টি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। প্রথম অধ্যায়ে তারাশঙ্করের

রচনাকালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, সমসাময়িক কালের সঙ্গে প্রতিটি মানুষই কিছু অংশে একাত্মবোধ করে। ভ্রূণ যেমন গর্ভাশয়ে নির্দিষ্ট কাল বন্দী থেকে তবেই তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষও তেমনি তার সমসাময়িক কাল থেকে পুষ্টি-অপুষ্টি, স্বাস্থ্য-ব্যাধি আহরণ করে নিয়ে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সাহিত্যিকও তাঁর সাহিত্যকর্মে সেই কালপরিক্রমার অভিজ্ঞতাটি সংযোজিত করেন নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। তাঁর চৈতন্যের প্রস্তুতি-পর্বে দেশ-কালের সক্রিয় ভূমিকাটি কেউ অস্বীকার করবে না। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে এই কথাটি অতিমাত্রায় সত্য।

২। পরিবার ও পরিবেশ—সাহিত্যজীবনে প্রবেশ :

বৃহত্তর পরিধিতে যেমন দেশ ও কাল, ক্ষুদ্রতর পরিধিতে তেমনি পরিবার, পরিজন, গ্রাম, সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব সাহিত্য-জীবনে প্রবেশপথের দ্বারটি উন্মোচিত করে। কথাসাহিত্য মাত্রই এই কারণে অন্তত কিছুটা আত্মজীবনীর উপাদানযুক্ত বলা চলে। লাভপুরের গ্রামীণ পরিবেশে ক্ষুদ্র জমিদার তারাশঙ্কর বৈচিত্র্যময় জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। নানা স্বার্থ, নানা শ্রেণী, নানা সম্প্রদায় ও নানা আদর্শের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে গ্রামীণ জীবনে সেকালে যেসকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তারাশঙ্কর স্বয়ং তার অংশীদার ছিলেন। পরিবার-পরিবেশের আলোচনা তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রেক্ষাপট হিসাবেই তাই প্রয়োজনীয়।

৩। যুগসন্ধির প্রতিফলন :

সামন্ততন্ত্রের ক্রমক্ষীয়মাণ ধারাটি ধনতন্ত্রের আক্রমণে বিলুপ্তির সম্মুখীন, ঐতিহ্যবাদী ভাবধারা ও আধুনিক জীবনধারার মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে, কালসন্ধিক্ষণের এই যন্ত্রণা তারাশঙ্কর সাগ্রহে লক্ষ্য

করেছেন এবং সন্ধিলগ্নের এই সংশয়কেই তিনি উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই প্রাচীন-নবীন দ্বন্দ্বটি তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিবৃত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু কখনো বা বিশ্বাস বনাম জ্ঞান, কখনো হিংসা বনাম অহিংসা, জমিদার বনাম ব্যবসায়ী, আয়ুর্বেদ বনাম আধুনিক চিকিৎসা এবং প্রাচীন সংস্কার বনাম নবীন বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা।

৪। রাজনীতি-চিন্তা ও সমাজ-চিন্তা ঃ

তারাশঙ্কর রাজনীতি সংসক্ত ছিলেন এবং তাঁর নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তারাশঙ্করের জীবনে যেমন সাহিত্যেও তেমনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শটি একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর কি বক্তব্য ছিল, এবং উপন্যাসে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেই আলোচনাও এখানে অপরিহার্য মনে হয়েছে।

৫। আঞ্চলিকতা—রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি ঃ

তারাশঙ্করের উপন্যাসের আঞ্চলিকতা পরবর্তী আলোচ্য বিষয়। রাঢ়ভূমির পথে-প্রান্তরে তারাশঙ্কর একসময় পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ অভিজ্ঞতা অর্জনে রাঢ়ের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতিই সহায়তা করেছে। রাঢ়ভূমির লেখক তারাশঙ্করও তাই একনিষ্ঠ আবেগ নিয়ে এই অঞ্চল, এই মানুষ ও এই প্রকৃতিকে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সাহিত্যে মর্যাদা দিয়েছেন। এই বিশেষ অঞ্চলের প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও আগ্রহ তাঁকে রাঢ়দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ইতিহাসের ভাষ্যকার করে রেখেছে। আঞ্চলিকতা তাই তাঁর উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৬। অধ্যাত্ম-চিন্তা ঃ

সমাজ, অর্থনীতি, দেশ, কাল ইত্যাদি জটিল চিন্তায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের ভাবজগতে ঈশ্বর সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন জেগেছে। দীর্ঘকাল তিনি অস্তিবাদ ও নাস্তিবাদের সমস্যায় পীড়িত বোধ করেছেন এবং অবশেষে এক বিশেষ উপলব্ধির স্তরে পৌঁছেছেন। তারাশঙ্করের উপন্যাসেও এই চিন্তাধারাটি কখনো কখনো কেন্দ্র-ভূমিতে স্থাপিত হয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই চিন্তা উপন্যাসেরও গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুতরাং উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ হিসাবেই তাঁর ঈশ্বরচিন্তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

———

প্রথম অধ্যায়

রচনাকালের পটভূমিকা

"আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।"[১] তারাশঙ্করের জন্ম ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯৭১-এ। এই দীর্ঘ তিয়াত্তর বছর কাল বাংলা তথা ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যুগসন্ধিকালের পটভূমিকাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকালের পটভূমিকা। সমাজ ও রাজনীতিতে যখনই আন্দোলন, আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তখন তারাশঙ্করকে নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে সক্রিয় অংশ নিতে হয়েছিল। কি রাজনীতিতে, কি সামাজিক আচরণে, কি সাহিত্যচিন্তায়—তারাশঙ্কর কেবল ভাববিলাসে আত্মনিমজ্জন করে স্বস্তি পাননি। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর জীবনে কতগুলি বিশিষ্ট ভাবধারার ভিত্তি রচনা করেছিল। তাঁর সাহিত্য কীর্তিতেও এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কালপরিবর্তনের এই চিত্র এঁকেছেন তারাশঙ্কর নিজেও—তাঁর বক্তব্য রেখেছেন নানা জায়গায় নানাভাবে।

> "১৮৯৮ সাল। ভারতবর্ষের দিক্‌দিগন্তে উড়ত তখন ইউনিয়ন জ্যাক, ভারতেশ্বরী তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া, লোকে বলত মহারাণীর রাজত্ব, বাংলাদেশ তখন জেলায়, মহকুমায়, থানায় ভাগ হয়েছে, শিকলের ছাঁদে ছাঁদে বাঁধা এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান পড়লে শিকলের সবখানে সব কড়াগুলো ঠন ঠন শব্দে বেজে ওঠে"[২]...তখনকার কালের মানুষ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কালের কথা পৃঃ ২১৭।

২। " " পৃঃ ৪।

ইংরাজের রাজত্বে ইংরিজী সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদরে গভীর বেদনার সঙ্গে ভাল মন্দ যা কিছু অতীত কালের সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুরাণো পুঁথির দপ্তরে বেঁধে ভাঙা পেটরায় পুরে নূতনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মন্দ ছিল প্রচুর।...[১]

"......আমাদের সমাজের যেসব মানুষ স্বল্প আয়, কিছু কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা চালিয়ে আসছিলেন—তাঁরা অকস্মাৎ সম্মুখীন হলেন এক অভিনব সভ্যতার, যার ফলে অবশ্যম্ভাবী আরম্ভ হয়ে গেল এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লব উপস্থিত হলেই বিপর্যয়ের দুঃখ শুরু হয়, সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ ছিল বাইরের জগতে গিয়ে—যে জগৎ গ্রামের অর্থ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করে আনা, কিন্তু সে শিক্ষা ছিল না, সাহসও ছিল না। সে আমলের সুখীর অন্যতম সংজ্ঞাই ছিল অপ্রবাসী। সেই কারণে প্রবাসবাস ছিল দুঃখদায়ক এবং সংসারে যা দুঃখদায়ক তাই ভীতির বস্তু। আর শুরু হয়েছিল শিক্ষাবিপ্লব। যাঁরা ইংরিজী জানতেন না তাঁদের সম্মুখে বাইরের জগতের পথ ছিল রুদ্ধ, অন্তত তাঁরা তাই মনে করতেন, অথচ ব্যক্তিত্বের যোগ্যতায় তাঁরা আজকের দিনের উচ্চপদস্থের চেয়ে হীন কি অক্ষম ছিলেন না। একালের শিক্ষা তাঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হলে সমান কৃতিত্বের পরিচয় তাঁরা দিতে পারতেন। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে এইসব মানুষই অসহায় হয়ে একমাত্র দৈব বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, বিশ্বাস ছিল না নিজের উপর, ভরসা ছিল না রাজশক্তির উপর, সুতরাং একটা ভরসাস্থল ছাড়া মানুষ বাঁচে কি করে? ধর্মের অবস্থা তখন বিকৃত, এইকালে ধর্মের বিকৃত অবস্থাটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই অসহায় মানুষ ক্ষুদ্রতম দুঃখের জন্য দেবতাকে মানত করেছে।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—আমার কালের কথা পৃঃ ২২-২৩

…এককালের নগর ভেঙে পড়ল জীর্ণ হয়ে, তার চারিপাশের উপবনগুলি সংস্কারাভাবে হয়ে উঠল অরণ্য, সেই অরণ্য শিকড় গজিয়ে ফাটিয়ে ফেললে নগরীর বসতি, দেওয়ালের সেই ফাটলে ফাটলে উড়ে এসে পড়ল গাছের বীজ, প্রাসাদের বসতির মাথায় মাথায় জন্মালো বনস্পতি—তারই মধ্যে যে মানুষের দল বাস করছিল, তাদের চোখে একদা প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এলো যখন নূতন কাল, তখন চোখ তাদের ধেঁধেঁ গেল।”[১]

বঙ্গভঙ্গ ও নূতন কালের সূচনা ঃ

সেকাল থেকে একালে উত্তরণেব ঐ আদিপর্বে তারাশঙ্করের শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল। বাংলাদেশে এই নূতন কালের প্রারম্ভ সূচিত হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রতিরোধ-কালে। “এল ঝড় এল নূতন, এল আমার কালের নূতন কাল। ১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন। বাঙালীর জীবনে—ভারতবর্ষের জীবনে সে একটি মহামহিমময় দিন। এমনদিন জাতির জীবনে দেশের ইতিহাসে বহুশত বৎসরে একবার আসে।”[২] ১৯০৫ সালে তারাশঙ্করের বয়স মাত্র সাতবৎসর তবু রাখীবন্ধন একটা স্থায়ী প্রভাব ফেলে যায় তাঁর শিশুমনে। “আমার চোখে সেদিনের সে জাগরণের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে।”[৩]

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব উপলক্ষ করে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নবজাগরণের ঢেউ উঠল, বঙ্গভঙ্গ একটি অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত, এর নড়চড় হবে না—লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন। স্যার
থ প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন, ‘আমরা এ সিদ্ধান্ত

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা পৃঃ ৪৪-৪৫।
২। ” ” পৃঃ ১৪৩।
৩। ” ” পৃঃ ১৪৪।

পাল্টাবোই'। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সামনে এসে দাঁড়ালেন, টাউন হলের সভায় ভাষণ দিলেন, রাখীবন্ধনের আহ্বান জানালেন, গাইলেন :

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে, যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

তারাশঙ্করের বাবা তাঁর ডায়েরীতে লেখেন ৩০শে আশ্বিন— "বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন।"[১] কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকল জাতিই কি সমান বেদনা অনুভব করেছিল ? সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, না, প্রতিরোধ আন্দোলনটা ছিল হিন্দুদের—

—"The agitation was Hindu and drew its strength from the Bhadralok. It was keenly resented by the Mohammedans who form the majority of the inhabitants of Eastern Bengal and thus throughout the year 1906-1907 Hindu and Mohammedans relations became exceedingly strained in that Province."[2]

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে বঙ্গদেশে মুসলমান প্রজাদের যে সক্রিয় সহযোগিতা ছিল না, সে সংবাদটি এই দিনলিপিতে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারদের কর্তৃত্বাধীন—এরা মুখ্যত কলিকাতা-কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দু জমিদার। বংশে, ধনে-মানে, জ্ঞানে-গুণে সমাজের শিরোমণি ! "বৃটিশ শাসনের প্রবর্তনের পর বুর্জোয়া নগর সভ্যতার

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা পৃঃ ৩৮।

2. Report, Sedition Committee—.918. P. 19

আকর্ষণ নিঃসন্দেহে তৎকালিক আকর্ষণ এবং ভূম্যধিকারীরা দ্বিতীয় আবাসস্থল করে তুলেছিলেন কলিকাতা শহরকে এবং কে অস্বীকার করবে এই জমিদার শ্রেণীই সেদিনকার বঙ্গসংস্কৃতির আধার এবং আশ্রয় ছিল ?"[১] অতএব যাহা জমিদার, তাহাই বঙ্গীয়, ভারতীয় এবং হিন্দুও বটে। লাভপুরের ক্ষুদ্র জমিদারও তাই সম্ভবত বঙ্গ, হিন্দু ও ভারত সব কটাকে একই সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। ৩০শে আশ্বিনের কথা বলেছেন, আবার হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত করার প্রার্থনা জানাচ্ছেন একই সাথে —"হে বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি, জগদীশ্বর— হে জগজ্জননী, অসুরদর্পদলনী মা—একবার তোমাদের চিরআশ্রিত শরণাগত ভারতসন্তানগণকে—যাহাদের জন্য তোমরা যুগে যুগে এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া পাপের নাশ করিয়াছ পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ—অসুর প্রাদুর্ভাব দলন করিয়াছ···তাহাদের শক্তি দাও, তাহাদের হৃদয়ে পুণ্যের আলোক প্রজ্বলিত কর। সত্যধর্ম হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত কর।"[২]

১৯০৫-এর এই রাখীবন্ধন-অনুষ্ঠান বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং তারাশঙ্করের জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিভ্রান্তি এই সময়েরই একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যার ফলে সহজেই মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জন্ম নিতে পেরেছিল। মুসলিম লীগের জন্মের তারিখ ১৯০৬, প্রধান উদ্যোক্তা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খান। এর পশ্চাতে ছিল প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ রাজশক্তি। রাজশক্তির অনুগ্রহভোগী বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে রাজদ্রোহী মানসিকতার বিস্তার প্রথম একটি অবয়ব নিতে পারল এই ১৯০৫-এ। তারাশঙ্কর

১। পুলকেশ দে সরকার: সেই বঙ্গভঙ্গ আর এই (শারদীয়া কম্পাস, ১৩৭৬) পৃঃ ৩৫।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কালের কথা পৃঃ ৩৮।

শৈশবে রাজাদেশে তাঁর পিতাকে নিগৃহীত হতে দেখেছেন। এর প্রতিকার ক্ষমতা তাঁদের মত ক্ষুদ্র ভূস্বামীর তখন ছিল না। অপমানে দুঃখে ক্রোধে তিনি তাই দেবতার দ্বারে এর বিচার প্রার্থনা করেছিলেন কেবল। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ যখন রদ হলো, তখন রাজার আদেশ প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা যে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের আছে—একথা প্রমাণিত হলো। তারাশঙ্করের শৈশবের পিতৃনিগ্রহের ব্যক্তিগত দুঃখের ঘটনাটি তাই অতি সহজেই রাজার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে সেদিন যোগসূত্র স্থাপন করল।

১৯০৫ সালে লাভপুর গ্রামের জমিদাররা "বন্দেমাতরম্" থিয়েটার পত্তন করলেন, নূতন ড্রপসিন আঁকানো হল, তাতে আঁকা ছিল মাঝখানে ভারতমাতা "দুইপাশে তার হিন্দু মুসলমান একই মায়ের দুই সন্তান।"[১] এই ছবি দেখে মনে হয় যে, বিচ্ছিন্ন দুই ভারতসন্তান হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত করার জন্য তখন ভারত-মাতা অর্থাৎ কোন বিশেষ ঐশী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং প্রচেষ্টাও চলছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬-এ, মুসলিম লীগের অভ্যুদয়, ১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেস, চরমপন্থী আর নরমপন্থীর প্রকাশ্য সংঘাত। ১৯০৮ সালে প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম শহীদ হলেন, বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের যুগ—মানিকতলা আলিপুর ঢাকা ষড়যন্ত্রের কাল। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে রাসবিহারী বসু, যতীন মুখার্জীর ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাকাল। বাঙালী জাতীয়তাবাদ তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পুরোভাগেও ছিলেন তখন বর্ণহিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণী। বিপ্লববাদীদের হিন্দুয়ানা তাই পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছিল। তাঁদের আরাধ্যা ভারতমাতা, গীতা স্পর্শ করে কালীমাতার মূর্তিকে সাক্ষী

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা পৃঃ ১৬৪

রেখে তাঁরা বিপ্লববাদে দীক্ষা নিতেন। আনন্দমঠ তাঁদের আদর্শ, বন্দেমাতরম্ তাঁদের মন্ত্র, ভক্তি তাঁদের প্রেরণার উৎস।[১] এর প্রতিচ্ছবি তারাশঙ্করের রচনায়ও আছে।

ফলে বাঙালী ভদ্রলোকের মানসিকতায় প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে গেল। বিবেকানন্দের প্রভাবে বাঙালী যুবচিত্ত তখন উদ্বেলিত, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জেগেছে তখন—হিন্দু-পুনর্জাগরণের তরঙ্গে উচ্ছল বাংলাদেশ। মোট কথা নব্য হিন্দুবাদ তখন বেশ জোরদার এবং লাভপুরেও এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঢেউ এসে দোলা দিয়েছে।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চবিত্ত ভারতীয়েরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েন। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সমর্থন ছিল, কারণ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত এই জাতীয়তাবাদীদের কোন রাজবিরোধী ভূমিকা ছিল না। ধনিক শ্রেণীই মুখ্যত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিল এবং মোটামুটিভাবে সংস্কারপন্থী আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা সীমিত ছিল। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের কালে জমিদাররা, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের জমিদাররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, হিন্দু রাজনীতিজ্ঞ ও সংবাদপত্রসমূহের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদীদের বৈরিতারও সূত্রপাত হলো এর থেকেই। লাভপুরের ভূস্বামিগণও এই কলহের প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে পারেননি।

জমিদারী প্রথা ঃ

তারাশঙ্কর লাভপুরের এক অস্বচ্ছল জমিদার পরিবারের সন্তান —"বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও

১। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১২৬-১৫৫।

আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য। দশ হাজার টাকা আয় যাঁদের তাঁরা রাজাতুল্য ব্যক্তি। আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত আট হাজার। কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম। সমারোহ প্রচুর।"[১] "এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।"[২] এই বিরোধের প্রসঙ্গে জমিদারী প্রথা ও ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব সম্বন্ধে, বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক, কেন না, তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই বিষয়টি পুনঃপুনঃ উত্থাপিত হয়েছে।

ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে প্রথম যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে ব্রিটিশ আমলে। নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজারা জমির উপর কখনোই মালিকানা আরোপ করেননি কিংবা কাউকে স্বত্বাধিকারীও করেননি। তাঁরা ভূমিরাজস্ব আদায় করেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাধিকার দিতেন তাঁদের বিশ্বস্ত লোকদের। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে প্রথম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন—বংশানুক্রমিক জমিদারী প্রথার সূচনা হল তখনই। ৩০শে চৈত্র সূর্যাস্তের আগে সরকারের দেয় রাজস্ব খাজাঞ্চিখানায় জমা করতে তাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। সময়মত এই লাটের খাজনা জমা না পড়লে তাঁদের জমিদারী নীলামে উঠত। জমির প্রতি বা প্রজাদের প্রতি আইনত তাঁদের কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। জমি ও জমিদারী তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত হল—যা বিক্রী হয়, নীলাম হয়, বন্ধক রাখা যায়। এছাড়া "The new revenue system introduced by the British in India superseded the traditional right of the village community over the village land and created two forms of property in land ; landlordism in some parts of the

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমার কালের কথা পৃঃ ৬।
২। " " পৃঃ ৬।

country and the individual peasant proprietorship in others. ...Thus private property in land came into being in India Land became private property, a commodity in the market which could be mortgaged purchased or sold."[1]

গ্রামীণ সমাজ বা পঞ্চায়েত, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যে স্বয়ংনির্ভর কাঠামোকে ভিত্তি করেছিল, জমিদারী প্রথা তা ক্রমশ ভেঙে দিতে শুরু করে। গ্রাম্য সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যাবতীয় কর্তৃত্বভার ফলে একসময় জমিদারী কাছারীতে প্রবেশ করল—রাজানুগ্রহভোগী জমিদার তখন প্রজা বা রায়তদের অনুগ্রহ করছেন। ব্রিটিশ সরকারের ফরমান তখন গ্রামের জনসাধারণের কাছে জমিদারের মাধ্যমে আসতে আরম্ভ করেছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক কূপমণ্ডুকতার এই নিঃশব্দ বিদায় প্রগতির পথে একটি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ। এতে নানাদিক থেকে সমাজে গতিশীলতা সঞ্চারিত হল—

"History moves dialectically. Progress is achieved not through the quantitative extension of the good aspects of the old but its qualitative transformation. Higher forms of co-operation and social existence emerge not through the quantitative expression of old, forms but by their dissolution. It is true that the capitalist transformation of the village economy was brought about by the destruction of village co-operation but its historical progressive role lies in the fact that it broke the self-sufficiency of the village

1. Desai, A. R. : Social Background of Indian Nationalism, p. 38.

economic life and made the village economy a part of the unified national economy. It was a historically necessary step towards integrating the Indian people economically. It simultaneously broke the physical, social and cultural isolation of the village people by creating the possibility of large scale social exchange through the establishment of such means of mass transport as roadways and automobiles."[1]

মহাজনী শ্রেণী :

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে গ্রামসমাজে কৃষকরা চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কেবলমাত্র জমিচাষের অধিকার ভোগ করত—কৃষিভূমি হস্তান্তরের অধিকার তাদের ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উপর জমিদার ও কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বারানসী ও মাদ্রাজে জমিদারী প্রথা থাকাতে ঐসব স্থানে তারা ছিল জমিদারের রায়ত—অন্যত্র তারা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের রায়ত হল, জমির ফসল ভাল হোক বা না হোক, অজন্মা হোক বা না হোক, কি পরিমাণ জমি চাষ হয়েছে বা হয়নি এইসব কোন বিচার-বিবেচনা ছিল না। প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট সময়ে দেয় খাজনা জমা দিতে কৃষকরা বাধ্য ছিল, ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থে সে খাজনা মিটাতে হত। জমি বিক্রয় করা, বন্ধক রাখা ইত্যাদিও তখনই শুরু হয়। কারণ ফসল বিক্রয় করে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ কষ্টকর বলে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হত। মহাজন নামক বিত্তবান সুদভোগী এক শ্রেণীর আবির্ভাব সেই সূত্রেই। কালক্রমে এই মহাজন শ্রেণীই ঋণদাতা হিসাবে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে কৃষকের জমি গ্রাস করে।

1. Desai, A. R. : Social Background of Indian Nationalism, p. 48.

"Though the classes of money-lenders and merchants existed in the rural area of Pre-British India, their function and position in the old economy, were substantially different from those in the new economy. The money-lender in the old Indian Society played almost an insignificant role. He occasionally lent money to the village agriculturist or artisan, the interest strictly fixed by the village Panchayet. Further the money-lender could not annex the land or live-stock in case a farmer did not meet the interest claim since the land belonged to the village community.'[1]

সুতরাং প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের মহাজনদের ঋণদানের ভূমিকাটি স্বতন্ত্র ছিল। জমিদারী ব্যবস্থায় মহাজনরা সর্বপ্রকার সুযোগ গ্রহণ করল—"মহাজনগোষ্ঠী ক্রমশ কৃষক সমাজে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকে। সেই দুই ভূমিকা হইল একদিকে কৃষকের প্রয়োজনীয় ঋণের একমাত্র সরবরাহকারী এবং অন্যদিকে একচেটিয়া শস্য ব্যবসায়ীর ভূমিকা, মহাজনের নিকটে ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষককে অর্থসংগ্রহ করিতে হয় এবং মহাজনই তাহার ঋণ ও উহার সুদের দায়ে ফসল হস্তগত করে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ব্যবসা মহাজনগোষ্ঠীর একচেটিয়া হইয়া পড়ে,···নূতন ব্রিটিশ শাসনে ঋণের দায়ে ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকায় ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমিজমা মহাজনের গ্রাসে পতিত হইতে থাকে,···মহাজন-গোষ্ঠীরা এক নূতন প্রকারের ভূস্বামী শ্রেণীতে পরিণত হয়।"

কিন্তু এক সময় জমিদারদেরও এই সকল মহাজনদের শরণাপন্ন হতে হল। ভূ-সম্পত্তি ভাগবিভাগের ক্রমিক প্রক্রিয়ার কয়েক

1. Desai, A.R. : Social Background of Indian Nationalism, P. 177.

২। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস—পৃঃ ৯।

পুরুষ পর তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এত হ্রাস পেল যে, মহাজনরা তাদেরও রক্ষাকর্তা হয়ে উঠল। এই মহাজনরা তাদের নিরাশ না করে ভবিষ্যতে তাদের দেউলিয়া হবার পথ প্রশস্ত করে তুলল এবং বহুক্ষেত্রে ঋণদায়ে জর্জরিত জমিদারী আত্মসাৎ করল। যতদিন পর্যন্ত জমিদাররা মহাজনদের কাছে হাত পাততে বাধ্য না হন ততদিন কৃষি অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক অনুপ্রবেশের এই দুটি উপকরণ জমিদারী ও মহাজনী, পরস্পরের পরিপূরক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রচুর বিত্তবান হয়েও তেজারতি পেশার মহাজনরা কিংবা শহরের চতুর ব্যবসায়ীরা আভিজাত্যের কাঙাল ছিলেন, জমিদাররা তাঁদের কাছে হাত পাতলেও মাথা নীচু করতেন না, বরং কারণে-অকারণে উপেক্ষাই করতেন। তারই প্রতিশোধ ওঁরা যথাসময়ে নিলেন, প্রাচীন জমিদারদের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ঋণগ্রস্ত করে ধীরে ধীরে সেই সম্পত্তি গ্রাস করলেন, জমিদারী প্রথার সঙ্গে মহাজনী পুঁজির অনুপ্রবেশ বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

জমিদারী সঙ্কট—সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র ঃ

বাংলা তথা ভারতের অতীত রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল মনে হোক না কেন ১৭৯৩ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। সে সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হল জমি, সমাজপতি ও জমিদার। গ্রামীণ জীবন ছিল অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ—সে সমাজে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে একটা সঙ্গতি ছিল। সেই সঙ্গতি অবশ্যই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনভিত্তিক সঙ্গতি, যার ফলে প্রজারা ক্রমাগত জমিদারী নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। জমিদার পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের প্রত্যেকটি বেহিসাবী খরচ অথবা প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে তাঁর রায়তদের উপর ইচ্ছেমত খাজনা ধার্য করতে

পারতেন –এই নবধার্য খাজনার পুরোপুরিটা তাঁরাই ভোগ করতেন। কোন লভ্যাংশই ব্রিটিশ সরকারের প্রাপ্য হত না, বরং পরিবর্তে কৃষক অসন্তোষের মুখোমুখি মোকাবিলা তাদের করতে হত। ১৮৫৯ ও ১৮৮৫-তে পরপর সংঘটিত কয়েকটি কৃষকবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার সাধন করে ইচ্ছেমত খাজনা-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা-নিষেধ আরোপ করা হল কিন্তু কার্যত এতে সমস্যার কোন সমাধান হল না। এদিকে দখলী জমির হস্তান্তর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। ১৮৪২ সালে ভারতে কোন ভূমিহীন কৃষক ছিল না। ১৮৭২ সালে ভারতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ এবং আরোও পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বাংলাদেশের কৃষিকার্যরত ব্যক্তিদের শতকরা ৩০ ভাগই দেখা গেল ভূমিহীন কৃষক। অর্থাৎ একশ্রেণীর কৃষকরা বিক্রীত হয়ে জমি থেকে উৎখাত হচ্ছে এবং ভূমিহীন সর্বহারার দলকে বাড়িয়ে তুলছে। এই জমি গিয়ে ঢুকছে লোভী জমিদার অথবা মহাজনদের হাতে। উৎখাত হওয়া কৃষকদের অধস্তন রায়ত অথবা ভাড়াটে কৃষিমজুর ও ভাগচাষী হিসাবে কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। অধস্তন রায়তরা জমিদার বা মহাজনদের হস্তান্তরিত হওয়া তাদের নিজস্ব জমির উপরই উচ্চহারে খাজনা দিয়ে চাষ আবাদ করে। তাদের মধ্যে সাহসী যারা তারা তখন গ্রাম ছেড়ে শহরে কল-কারখানায় শ্রমিক হয়ে আসতে শুরু করে জীবিকার সন্ধানে।[১]

জমিদার বনাম ব্যবসায়ী :

ব্রিটিশ সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, জমিদার শ্রেণী ও তাদের সহযোগী মহাজনগোষ্ঠী ও উপস্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধান হবে। যতদিন পর্যন্ত

১। বদরুদ্দিন ওমর: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, পৃঃ—২৬-২৮।

জমির সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, ততদিন পর্যন্ত তারা যথার্থই ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই ক্ষুদ্র জমিদার বা মধ্য শ্রেণী থেকেই একটি নূতন শিক্ষিত সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি হল—যারা ক্রমবর্ধমান কৃষিসঙ্কট, ব্রিটিশ শোষণের বৃদ্ধি ও শিক্ষিত বেকারদের দুর্দশার অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে ক্রমশ একটি স্বাধীন জাতীয়তাবাদী ভূমিকা নিতে যত্নবান হয়। অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তাদের মোহভঙ্গ হতে থাকে। এমনকি জমিদার শ্রেণীর এক বৃহৎ অংশের মধ্যেও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগে।

ব্রিটিশ সরকার ভারতের অর্থনীতিতে দেশী মূলধনের স্বাধীন বিকাশে ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। ফলে মুখ্যত ক্রয়-বিক্রয় ও মহাজনী ব্যবসা দিয়ে মুনাফা লুণ্ঠনের মাধ্যমে বিত্ত সঞ্চয় করে ব্রিটিশ মূলধনের প্রতিযোগী একটি ধনিকশ্রেণী আবির্ভূত হয় আরও পরে। ভারতীয় মূলধনী শ্রেণীর সহযোগী রূপে বৃত্তি-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও বিকাশ একই সঙ্গে এবং এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতীয় অর্থনীতির স্বাধীন বিকাশের প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার লুণ্ঠনের এক সহযোগী করে ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, আবার মহাজনদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল এই ভূস্বামীরা। অবশেষে এই ভূস্বামীদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল মহাজনরা। তাছাড়া শহরের ধনী ব্যবসায়ীরাও অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইল জমিদারী ক্রয় করে, কারণ শিল্প উদ্যোগ থেকে প্রাপ্য মুনাফার উপর আয়কর নির্ধারিত হলেও কৃষি ও জমিদারীর উপর আয়কর সে পরিমাণ ছিল না বা তাতে কড়াকড়িও তেমন ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে অর্থ নিয়োগ করাতে তাই তাদের তেমন উৎসাহ ছিল না। এইজন্য তারা জমি বা জমিদারী ক্রয় করে নিশ্চিন্ত হতে চাইল।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত জমি যখন নানাজনের হাত বদল হচ্ছে তখন যেসকল জমিদার মহাজনী বৃত্তি গ্রহণ করেননি তাঁদের অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় অনেক জমিদার আত্মরক্ষার্থে ব্যবসায়ে নেমেছিলেন যেমন অনেক ব্যবসায়ীরা জমিদারী কিনেছিলেন। তারাশঙ্কর কর্তৃক উল্লিখিত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রমাণ। দেশে জমিদারী থাকলেও তাঁর মূল কয়লার ব্যবসায় ছিল কলিকাতায়। এছাড়াও তারাশঙ্কর গ্রামের নব অভ্যুত্থিত ধনীর উল্লেখ করছেন যিনি মুসলমান জমিদারের জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। তারাশঙ্কর লিখেছেন যে, জমিদারপ্রধান লাভপুর গ্রামে ক্ষুদ্রায়তন জমিদারী ও স্বল্প আয় নিয়ে বহু জমিদার ছিলেন। এই সময়ে গ্রামের এক দরিদ্র সন্তান ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে কয়লার ব্যবসায়ী হয়ে প্রভূত ধন উপার্জন করে জমিদারী কিনলেন। শুরু হল ব্যবসায়ী আর জমিদারের দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর জানিয়েছেন—

> "সামন্ততন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার, সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।"[১]

সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এই দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সত্য। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় ব্রিটিশরাজকৃত বিবিধ সংস্কারে এবং শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাপে জমিদারদের ক্ষমতা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক যে সমাজব্যবস্থায় কৃষিজীবী সম্প্রদায় অভ্যস্ত ছিল তাও ক্রমশ ভাঙনের কবলে পড়ে, বনেদী ধনী অনেক জমিদারদেরই তখন অস্তিত্ব নাশ হবার উপক্রম হয়। ব্যবসায়ী অথবা গ্রামের সুদখোর মহাজন এই সময় তাদের স্থান অধিকার

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা—পৃঃ ১২

করতে এগিয়ে আসে। জমির সঙ্গেও এসব নবোদিত ব্যবসায়ী বা মহাজনদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। ফলে তাদের প্রতি রায়তের আনুগত্যও ছিল না। নূতন ধনীদের উপর অতৃপ্ত রায়তরা অভিজাত জমিদারদের প্রতিই বরং অনুগত থেকে যায়। তখন প্রাচীন জমিদার ও তাদের অনুগত রায়তদের সঙ্গে অর্থাৎ সামন্ত-তন্ত্রের বাহক সমুদয় শক্তির সঙ্গে নূতন এই পুঁজিবাদের প্রতিনিধিদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতেও তখন নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারাচাঁদ এই সংঘাতের কথা স্বীকার করে লিখেছেন—

There was consequently a clash of interests between the two classes and what is more, there is nothing in common between them. The new landlords, in most cases were businessman who purchased land in search for profitable investment of surplus funds. They were unfamiliar with the affairs of cultivation and were uninterested in the work of agricultural improvement.[1]

শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে অল্পবয়স থেকেই তারাশঙ্করকে জমিদারী দেখাশুনা করতে হয়েছে। তিনি প্রজার কাছে খাজনা আদায় করেছেন, সুদ নিয়েছেন, খাজনা বৃদ্ধি করেছেন, কাছারীতে মহাজন বসিয়ে রেখেছেন। যে প্রজা খাজনা দিতে পারছে না তাকে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য করেছেন। সেই টাকা তারাশঙ্করের জমিদারীতে খাজনা হিসাবে জমা হয়েছে। শরীক জমিদারদের কাছারীতে গিয়ে দেখেছেন সেখানে তারা নিজেরা মহাজনী করেন। ধান, টাকা সুদে ধার দেন। বিধবা ভ্রাতৃবধূকেও সামান্য টাকার জন্য মূল্যবান জমি ছেড়ে দিতে হয়।

1. Tarachand, History of the Freedom Movement in India. P. 296.

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন সমাজের অর্থনৈতিক উচ্চস্তরের ভাবলোকবিহারী, শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে থেকে জমিদারী প্রথার সঙ্কট ও বিলুপ্তি কল্পনা করেছেন—কিন্তু বাংলার অর্থনৈতিক জীবনকে এইসব প্রথা কিভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, তা তেমন লক্ষ্য করেননি। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল বলে তারাশঙ্করই সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও কালের চৈতালী ঘূর্ণিতে তাঁকে পড়তে হয়েছে। দুর্বল ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের দুরবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, এদের এই বিপন্ন অবস্থার জন্য তিনি নিজেও ব্যথিত হয়েছেন। লক্ষপতি ব্যবসায়ীর আভিজাত্য কামনা তীব্র ছিল বলেই হয়ত তারাশঙ্করের বিবাহ স্থির হয় কয়লার ব্যবসায়ীর পরিবারে। লক্ষপতিরা তখন জমিদারী সেরেস্তাকে পরিবর্তন করতে আসছেন। তখন নব্য সভ্যতার উন্মেষ কাল নয় কেবল—তাতে তেজ সঞ্চারিত হতে চলেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনী পুঁজির সন্তর্পণ অনুপ্রবেশ, তারাশঙ্করের অজানা ছিল না। জমিদার ও সামন্ততন্ত্রের ভস্মস্তূপের মধ্যে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে নব্য ব্যবসায়ীদের ক্রমবর্ধমান মূলধন। ভারতীয় ধনতন্ত্র তখন ভ্রূণাবস্থায়, কিন্তু স্বগ্রামের চেনা লোককে সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হতে তিনি দেখেছেন। ঐতিহ্যাশ্রয়ী জমিদারী আভিজাত্যের এ নিঃশব্দ বিদায় তাঁর মনঃপূত না হলেও এই বস্তুগত অবস্থা তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে।

স্থবির সমাজে ভাঙন ঃ

বাংলা তথা ভারতের গ্রাম্যজীবন স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল নিস্পন্দ, নিস্তরঙ্গ। গ্রামীণ সমাজের কর্তৃত্ব ছিল প্রচণ্ড—সামাজিক অনুশাসন ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। রাজ্যের ভাঙাগড়া, ভাগবিভাগ নিয়ে

গ্রামের অধিবাসীরা ১৯০৫-এর আগে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। গ্রামটি অখণ্ড আছে কিনা, সেটাই ছিল তাদের চিন্তা—কোন শক্তির কাছে গেল এই নিয়ে তারা তেমন বিব্রত বোধ করেনি, তাই গ্রামের অভ্যান্তরীণ সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থেকে গেছে বরাবর।

তারাশঙ্করের শৈশবে ১৯০৫-এ গ্রামীণ সেই আত্মকেন্দ্রিক জীবনের অবসান ঘটতে শুরু করেছে। ভাঙার প্রক্রিয়াটা আগে থেকেই চলছে. লাভপুরে তার ঢেউ এসে পৌঁছুতে সময় লাগবে বৈকি। ইংরাজ শাসন, তার অবাধ বাণিজ্য-চেতনা, তার বাষ্পীয় যান ও যন্ত্রশিল্পহেতু ক্ষুদ্র গতানুগতিক অনড় অচল সামাজিক সংস্থাগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। নূতন কালের হাওয়ায় সমাজ ভাঙছে—অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং প্রচলিত প্রাচীন সামাজিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করে চলার মানসিকতা গড়ে উঠছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বুকে আঘাত করছে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অস্তাচলগামী সামন্ততন্ত্র তার নিশ্চিত মৃত্যুর পদধ্বনি তখন শুনতে আরম্ভ করেছে —ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপস করে চলতে চাইছে। গ্রামীণ কৃষককে শোষণের জন্য যে সকল পুরাতন সামাজিক নিয়মকানুন প্রয়োজন, সেগুলি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র টিঁকিয়ে রাখতে চাইছে,—তার সঙ্গে চাপান হচ্ছে ধনতান্ত্রিক শোষণের নূতন জোয়াল, এই উভয় চাপে গ্রামীণ মানুষের সমাজ, অর্থনীতি সমস্তই বিপর্যস্ত ও সমস্যাকুল। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জীবনের সর্বত্র ভাঙনের লক্ষণ প্রকট। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবী তখনও এমন স্পষ্ট করে দেখা দেয়নি-- চেতনার মান তখনও নিম্নস্তরে, সাধারণ মানুষের সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্য তখনও নিঃশেষিত নয়।

সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক, শোষণের যুগপৎ চাপে পিষ্ট হয়ে "এই সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ

সামাজিক সংগঠনগুলি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার অতল সমুদ্রে, সংগে সংগে এই সমস্ত গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যদের কাছে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রাচীন সভ্যতাও জীবিকা অর্জনের বংশানুক্রমিক উপায়। এটা দেখতে মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন,...এই সব শান্ত সরল গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, তারাই চিরকাল প্রাচ্য দেশগুলিতে স্বৈরাচারের ভিত্তি হয়ে রয়েছে, মানুষের চিন্তাধারাকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, করে রেখেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত মহিমা এবং ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। একথাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এই হীন অনড় ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটি হিন্দুস্তানে পরিণত হয়েছে এক ধর্মপ্রথায়। এই ছোট ছোট গ্রামগোষ্ঠীগুলি জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাইরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তি রূপে।”[১]

তারাশঙ্করের কাল একাল আর সেকালের এই সন্ধিক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধেব সময়ে তিনি তরুণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পরিণত-বুদ্ধি-লেখক। ১৯১৪—১৯৩৯—দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী এই সময় স্থবির সমাজে ভাঙনের কাল, তারাশঙ্করের দেখার কাল, প্রস্তুতি পর্যায়। এই পঁচিশ বছরে সমাজে অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে প্রবল

১। মার্কস-এঙ্গেলস: উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে: পৃষ্ঠা ৩৭—৪৩।

পরিবর্তন হয়েছে, গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়ে, শক্তি-মদমত্তরূপে আবির্ভূত হয় শিল্প-সভ্যতা। বৃত্তিনির্ভর এক মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর জন্ম হল এই সূত্রেই, এরা সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণাতে বিশ্বাস হারাতে লাগল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের সংস্পর্শে এসে। এবং যেহেতু প্রাচীন গ্রামীণ সমাজের কোন কর্তৃত্ব এদের উপর ছিল না তাই কৃষিনির্ভর একান্নবর্তী পরিবারের যৌথবাস ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগল। অর্থের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মানুষ অনুভব করতে শিখল যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির সংস্পর্শে এসে। এক সময় মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল ভগবান, গুরু, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও নীতিজ্ঞান—নূতনকালের মানুষের সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেল। 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর, কিছু নাই ভবে পূজা করিবার' একথা একালের শহরবাসী, নূতন ভাবধারাসম্পন্ন মানুষেরা অস্বীকার করতে আরম্ভ করল, বেদ তখন তারা পড়ে না, ব্রাহ্মণও বৃত্তিতে-ব্যবসায়ে সমপ্রতিদ্বন্দ্বী, রাজা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শুরু করেছে। জমিদার গলিত নখদন্ত, মহাজনের সঙ্গে ক্ষমতায় প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনীতি তখন মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে—দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে। "পল্লী জীবন ও পল্লী সমাজ জীর্ণ হয়েছে, ভেঙে পড়তে গিয়ে কোনক্রমে সেই ভাঙা কাঠে বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিঁকে রয়েছে কায়ক্লেশে—শ্মশান আসছে এগিয়ে—জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ তাড়ন, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।"[১] "ছোট জমিদার বংশে আমার জন্ম—আবার কংগ্রেসকর্মী এবং আমার মা দিয়েছিলেন এক বিচিত্র ন্যায়-অন্যায়বোধের ধারণা, তাই গ্রামে গ্রামে কখনও

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব)—পৃঃ ৪৮

খাজনা আদায় উপলক্ষে, কখনও সেবাধর্ম উপলক্ষে ঘুরবার সময় গ্রামের অবস্থা আমার চোখে বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল,··· আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু —শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভাবটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথরোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে, চিতা জ্বালাতে হবে, শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি, একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে চলবে না। দুটোকে একসাথে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।"[১]

কিন্তু সমাজ তো উপরের সৌধমাত্র, মূল ভিত্তি অপরিবর্তিত রেখে তা পালটানো যায় না। তারাশঙ্কর যে ক্ষুদ্র ভূস্বামী শ্রেণী থেকে এসেছেন, তাদের মধ্যেও সামাজিক, অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আগ্রহ ছিল না এমন নয়। যে সামাজিক ধারাকে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে বহন কবে আসছিলেন তা নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট গৌরববোধও ছিল। ভারতীয় ধনতন্ত্রের যে বিকাশ তখন অর্থনীতির সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, প্রারম্ভে ভূস্বামীগোষ্ঠীই ছিলেন তার উৎসাহী সমর্থক। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের বিশ্বস্ত সহযোগী, ব্রিটিশ সরকারের নীতিই "বর্তমান ভূস্বামী ও জমিদারগণকে সম্পত্তিচ্যুত না করিয়া ভূসম্পত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত মধ্য শ্রেণীর শ্রমবিকাশের সকল সুযোগদান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়, এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যখন ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সম্পদশালী হইয়া উঠে, তখন তাহারাও তাহাদের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব)—পৃঃ ৪৮।

সুযোগদানকারী শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া পারে না, কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর (অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর—সু. রা.) অধিকাংশ এবং প্রধানতঃ ইহাদের (মধ্য শ্রেণীর—সু.রা.) সন্তুষ্টি বিধানের উপরেই সরকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে।"[১]

সুতরাং ব্রিটিশ রাজশক্তির ইচ্ছানুসারেই জমিদার শ্রেণী ছাড়া 'পত্তনিদার' নামক আর এক মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হয়। এদের মধ্যেও আবার নানাভাগ হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীরা জন্মলাভ করে, ফলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরজীবী উপশ্রেণীর সীমাসংখ্যা ছিল না। লাভপুরের ন্যায় জমিদার-প্রধান গ্রামেও এ জাতীয় নানা উপশ্রেণীর উদ্ভব হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীর সংখ্যা বাহুল্যের কথা তারাশঙ্কর তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন।[২]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই কৃষি সঙ্কট, বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক চাপ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণী ও ভূস্বামীদের মধ্যে ক্রমশ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সন্ত্রাসবাদী ও সংস্কারবাদী এই দ্বিবিধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এই অবরুদ্ধ আক্রোশ তারাশঙ্করদের মত রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী এই বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্ত ভূস্বামী সম্প্রদায় সমাজে ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে যে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতসঞ্জাত বিবিধ পরিস্থিতির ক্রমিক প্রতিক্রিয়ায় তা ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকলে এঁরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন। সাম্রাজ্যবাদী

১। সুপ্রকাশ রায়ঃ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১১ (সরকারী দলিল থেকে উদ্ধৃত)।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমার কালের কথা—পৃঃ ৬।

ইংরাজ শক্তির প্রতিও তাদের অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তখন। ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদের অভ্যুদয় এই পরিপ্রেক্ষিতেই। একটি সামগ্রিক হতাশা থেকে কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসন নয়, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিও তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি তাঁরা নূতন করে আকৃষ্ট হলেন, সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার কবল থেকে ভারতরক্ষার সঙ্কল্প নিলেন। ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রগতিশীল গ্রহণযোগ্য বিষয়কেও তাঁরা অগ্রাহ্য করেন, প্রাচীন সামাজিক অনুশাসন যা সমাজের অগ্রগতিতে বাধা দেয়, ঐতিহ্যের নামে সেই সনাতন ধর্মীয় আচারের চর্চা আরম্ভ হয়। যেহেতু ঐতিহ্যানুরাগী চিন্তাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হল, সেইজন্য সামাজিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনের গুরুত্ব বিচার করে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ-বর্জন করা দুরূহ কাজ। এই পশ্চাৎগামিতা যে আসলে ইতিহাসের গতিকে প্রতিহত করেছে তা বোধগম্য হতেও যথেষ্ট সময় লাগল। ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের আদর্শবাদী অংশও এই ভ্রান্তির কবল থেকে মুক্তি পাননি। তাদের প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্মের ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রাচীন আদর্শের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। প্রাচীনের প্রতি এই আনুগত্য এদের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলে ধর্ম ও নৈতিক পুনরুজ্জীবনের মধ্যে তাঁরা পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন। সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার ইত্যাদির কথা বলা হলেও বাস্তববিচার হয়নি এর। তাই তাঁরা আদর্শ পরহিতব্রতী জমিদারকেই গৌরবান্বিত করেছেন। ভূস্বামী-রাজনীতির নব অভ্যুত্থিত জাতীয়তাবাদের মূলে ছিল স্বদেশপ্রেম এবং হিন্দু তথা ভারতের নৈতিক পুনরুজ্জীবন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে উদ্ভূত ভাবধারার যে সমাজবাদী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতি সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই ধর্মীয় ভাবধারার প্লাবনকে তখন সাম্যবাদ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের পক্ষে অপরিহার্য মনে করা হচ্ছে। তারাশঙ্কর

এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে এবং তাঁর মানসিকতায় এই পটভূমিকার প্রভাব পড়াও স্বাভাবিক। তাই শ্রেণীগত, কালগত, সমাজগত ও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে বিচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবত সহজসাধ্য ছিল না। ফলে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে, উপন্যাসের নানা ভাবধারায় এই কালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

—০—

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিবার ও পরিবেশ ঃ সাহিত্যজীবনে প্রবেশ

তারাশঙ্করের সাহিত্যচিন্তা, সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্যিক ভাবধারা যেহেতু তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত ও পরিণতি প্রাপ্ত, তাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকথাও সাহিত্য সমালোচনা কালে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পারিবারিক জীবনে স্নেহপ্রবণ তারাশঙ্কর বিশাল এক বনস্পতির মত সমগ্র পরিবারটিকে রক্ষা করছিলেন। তাঁর পরিবার ছিল একান্নবর্তী। প্রাচীন একান্নবর্তী পরিবারের আদব-কায়দা, আচার-আচরণ সেখানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল। বাজার সরকার, ঝি, চাকর, ঠাকুর, নানা আত্মীয়-পরিজন নিয়ে পরিপূর্ণ এ সংসারটি প্রাচীন জমিদার বাড়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দিত। জমিদারসুলভ আভিজাত্য বা বনেদীয়ানাও যথেষ্ট ছিল—কলিকাতা শহরের উগ্র আধুনিকতার কোন লক্ষণ সেখানে চোখে পড়েনি। তারাশঙ্কর পরিবারের বিভিন্ন মানুষকে তাঁর স্নেহ, কর্তব্যপরায়ণতা, শাসন দিয়ে পরিচালনা করতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়টি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। চরিত্রে কঠোরতাও ছিল, কিন্তু কাঠিন্যের চেয়ে কোমলতা ছিল অনেক বেশি, যার ফলে ভাবপ্রবণ হয়ে গিয়ে অনেক সময় হয়ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন কিন্তু পরক্ষণেই সেই ক্রোধের চিহ্নমাত্র থাকত না কোথাও। এই ভাবালুতা বা স্পর্শকাতরতা তাঁর ব্যক্তি-মানসের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য—সাহিত্যেও এর ছায়াপাত হয়েছে।

তারাশঙ্কর এক স্বল্প আয়ের জমিদার বংশে জন্মেছিলেন এবং জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই লাভপুরের জমিদারদের অর্থনৈতিক

দুরবস্থা, অসম্মান ইত্যাদি তাঁর পারিবারিক জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছেন। একই সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন তাঁদের আভিজাত্যবোধ—মাটি যে দাপের, বাপের নয়, এ জাতীয় উক্তিতে বিশ্বাস। লাভপুরে তখন যে জমিদার ও ব্যবসায়ীর বিরোধ ছিল তারাশঙ্করের পরিবারকেও তার শিকার হতে হয়েছিল। গ্রামের ব্যবসায়ী ধনী লাভপুরে হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ম্যানেজিং কমিটির সভ্য ছিলেন তারাশঙ্করের বাবাও। স্কুলের থার্ড মাষ্টারকে স্পষ্টভাষিতার অপরাধে হেডমাষ্টার ও সেক্রেটারী অপসারিত করলেন হঠাৎ। সেক্রেটারী ছিলেন স্কুল প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং "…এরই প্রতিবাদে বাবা এবং আর দুইজন কমিটিতে যাওয়া বন্ধ করলেন। হয়তো কেন—নিশ্চয়ই এটা তাঁদের দিক থেকে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের একটা রূপান্তরিত প্রকাশ। অন্যদিকে ইস্কুল প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দিক থেকে বিচার করে অন্যায় দেখতেও পেলেন না, স্বীকারও করলেন না।"[১] এই ঘটনাই অবশেষে এমন রূপ ধারণ করল যে, গ্রামের তিন প্রধান জমিদারকে রাজপ্রতিনিধির আদেশে স্থানীয় সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সামনে স্কুল প্রতিষ্ঠাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল।[২]

এই ব্যবসায়ীর সাথে জমিদারদের অন্য ধরনের প্রতিযোগিতাও তারাশঙ্কর দেখেছেন তাঁর শৈশবে। যেমন জমিদারবাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার সমারোহ হত, ব্যবসায়ী বাড়ীতে হত রাসযাত্রায়, এবং এতে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবই ছিল। জমিদারবাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজায় যাত্রা দুদিন হলে ব্যবসায়ীর বাড়ীতে রাসে মাস-খানেক ধরে ভাগবতের কথকতা ও যাত্রার আসর বসত।[৩] বিরোধ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৬৩-৬৪।
২। " " পৃঃ ৬৪।
৩। " " পৃঃ ৯-১০।

ও দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর পরিবার ও পরিবেশ থেকেই লাভ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে। তারাশঙ্করের বিবাহ হয় ব্যবসায়ী ধনী পরিবারে এবং সেই পরিবারের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক কোন সময়ই খুব মধুর হয়ে উঠতে পারেনি।[১] এর কারণ হিসাবেও ব্যবসায়ী ও জমিদারদের দ্বন্দ্বের কথাই মনে হয়। তারাশঙ্কর লিখেছেন ঃ

> "শ্বশুরকুল আমার কলিয়ারীর মালিক, তাঁরা পড়ো জমিদার ঘরের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার আপিসে, কখনও কয়লাকুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন, প্রতিবারই মাসছয়েকের বেশি লেগে থাকতে পারিনি, পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হইনি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।"[২]

মোটকথা তারাশঙ্কর এই জমিদার ও ব্যবসায়ীর সহাবস্থানকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও গ্রহণ করতে কিংবা সহ্য করতে পারেননি। বরং পড়ন্ত জমিদার হিসাবে নিজ মর্যাদাহানি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সাহিত্য রচনায়ও এই পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক কারণেই প্রভাব বিস্তার করেছে পরবর্তীকালে।

বাংলার অন্যান্য পল্লী অঞ্চলের ন্যায় তারাশঙ্করের গ্রামেও ধর্মানুরাগ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রাবল্য ছিল—শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কৃতির যৌথ স্রোতপ্রবাহে বীরভূম প্লাবিত হয়েছিল। আঞ্চলিকতা সম্পর্কিত অধ্যায়ে এর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

১। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—১৯শে মে, ১৯৭০।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব), পৃঃ ৪৯।

তারাশঙ্করের পরিবারেও এই ধর্মানুরাগ যথেষ্ট ছিল, তাঁরা ছিলেন শাক্ত—শক্তির উপাসক। নিজ বাড়ীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন ঃ

> "আমাদের বাড়ীর পশ্চিমভাগে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ, ছটি শিবালয় নাটমন্দির, দুর্গামণ্ডপ, কালীমণ্ডপ, নারায়ণের মন্দির, তার মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা।"[১]

তাঁর পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাকি বাড়ীতে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা করেছিলেন, নিত্য নারায়ণ সেবারও নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মবিষয়ে নানা সংস্কার ছিল—যার ফলে তারাশঙ্করের মাথায়ও দেবতার নামে মানত করে রাখা চুল ছিল। তারাশঙ্করের পিতা মামলায় পরাজিত হয়ে অসহায়ভাবে বৈদ্যনাথধামে ছুটে গিয়েছিলেন—সাংসারিক বেদনায় সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন দেবতার কাছে।[২] সেকালে বাংলাদেশের নিঃস্ব জমিদার শ্রেণীর ধর্মবিশ্বাস আরো প্রকট হয়েছিল তাদের দুর্বলতার সুযোগে।

> "জমিদার শ্রেণী যতই বিব্রত বিপন্ন হলেন ততই তাঁরা ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। ভগবানের তখন বহু মূর্তি, দেবতা তেত্রিশ কোটি সুতরাং রূপ তাঁর তেত্রিশ কোটিই। ওর মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে মূর্তি ছিল আসলে দুটি। শাক্তমূর্তি আর বিষ্ণুমূর্তি। মোটামুটিই দেখা যাক আর অতি সূক্ষ্মভাবেই বিচার করা যাক ধর্মজীবনে ছিল দুটি পথ বা মত—শাক্ত ও বৈষ্ণব। যুগলবিগ্রহ অর্থাৎ রাধাগোবিন্দ, বাসুদেব, গোপাল, নাড়ুগোপাল, শালগ্রাম-

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার কালের কথা, পৃঃ ২৯।
২। " " পৃঃ ৬৬।

শিলা গৌরাঙ্গ—নিত্যানন্দ—এই ছিলেন বৈষ্ণবদের দেবতা। তাছাড়া দুর্গা থেকে আরম্ভ করে ওলাই চণ্ডী পর্যন্ত সবাই ছিলেন শাক্ত তনখাভোগী, শিবঠাকুর থেকে শুরু করে পুরুষ দেবতারাও এই শাক্ত মতের পথের পাশে বাসা গেড়েছিলেন। গাজনে শিবঠাকুর উঠতেন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ধর্মরাজ, ভাদ্রে ইন্দ্রদেবতা, বিশ্বকর্মা—এঁদের সকলের পূজোতেই পাঁঠাবলির ব্যবস্থা ছিল, ছিল কেন, আজও আছে, সুতরাং ওরা শাক্তের দলে, তবে মা লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এঁরা দুজনে সবারই পূজা এবং এঁরা বৈষ্ণবের দলে, ওঁদের কথা উঠলেই আজও মনে হয়—নারায়ণ বসে আছেন মাঝখানে, দুই পাশে তাঁর দুই প্রিয়তমা লক্ষ্মী আর সরস্বতী। অদৃষ্ট পরিবর্তনের কামনায় মানতের পরিমাণ বাড়তে শুরু করল একদিকে, অন্যদিকে যার অভ্যুত্থান হচ্ছে তিনি বাড়াতে লাগলেন সমারোহ।"[১]

পরিবারে যেমন তার বারমাসে তের পার্বণের ঘটা, গ্রামেও তেমনি ছিল। নানা সংস্কার, আচার-নিষ্ঠা, ধর্মবিশ্বাসে ছিল পারিবারিক জীবন বাঁধা; সুতরাং তারাশঙ্কর জন্মসূত্রেই পেয়েছেন ধর্মবোধ—ধর্মানুরাগ। পারিবারিক আবেষ্টনীতে তা সযত্নে রক্ষিত হয়েছে শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে এই ধর্মচেতনা তাই স্থির ধর্মবিশ্বাসও ঈশ্বর বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে, স্থায়িত্ব লাভ করেছে। তারাশঙ্করের সাহিত্য আলোচনাকালে এই বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে।

তারাশঙ্করের সাহিত্য রচনায় যে বৈচিত্র্যময় পরিবেশ ও বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস, তাতে লাভপুর গ্রামের পরিবেশের অবদান অনস্বীকার্য। শৈশবে কৌতূহলী মানুষের মনে যে সব অভিজ্ঞতার স্পর্শ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৬৮-৬৯।

লাগে তার স্মৃতিচারণে পরবর্তী জীবনে অনেকেই আকৃষ্ট হয় এবং জীবনে এসব ঘটনার অনেক প্রভাবও অনুভূত হয়। লাভপুরের বিচিত্র পরিবেশ-জাত বিভিন্ন স্মৃতি এইজন্যই সম্ভবত তারাশঙ্করকে সাহিত্য রচনাকালেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে—সাহিত্য-সংসারে রস পরিবেশন করতে রসদ জুগিয়েছে। তারাশঙ্কর 'আমার কালের কথা'য় এই বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়েছেন :

> "সকাল থেকে বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে, খঞ্জনী একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দুচারজন ছিলেন, শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন.. মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েং আওড়াতেন, তাঁদের কারও কারও হাতে চামড়ার আবরণীর উপর শিকরে পাখী (বাজপাখীরই একটা ছোট জাত) থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেন— দেশী হাতে তৈরী সারেঙ্গী জাতের যন্ত্র বাজিয়ে কেউ কেউ দেহতত্ত্বের গান গাইতেন.. কেউ কেউ পীরমঙ্গল গাইতেন।"[১]

এছাড়া লাভপুর গ্রামে বেদে, পটুয়া, দেশী যাযাবর, নানা পর্যটক, সাধুসন্ন্যাসী, জ্যোতিষী, গায়ক ইত্যাদির সমাবেশ হত। বিশেষ বিশেষ সময়ে আসত নানা পেশাদার লাঠিয়াল, রোমাঞ্চকর ডাকাতির কাহিনী শোনাত তারা। বৈচিত্র্যময় লাভপুরের দ্বন্দ্ব-বিরোধ, মিলন-বিচ্ছেদ, আভিজাত্য-দম্ভ, ভাল-মন্দ তাঁর শিশুমনকে আন্দোলিত করেছিল এবং পরবর্তীকালে সাহিত্যেও তারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

লাভপুর গ্রামটি তখনকার অন্যান্য গ্রামগুলির তুলনায় অনেকখানি সমৃদ্ধ ছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ উন্নত পরিবেশ বাল্যে তারাশঙ্করের মানসিকতা গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছে। "শিক্ষায় সভ্যতায় সম্পদে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ সত্যই তখন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৭০-৭২।

রথীপদবাচ্য। কিছু জমিদারি—কিছু জমি পুকুর বাগানের মালিক সকলেই।···সচ্ছল জমিদারি—বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, প্রাচীন কালের শিক্ষা ও আভিজাত্যসম্পন্ন কয়েকটি পরিবারও ছিল, কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায়, প্রচুর অর্থ, এমন পরিবারও ছিল একটি, তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা ছিলেন। তাঁরা বারোমাস থাকতেন কলিকাতায়। এ ছাড়া উকিল ছিলেন, চাকুরে ছিলেন কয়েকজন।"[১] তারাশঙ্করের এ বর্ণনা থেকে তাঁর গ্রামেব সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কারণও কিছুটা অনুমান করা যায়। লাভপুর গ্রামে স্বচ্ছল জমিদার ও ব্যবসায়ী দুই ছিলেন। আর্থিক অবস্থা তাই মোটামুটি ভালোই ছিল। তার চেয়েও বড় কথা কোলকাতা শহরের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, যার ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় তাঁরা মনোযোগী হতে পেরেছিলেন অতি সহজেই। কোলকাতা শহরের শিক্ষা ও রুচির প্রভাব লাভপুরের মানুষের মধ্যে সেইজন্যই অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি সঞ্চারিত হয়েছে। বাংলার অনেক পল্লীতেই যখন দেশসেবায় কঠিন শপথ নেওয়া হয়নি—লাভপুরে তখন দেশপ্রাণের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল। তারাশঙ্করের আত্মকথায় সে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানটি লাভপুর গ্রামে সাড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, লাভপুরের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় তখন রাজবিদ্রোহমূলক কবিতাও রচনা করেছিলেন, লাভপুরের তরুণরা সে সময় প্রতিজ্ঞা করে মদ্যপান ত্যাগ করেছিল। ১৯০৫ সালেই লাভপুরে দেশপ্রেমের জোয়ার আসে—লাভপুরের মানুষের সচেতন প্রচেষ্টায় বন্দেমাতরম্ থিয়েটার এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

১। আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব), পৃঃ ৭

এই থিয়েটার ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁকেই তারাশঙ্কর "আমার প্রথম জীবনের সাহিত্যগুরু" বলেছেন—পরবর্তীকালে তাঁকে সাহিত্যজীবনে অনুপ্রাণিত করার জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন আরো তু'জনকে—একজন স্বর্গীয় অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরজন স্বর্গীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।[১] এই নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উৎসাহী ব্যক্তিরা নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন, নাটক লিখে অভিনয় করাতেন, তাতে লাভপুরে রীতিমতো এক নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই নাট্য আন্দোলনে গ্রামের সকল স্তরের যুবকদের মধ্যে এক প্রীতিমধুর সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। সেকালে জমিদার-ব্রাহ্মণসমাজের আচার-আচরণের মধ্যে যে অশোভন স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছিল তাও এই পরিবেশের গুণে ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। তখন এই উৎসাহী ব্যক্তিরা গ্রামের তরুণ ও যুবকদের কাছে ডাকতেন—তাদের প্রতিভার, ক্ষমতার ও যোগ্যতার যথাযথ সম্মান ও সুযোগ দেবার চেষ্টা করতেন, এই নাট্য আন্দোলনে আর একটি কল্যাণ সাধিত হয়েছিল—লাভপুর গ্রামের যুবকদের সঙ্গে গ্রামান্তরের নাট্যামোদী ও বহির্বঙ্গের দেশসেবীর এক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র লাভপুরের বুকে পদার্পণ করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকাররা। এমনকি সেকালের বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নাট্যকার ও অভিনেতা স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আগমনে লাভপুর ধন্য হয়েছিল।[২] তারাশঙ্কর বাল্যে এঁদের দেখেছেন, পরে যৌবনে এঁদের সান্নিধ্য লাভ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব), পৃঃ ৮ ও ১৫

২। " : আমার কালের কথা, পৃঃ ১৫৭-১৬৪।

করেছেন। নাটক রচনায় সম্ভবত এজন্যই তিনি প্রথম জীবনে অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেছিলেন। নাট্যকারদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদকেই তিনি তাঁর প্রিয় নাট্যকার বলেছেন এবং নিজের লেখায় ওঁর প্রভাব আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১] নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় সেযুগে লাভপুরে একটি সাহিত্যসভারও উদ্যোক্তা ছিলেন। সেই সভায় ১২।১৩ বছর বয়সে তারাশঙ্কর কবিতা পড়তেন কখনো। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও যোগদান করেন তখন সেই সভায়। তারাশঙ্কর কবিতা ছাড়া ছোট গল্প লিখেও পাঠ করেছিলেন সেই সভায়। নির্মলশিববাবু সেই গল্পগুলির সমালোচনা করতেন এবং তাঁকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিতেন।[২]

এই ছিল সেকালের লাভপুর সমাজেব সংস্কৃতি চর্চার স্বরূপ। তারাশঙ্কর এই পরিবেশেই বড়ো হয়েছেন। এবারে তারাশঙ্করের পারিবারিক পরিবৃত্তটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে তাঁর সাহিত্যজীবনের পটভূমিকাটি আরো স্পষ্ট হবে।

"আমার পিতামহ ছিলেন উকিল, সিউড়িতে ওকালতি করতেন। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। আমার পিতামহ ছোট, দুই ভাই-ই ছিলেন উকিল।"[৩] 'আমার বাবা ছিলেন পিতার এক সন্তান।'[৪] তিনি ছিলেন দুরন্ত এবং প্রচণ্ড সবল, সিউড়ি স্কুলে তিনি পড়তেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম বিবাহ হয় এবং এই বিবাহ ব্যাপারে স্কুলের এক শিক্ষকের কটূক্তিতে তিনি ক্রোধে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এইখানেই তাঁর শিক্ষার সমাপ্তি। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লেখেন : "বুদ্ধি অর্থ অনুরাগ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও পূর্ব

১। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—১০ই জুন, ১৯৬৯।
২। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—১১ই জুন, ১৯৬৯।
৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ১৩।
৪। " " পৃঃ ১৪।

জন্মের কর্মফল আমাকে কৌশলে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার জীবনকে সুখশূন্য করিয়াছিল। হায় বিদ্যাহীন জীবনে ও পশু জীবনে প্রভেদ কি?"[১] কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষ না থাকলেও তিনি নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ করতেন—নিয়মিত 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' ও 'হিন্দু' পত্রিকা পড়তেন। পুস্তক সংগ্রহেও তাঁর অপরিসীম আগ্রহ থাকায় ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, নানা তন্ত্র পুস্তক, কালিদাস, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ইত্যাদি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পড়েছিলেন।[২] সম্ভবত নিজের জীবনে বিদ্যা, যশ, অর্থ ইত্যাদি থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হওয়াতে পুত্রকে কেন্দ্র করেই ছিল তাঁর ভবিষ্যতের নানা স্বপ্ন। সরস্বতীপূজায় তারাশঙ্করকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াবার পর তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন—"দেখ বাবা তারাশঙ্কর, জীবনে একথা যেন কোনদিন ভুলিয়ো না, অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি, পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশপ্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে···আমার বাবার পাট তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকিল হইবে, আমার বাবা শেষ জীবনে শখ করিয়া শালের সামলা কিনিয়াছিলেন, এ সামলা আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি—ওই সামলা তোমাকে পরিতে হইবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।"[৩] বলাবাহুল্য তাঁর পিতার ইচ্ছাপূরণ হয়নি। তারাশঙ্কর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়েছিলেন বটে কিন্তু ওকালতি করে নয়—সাহিত্য সৃষ্টি করে। এই সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু তাঁর জননী।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ১৭।
২। " " পৃঃ ১৯।
৩। " " পৃঃ ১৮-১৯।

তারাশঙ্করের জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব অপরিসীম। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত মায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি সেকথা শিশুর মত অনর্গল বলে যেতেন—এই অসামান্যা জননীর কাছেই তাঁর প্রথম সাহিত্য-দীক্ষা। বিদ্বানদের প্রতি তারাশঙ্কর জননীর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তাই তাঁর একান্ত মনোবাসনা ছিল পুত্র যেন বিদ্বানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে এইজন্য খুব ভক্তি করতেন—বলতেন গুঁফো সরস্বতী। বালক তারাশঙ্করকে তিনি আশুতোষ ও অন্যান্য অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের গল্প শোনাতেন বিদ্যাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার জন্য।[১]

তারাশঙ্করের পিতার ছিল দুই বিবাহ, প্রথম পত্নী বিগত হলে পাটনাপ্রবাসী শিক্ষিত ঘরের এই কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তারাশঙ্করের মাতামহ ছিলেন ইংরাজীনবিশ, সরকারী চাকুরে। ফলে আধুনিকতার আলো নিয়ে তাঁর মা বীরভূমের এই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের কুলবধূ হয়ে এলেন। বিশৃঙ্খল সংসারে তিনি শ্রী ফিরিয়ে আনলেন—অশান্ত স্বামীর মনে আনলেন সংযম, প্রশান্তি—রুচিতে ভাবে চিন্তায় আনলেন নূতন কালের স্পর্শ—প্রসন্নাশক্তির মতই যেন ঐ পরিবারটিতে তাঁর ভূমিকা ছিল সেদিন।[২] "আমার জীবনে মাই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতে আমার জীবনের মূল নিহিত আছে ; শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি, তাকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে—"আকাশ লোকে বেড়ে চল, সূর্য আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবন-পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য।"[৩] পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহবধূ হয়েও—সংসারিক নানা কাজকর্মে

১। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—১৯৬৯ জুন।
২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ২৪-২৫।
৩। ঐ : আমার কালের কথা, পৃঃ ২৭।

ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনার আগ্রহ ছিল তাঁর অটুট, স্কুলের বিদ্যা প্রাইমারীর অধিক নয়—কিন্তু ধর্মশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সেকালের উপন্যাস পর্যন্ত তাঁর পড়া ছিল, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা-সম্ভব, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, বৃত্রসংহারও সে আমলে তিনি পড়েছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, সরোজকুমার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্করের কিছু কিছু লেখাও তিনি শেষ করেছেন। বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত রাতজেগে বই পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। এমন মায়ের সন্তান হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে বড়ো হয়ে তারাশঙ্কর যে বাল্যেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবেন—তাতে আর আশ্চর্য কি? ফলে অধ্যয়নের তৃষ্ণা তারাশঙ্করেরও ছিল—ছিল বিদ্বান হওয়ার অকৃত্রিম বাসনা—আর এই বাসনাতেই প্রচ্ছন্নভাবে সাহিত্যিক হওয়ার সাধও ছিল একথা বলা চলে। দশ-এগারো বছর বয়সে মা তাঁকে কপালকুণ্ডলা পড়ে শোনান—কপালকুণ্ডলার নায়ক-নায়িকা নদীস্রোতে হারিয়ে গেল আর তারাশঙ্করের হৃদয়ও ভরে উঠল বেদনায়—এই তাঁর প্রথম সাহিত্য রসাস্বাদন।[১]

কেবলমাত্র সাহিত্যানুরাগ নয়, তারাশঙ্করের স্বদেশানুরাগেরও জন্ম মাতৃকুলে—প্রধানত মায়ের সাহচর্যে "তিনি পাটনার মেয়ে, বাস্তব রাজনীতিবোধ তার শুদ্ধমাত্র ধর্ম এবং অদৃষ্টের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। আমার বড় মামার মধ্যে মাণিকতলার ঢেউ এসে লেগেছিল। পরবর্তীকালে আমার সেজমামা—তিনি আমার থেকে চার পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন—তিনি উত্তরভারতের বিপ্লবীদলের দলভুক্ত হয়েছিলেন। অকালে বিশ বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্লেগ রোগে মারা যান। পরে বেনারস কনসপেরিসি কেসে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে—তাঁর পরবর্তী ছোটভাইকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা—(সাহিত্য সংখ্যা দেশ, ১৩৬৫), পৃঃ ১০৯।

তাতে সাক্ষ্য দিতেও হয়েছে।[১] সুতরাং এসব ঘটনার সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্কও ছিল। লাভপুরের প্রথম রাখীবন্ধন দিনের উৎসবে তারাশঙ্করের বড়মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি তাঁর মায়ের হাতে রাখী বেঁধে দিতে মা সেটা তারাশঙ্করের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। মুখে উচ্চারণ করেছিলেন—"বাংলার মাটি বাংলার জল" এই মন্ত্র।[২] তারাশঙ্কর তাঁর জীবনের সর্ব অবস্থায় এই মায়ের স্নেহ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উপদেশ পেয়েছেন, সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে স্নেহময়ী মা তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন,—আদর্শচ্যুত হতে দেননি কখনো।

লাভপুরের পরিবেশজাত প্রেরণা, নিজ পরিবারের এই শিক্ষা ও উৎসাহই সম্ভবত তারাশঙ্করকে সাহিত্যিক হবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, সঙ্কল্পে স্থির রেখেছিল। তারাশঙ্করের আত্মজীবনীতেও তাঁর সাহিত্যসাধনার আনুপূর্বিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ আছে। সাহিত্যিক হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কেমন করে অন্য সব বৃত্তি থেকে, কর্ম থেকে অপসারিত করেছিল তারাশঙ্কর তার পূর্ণ বিবরণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয় রাঢ়ের গ্রাম্য পরিমণ্ডলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে, তিনি কলিকাতার সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন আই. এ. শ্রেণীতে। কিন্তু কলেজের শিক্ষা শুরু হতেই রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য সে যুগের অত্যুৎসাহী পুলিশের দৃষ্টি পড়ে তাঁর উপর এবং তিনি ঘরে নজরবন্দী হয়ে থাকেন। এর দুবছর পর অবশ্য সাউথ সুবারবন কলেজে (বর্তমান আশুতোষ) আবার ভর্তি হয়ে তিনি পড়াশুনার চেষ্টা করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য কয়েকমাস পর তাঁকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৩৮—৩৯

২। ঐ : আমার কালের কথা, পৃঃ ১৫১।

কলেজ ছাড়তে হয়। ১৯১৯ সালে কয়লা ব্যবসায়ী আত্মীয়কুলের একান্ত ইচ্ছায় তিনি কয়লার ব্যবসা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন, কিন্তু তাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পেলেন না। বাল্যে যে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই দেশপ্রেমই তাঁকে আহ্বান জানাল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন এবারও তাঁকে কয়লার ব্যবসায় থেকে ছিনিয়ে আনল, ১৯২১ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং আন্দোলনে ব্রতী হলেন। এরপর তারাশঙ্কর জীবনের উদ্দেশ্য সন্ধানে রাজনীতি থেকে দেশসেবা, দেশ-সেবা থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। নানা দ্বন্দ্ব, নানা জিজ্ঞাসা জেগেছে মনে, কখনো রাজনীতির ক্রুর রূপ দেখে বিতৃষ্ণা এসেছে, আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন সমাজসেবায়। আবার সমাজসেবা ছেড়ে সাহিত্যরচনা করতে সঙ্কল্প করেছেন কখনো। কিন্তু সাহিত্য-রচনাস্পৃহাটি সর্বাবস্থায় তাঁকে তাড়না করেছে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের পথই তাঁর জীবনের পথ হয়ে দাঁড়াল।

সাহিত্যিক যারা হয় না তাদের মধ্যেও একসময়ে একবয়সে কবিতা রচনাব আগ্রহ দেখা যায়, সেদিক থেকে আটবছর বয়সে তারাশঙ্করের কবিতা রচনা ব্যাপারটি হয়ত খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তারাশঙ্কর যেহেতু ভবিষ্যতে সাহিত্যিক হয়েছিলেন সেকারণে তাঁর জীবনের এই সামান্য ঘটনাটিরও মূল্য আছে বৈকি। বালক তারাশঙ্কর কোন এক পক্ষী শাবকের মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছিলেন এবং খড়খড়িওয়ালা দরজায় খড়ি দিয়ে তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে।[১]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব), পৃঃ ৩

পাখীর ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি

এর পর প্রিয় কুকুরের মৃত্যুতে শোকাহত কবি লিখলেন :

সমাধি মোদের ভুকুর
আমাদের ভাল কুকুর

পরবর্তী কবিতা লিখতে গিয়ে অবশ্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করলেন, গ্রামের নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আগমনী কবিতার অনুকরণে রচিত হলো :

শারদীয়া পূজা যত নিকটে আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তারাশঙ্কর কবিতা নিয়েই সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেন প্রথম। অতি উৎসাহী কবি কেবল লিখেই ক্ষান্ত হলেন না। বন্ধু নারাণের পিতা ছিলেন কালিডোনিয়ান প্রেসের বড়বাবু—তাঁর সাহায্যে ঐ আগমনী কবিতাটি চমৎকার নীলকালির হরফে ছাপা হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

লাভপুর গ্রামের নাট্য আন্দোলন ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। সেখানে থিয়েটারের নাম বন্দেমাতরম, লাইব্রেরীর নামও বন্দেমাতরম। অর্থাৎ সেকালে লাভপুরের সাংস্কৃতিক জীবন দেশপ্রেমবর্জিত ছিল না কোন অবস্থায়ই। লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্কর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান ইত্যাদি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব), পৃঃ ৪

অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও দেখেছেন সে সময়। ফলে স্বদেশানুরাগেরও প্রেরণা জেগেছে মনে। এই নাট্য আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেই সম্ভবত তারাশঙ্করের নাটকরচনার স্পৃহাটি প্রবল হয়। সেকালের নাট্যকারদের যশখ্যাতিও হয়ত তাঁকে নাটক-রচনায় কিছুটা উৎসাহিত করে থাকবে। একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব ও অন্যদিকে নাট্য আন্দোলনের প্রভাব—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তিনি প্রথম যে নাটক লিখলেন সেটাও দেশপ্রেম-মূলক। তাঁর প্রথম নাটকের নাম "মারাঠা তর্পণ"। তারাশঙ্কর তিনখণ্ড মারাঠাদের ইতিহাস কিনে পড়ে পানিপথের যুদ্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে এ নাটক রচনা করেছিলেন। সেকালে মারাঠাদের দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হবার প্রবণতা অনেক সাহিত্যিক কবিদের মধ্যেই ছিল। তারাশঙ্করও তাই নাটক রচনাকালে এই বিষয়বস্তুকেই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন মনে হয়। তাঁর এই নাটক গ্রামের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং বেশ সুখ্যাতি লাভ করে। এই সাফল্যে তিনি নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখলেন—স্বপ্ন দেখলেন নাট্যকার হয়ে বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির এবং নির্মল-শিববাবু এই উচ্চাশায় ইন্ধন যোগালেন। অবশ্য তাঁর যথেষ্ট সহায়তা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের এ আশা মিটল না। নির্মলশিববাবুর যেহেতু নাট্য-জগতে প্রতিষ্ঠা সেইসূত্রেই আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং নাট্যকারদের সঙ্গেও যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। তাই কলিকাতায় এসে তাঁর অধ্যক্ষ বন্ধুকে দিয়ে তারাশঙ্করের নাটকখানি অভিনয় করাতে বিশেষ অনুরোধও জানান। কিন্তু নামগোত্রহীন নাট্যকারের নাটকখানি প্রত্যাখ্যাত হয়, এমনকি আর্ট থিয়েটারের ডিরেকটরদের এই বিষয়ে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কোন লাভ হয় না—বইখানি অপঠিত অবস্থায়ই ফেরত আসে। নির্মলশিববাবু অবশ্য এতেও নিরুৎসাহবোধ করেননি, তারাশঙ্করকে নাটকরচনা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন তখনও। কিন্তু তারাশঙ্করের উৎসাহ তখন একেবারেই স্তিমিত—"ভেঙে গেল

নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন, পরদিনই কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজ শেষ করে সন্ধ্যার গাড়িতে চলে এলাম, বাড়ী ফিরে খাতাখানা উনোনে গুঁজে দিলাম।"[১] "এই ঘটনাটি আমার জীবনে সাহিত্যসাধনায় একটি ধারা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেল, সেদিন যদি ঐ ঘটনাটি না ঘটত, যদি নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'ত, এমনকি ওই কথাগুলি না বলে পড়ে দেখার ছল করেও দুদশটা দোষ দেখিয়ে, সহানুভূতিসূচক কথা বলে ভদ্রতার 'হল না' কথাটা বলতেন, তাহলে নাটক লেখা ছাড়তাম না, নাটকই লিখে যেতাম। নাট্যকার হিসেবেই হয়ত আমার পরিচয় হত। কিন্তু এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমঞ্চ এবং নাটকের পথ থেকে। নাটক আর লিখব না স্থির করলাম। কি লিখব কিছুই লিখব না।"[২]

এর পর তিনি সাহিত্যের পথ থেকে সরে এলেন অভিমানে। স্থির করলেন, আর এপথ নয়, কংগ্রেসের কাজ, সেবক সমিতির সেবাধর্ম, বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে দিন কাটাবেন। গ্রামের সমাজজীবনে তখন তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত তিন বৎসরকাল তিনি গ্রামের কাজে ব্যস্ত। ম্যালেরিয়া নিবারণী বাহিনীর কর্তৃত্ব করেছেন, গ্রাম সমাজের পুরোধা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। কিন্তু এই অবস্থায় থাকা কালে অসহযোগ আন্দোলনের তৃতীয় প্রবাহে ১৯৩০ সালে তারাশঙ্কর আবার ছুটে গেলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের এই অনাচার স্থানীয় পুলিশ বিভাগের সহ্য হল না—ফলে তিনি ধৃত ও কারারুদ্ধ হলেন। সিউড়ির জেলখানায় তাঁকে চারমাস কাটাতে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব), পৃ: ১৪—১৭।

২। " " " পৃ: ১৮।

হল। এই চারমাসের কারাবাসেই তাঁর জীবনধারা আবার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল। কারাসহবাসীদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি তাঁকে ক্ষুব্ধ করল নানাভাবে—নানাকারণে, এপথেও আর কোন আকর্ষণ রইল না তাঁর। এবার পেলেন যে পথের সন্ধান, সে পথ সাহিত্যেরই পথ। অবশ্য এই স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনেও সাহিত্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তিনি। কঠোর সঙ্কল্পসত্ত্বেও, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত মাসিক 'পূর্ণিমা'য় সহ-সম্পাদনার কাজ করতেন। কিন্তু তাতে তাঁর অন্তরের শূন্যতা থেকেই গেল। সাহিত্য পিপাসা থেকে মুক্তি পেলেন না তারাশঙ্কর এবং এই সময়ই তাঁর জীবনে অন্য একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সে সময় কংগ্রেসের কাজে সিউড়িতে এক উকিলের বাড়ীতে তাঁকে রাত্রিযাপন করতে হয়। মশার উপদ্রবে তারাশঙ্করকে এক বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় সেখানে। হঠাৎ একখানা পুরানো 'কালিকলম' পত্রিকা পেয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন তিনি। তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জনি ও টনি' গল্প দুটি পড়ে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। "··পথের নির্দেশ পেয়ে গেল তারাশঙ্কর, তার আত্মসাক্ষাৎকার হল।"[১]..."পোনা-ঘাট পেরিয়ে এক নিশ্বাসে পড়লেন প্রথম।...একটা অপূর্ব আস্বাদ পেল তারাশঙ্কর, যেন এক নতুন সাম্রাজ্য আবিষ্কার করলে, যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু খুলে গেল, খুঁজে পেল সে মাটিকে, মলিন অথচ মহত্ত্বময় মাটি ; খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাজেয় মানুষ। পতিতের মধ্যে খুঁজে পেল সে শাশ্বত আত্মার অমৃতপিপাসা, উঠে বসল তারাশঙ্কর। যেন তাঁর মন্ত্রচৈতন্য

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, পৃঃ ২৭৪।

হল।"[১] অচিন্ত্যকুমারের এ মন্তব্য যথার্থ, কারণ 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পটি অতি সাধারণ মানুষেরই গল্প। বুড়ো সরকার, মেহেরো, জীযুৎ, ওসমান, বলাই—এরা সাধারণ মানুষ, মাটির মানুষ, যাদের আনাগোনা চলছে আমাদের সামনে প্রতিদিন, আমরা তবু এদের অনেক সময় ভুলে যাই, ওদের কথা বলতে আমাদের খেয়ালই থাকে না। অথচ এরা অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে অবিরাম।"[২] পৃষ্ঠা ওলটাতে পেল সে আরেকটা গল্প "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"। শৈলজানন্দের লেখা। গল্পের পটভূমি বীরভূম, তারাশঙ্করের নিজের দেশ। এ যে তারই অন্তরঙ্গ কাহিনী—একেবারে অন্তরের ভাষায় লেখা। মনের সুষমা মিশিয়ে সহজকে এত সত্য করে প্রকাশ করা যায় তাহলে! এত অর্থান্বিত করে। বাংলাসাহিত্যে নবীন জীবনের আভাস আস্বাদ পেয়ে জেগে উঠল তারাশঙ্কর। মনে হল হঠাৎ নতুন প্রাণের প্লাবন এসেছে—নতুন দর্শন, নতুন সন্ধান, নতুন জিজ্ঞাসার প্রদীপ্তি, নতুন বেগবীর্যের প্রবলতা। সাধ হল সেও এই নতুনের বন্যায় গা ভাসায়। নতুন রসে কলম ডুবিয়ে গল্প লিখে। কিন্তু গল্প কই? গল্প তোমার আকাশে বাতাসে মাঠে মাটিতে হাটে বাজারে এখানে সেখানে।"[৩] তারাশঙ্কর এ নবীনধারায় সত্যিই তখন আবিষ্ট—"অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনিভাবে কলমের ডগায় ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে দেওয়া যায়।"[৪] একথা তখন তাঁরও মনে এসে গেছে। 'আমি কি করে লেখক হলাম' এই নিবন্ধে তারাশঙ্কর এই অবিস্মরণীয় রাত্রিটির উল্লেখ করে লিখেছেন—

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোলযুগ, পৃঃ ২৭৫।
২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বনির্বাচিত গল্প : পোনাঘাট পেরিয়ে, পৃঃ ১৪৮-১৫৮
৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোলযুগ, পৃঃ ২৭৫—২৭৬।
৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন, পৃঃ ২০।

"গল্প দুটি পড়ে পেয়েছিলাম নতুন স্বাদ, নতুন গন্ধ, নতুন স্পর্শ, যাকে নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়া বলে তাই হয়ে গিয়েছিলাম এবং স্থির করেছিলাম, দেখব এমন গল্প লিখতে পারি কিনা। বাড়ি ফিরে এসে একটি গল্পও লিখেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম রসকলি।"[১]

এবারে তারাশঙ্করের কলমে গল্প এসে গেল—সে গল্প তাঁর চেনা মানুষের—চেনা মাটির—অতি চেনা কমলিনী বৈষ্ণবীর গল্প। যাকে প্রতিদিন দেখেও ভুলে থাকতেন—'রসকলি'তে সেই অবহেলিত বৈষ্ণবী এসে রসসমুদ্রের সন্ধান দিল তাঁকে। গল্পটি বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন সাহিত্য যশাভিলাষী লেখক। কিন্তু সাত আট মাস বাদে তাঁকে অপঠিত অবস্থায় গল্পটি ফিরিয়ে আনতে হল। 'চোখে বার কয়েক সেদিন জল এসেছিল।'[২] ফিরে ভেবেছিলাম প্রত্যাখ্যাত নাটকটির মত এটিকেও 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলে পাকশালায় বহ্নি মুখে সমর্পণ করব, কিন্তু কেন যে হয়ে ওঠেনি, ওটি প্রত্যাখ্যানের কলঙ্ক বহন করে থেকে গিয়েছিল স্যুটকেসের মধ্যে। একদা পোষ্টাফিসে ডাক সর্টিংয়ের সময় 'কল্লোল' কাগজের নটরাজ ও সমুদ্রতট ছবি আঁকা মোড়ক দেখে কাগজটিকে ভাল লাগল। ঠিকানাটা লিখে নিয়ে 'রসকলি' গল্পটিকে পাঠিয়ে দিলাম কল্লোলের ঠিকানায়। আশ্চর্যের কথা, এক সপ্তাহের মধ্যে পত্র পেলাম "আপনার গল্পটি কল্লোলে এই মাসেই ছাপা হইবে। আপনি এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন কেন?" লেখক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ⋯ কল্লোলের এই অভ্যর্থনায় সাড়া দিয়ে পা বাড়ানোই আমার কি করে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, পৃঃ ৯২

২। " : আমার সাহিত্যজীবন, পৃঃ ১৪।

লেখক হলাম প্রশ্নের প্রথম উত্তর বা প্রথমকর্ম।"[১] তারাশঙ্কর কল্লোলের এই অভ্যর্থনায় তাঁর লেখক জীবনের প্রথম সাফল্য অনুভব করেছিলেন সেদিন। তাই এতে সাড়া দিয়েই তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কল্লোল গোষ্ঠীর এই ঔদার্য তারাশঙ্কর সারাজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে তিনি রাজনৈতিক জীবনের জটিলকুটিল কদর্যতার কথাই বলেছেন—এই কদর্যতাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য জগতে ফিরে আসতে বাধ্য করেছিল।

> "আজ সারা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে কুটিল কদর্য হিংসা এবং কলহ দেখতে পাচ্ছি এর সূত্রপাত আমি ১৯৩০ সালে জেলখানায় বসে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রত্যক্ষ করে ভীত এবং মর্মাহত হয়েছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বন্ধুদের বলেও এসেছিলাম, এরপর আমি আর এইপথে দেশসেবা করব না। এরপর দেশসেবা করব সাহিত্যের পথে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে পড়লাম বীরভূমের তদানীন্তন ধুরন্ধর পুলিশসাহেবের পাল্লায়, খ্যাতনামা সামসুদ্দোহা সংক্ষেপে দোহাসাহেব। এই সেদিনও পাকিস্তান পার্লামেন্টে যিনি আয়ুবশাহীর অন্যতম বিশ্বস্ত মন্ত্রী হিসেবে হিন্দু বা ভারতবিদ্বেষ প্রচার করেছেন। তিনি আমাকে জেলে বা আন্দামানে পাঠাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটি ঘটনা ঘটল। একটির উপর আমার হাত ছিল না। সেটি আমার কন্যা বুলুর মৃত্যু।···আর একটি। এটিকে ঠিক ঘটনা বলা যায় না। বলতে হয় উপলব্ধি। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩১।৩২

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ (আমি কি করে লেখক হলাম), পৃঃ ৯২-৯৩।

সালের মধ্যে সারাদেশে হয়েছিল সেটেলমেণ্ট জরিপ। এই সেটেলমেণ্টের কাজ আমাকে চালাতে হয়েছিল। জমিদারী সেরেস্তার পুরানো কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনে মনে উপলব্ধি করেছিলাম, এই জমিদারী সম্পত্তি পাপ। এর অন্ন সেদিন যেন তিক্ত মনে হয়েছিল। ১৯৩১ সালে আমার মেয়ে বুলুর মৃত্যুর পর সন্তানশোকে এবং দোহাসাহেবের তাড়ায় নবলব্ধ উপলব্ধির আবেগে এই ত্রিস্রোতে ভেসে ঘর ছেড়ে, জেলা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, নিজে উপার্জন করে খাব এবং দেশের সেবা করব সাহিত্যের পথে। বাংলা দেশের যে নতুন জীবনবহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, যার কথা বাংলা সাহিত্যে অকথিত এবং অসমাপ্ত আছে, তাই আমি বলব।"[১]

এই হল সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনে প্রবেশের পশ্চাৎপট। নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও মানসিক দ্বন্দ্বের পথ পরিক্রমা করে সর্বশেষে সাহিত্যজীবনে ফিরলেন তারাশঙ্কর। সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়ে তাঁকে নানা দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে— এখানে সেসব ঘটনা অবতারণার অবকাশ নেই। তবে জীবনে কোন বিপদ-বাধা বা দুঃখ-কষ্টই তাঁকে সাধনাচ্যুত করেনি, বরং জীবনটাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য সাধনা ও জীবন সাধনা চলেছে সমান্তরালভাবে,—ধ্যানমগ্ন হয়ে অন্বেষণ করেছেন জীবনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা। এই গভীরতায় আত্মনিমজ্জন করে তিনি জীবনের মাহাত্ম্য খুঁজে পেয়েছেন—মহৎ শিল্পসৃষ্টির যোগ্য হয়েছেন।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ (আমি কি করে লেখক হলাম), পৃঃ ৯৩।

তৃতীয় অধ্যায়

যুগসন্ধির প্রতিফলন

তারাশঙ্করকে কোন একজন প্রশ্ন করেছিলেনঃ—"আপনার উপন্যাসে কি কালের দ্বন্দ্বটা বড় কথা নয়? সামন্ত প্রথার সঙ্গে বণিক সভ্যতার সংঘাত কি বড় হয়ে ওঠেনি?

> "হ্যাঁ এই সময়েই যে আমি মানুষ, দেখেছি কি করে একটি পুরানো ঐতিহ্য ভেঙে যায়, নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে, আমার জীবনেও তার ইঙ্গিত আছে। বাপ ঠাকুর্দার সামান্য জমিদারী ছিল; কিন্তু সেই আভিজাত্য তখন লুপ্তপ্রায়। ওঁরা ভেবেছিলেন আমি উকিল হবো, ঘটনাক্রমে হলুম রাজনৈতিক কর্মী। দেখলুম কিভাবে গ্রামের সমাজ পাল্টে যাচ্ছে, শহর-জীবন হাতছানি দিচ্ছে··আমি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ। বিত্ত ছিল না, অহঙ্কার আর আভিজাত্যটাই পেয়েছি, অন্যদিকে আমার স্ত্রী ধনী পরিবারের সন্তান—পুরানো আভিজাত্যের সম্পর্কে সম্পর্কহীন। এই দ্বন্দ্ব আমার সারাটা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—প্রায় সারাটা জীবন উপলব্ধি করে এসেছি।"[১]
>
> "পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, নৈতিক জীবন, কর্ম জীবন, রাষ্ট্র জীবন কোন জীবনই বাদ যায়নি—ভূস্বামী প্রজা, মূলধনী শ্রমিক ও ধনী দরিদ্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ

১। গৌরাঙ্গ ভৌমিক: কয়েকপ্রহরের স্মৃতি (কালি ও কলম, তারাশঙ্করের স্মৃতিসংখ্যা), পৃঃ ৭৯৫-৯৬।

বর্তমান যুগে প্রবল হয়ে উঠেছে—জাতীয় জীবনের সাহিত্য প্রতিনিধির চিন্তাকে তা বিচলিত করেছে।”[১]

এই সংঘর্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলেই প্রাচীন-নবীনের সংঘাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, মানুষের মনে কিভাবে তা প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে তার অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে।

কিন্তু প্রাচীন নবীনের এই দ্বন্দ্বসৃষ্টি কালে তারাশঙ্করের ভূমিকা কি? তিনি কি কেবল কাল পরিবর্তনের চিত্রটিই তুলে ধরেছেন? না অন্য কিছু। এই যুগযন্ত্রণার মধ্যেও কিন্তু নিজের অজান্তেই প্রাচীনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এসেছে তারাশঙ্করের মধ্যে। “নবীন না পুরাতন” এ প্রশ্নটা তাঁকে বারংবার উত্যক্ত করলেও নবীনকে তিনি যেন তেমন উৎসাহভরে আমন্ত্রণ জানাতে পারেননি। অবশ্য প্রাচীনকে বিদায় দিতে অশ্রু মোচন করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতীতকালের সবই মন্দ এবং অতীতের জন্য কোন মানুষের মনে কোন মমতা থাকবে না, তাও আশা করা অন্যায়। তবে সমাজের পক্ষে যা কল্যাণকর নয়, তেমন কিছুর জন্য সমাজকল্যাণ-কামী প্রগতিশীল মানুষ সাধারণত আকর্ষণ বোধ করে না। কিন্তু তারাশঙ্কর যে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে এই প্রগতিকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, তিনি সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মী হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন সমাজব্যবস্থার মৃত্যু-লগ্নকালে নবীনের প্রতিষ্ঠায় তেমন উদ্যোগী হতে পারেননি। তাঁর সমসাময়িক কালে কোলকাতা নগরীতে প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিকরা তাই যখন আধুনিক ভাবধারায় উদ্বেলিত—তিনি তাদের সঙ্গেও তখন কোন

সহমর্মিতা অনুভব করতে পারেন নি। কল্লোলযুগের লেখকদের প্রতি তাঁর অন্তরের গোপনতম স্থানে সে সময় অভিযোগের চিহ্ন ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।[১]

জমিদারী প্রীতি—জমিদার বনাম ব্যবসায়ী-শিল্পপতিঃ

পড়ন্ত জমিদার সন্তান তারাশঙ্করের মনে জমিদারী আভিজাত্যের অহঙ্কারটি বজায় ছিল নিঃস্ব অবস্থায়ও, কোলকাতা মহানগরীর বুকে প্রচণ্ড অর্থাভাবে দিনাতিপাত করলেও তিনি যে জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী—একথা সম্ভবত তিনিও কখনো বিস্মৃত হয়ে যান নি। জমিদারী দম্ভ এযুগে অর্থহীন, একথা উপলব্ধি করলেও সাহিত্য সৃষ্টিকালে জমিদারদের পুরুষানুক্রমিক সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তির ঐতিহ্যকে অবহেলা করতে পারেননি। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-তন্ত্রের প্রতি সকরুণ সহানুভূতিটুকুই প্রকাশ করেছেন তিনি বারংবার—তাদের শত দোষত্রুটি এবং রক্ষণশীল মানসিকতাকেও তিনি অকারণেই মহিমামণ্ডিত করতে চেয়েছেন।

নিজে জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার ফলে জমিদার ও জমিদারী সম্পর্কে তারাশঙ্কর খুব স্পর্শকাতর ছিলেন। বিভিন্ন কলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে জমিদারীকুলের গুরুত্ব তিনি, তাদের অনিবার্য পতনের কথা জেনেও, অস্বীকার করেননি। "আমাদের সামাজিক ইতিহাসলেখক ও ঔপন্যাসিকগণ একটা কথা স্মরণে রাখেন না যে মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত তুই তিন শতাব্দী জমিদার বংশই এ দেশের প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যতঃ স্বাধীন অপ্রতিহত প্রভাব ভূস্বামীকুলের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমার সাহিত্যজীবন (১ম পর্ব), পৃঃ ৩৮-৪০।

আদর্শ আকাঙ্ক্ষা, বিলাস ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিত বাৎসল্য সৌন্দর্যরুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয় জীবনযাত্রা আবর্তিত হইতেছে।"[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকাল থেকে বাংলার সমাজে ক্রমশ ভূস্বামী সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাক্রমশালী জমিদাররা সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে নিজ ক্ষমতানুযায়ী সমাজ পরিচালনা করেন। বিত্তে ক্ষমতায় প্রবল ছিলেন বলে জনসাধারণের উপর নানা অত্যাচার-অনাচারেও তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। জমিদারদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় অনেক সময় এই অত্যাচারিত মানুষ প্রতিবাদের শক্তি-সঞ্চয়-কামনায় ঐক্যবদ্ধ হয়, আবার অনেকে এদেরই পৃষ্ঠপোষকতা ও কৃপা লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। মোটকথা তখন সমাজের বা জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসাবে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এবং ইতিহাসেও এদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাই বিগত কয় শতাব্দীর সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে সাহিত্যে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান আশা করা খুবই সঙ্গত। তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে এই জমিদার শ্রেণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেখা যায়, লেখক পরমাগ্রহে সমাজজীবনে এদের দূরপ্রসারী প্রভাবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই জমিদাররা বংশানুক্রমে অর্জিত অর্থ ও আধিপত্যকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছেন। কালের করাল গ্রাসে, নিজ চরিত্রের নানা দোষত্রুটিতে তাদের এই পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়েছে। নানা উদ্ভট চিন্তা, বাস্তববিমুখ পরিকল্পনা, অসৎ প্রবৃত্তি তাদের চরিত্রে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছিল, কালক্রমে তা সকল পরাক্রম ও বিলাস-বৈভব হরণ করে তাদের নিঃস্বতার প্রতীক করে তোলে। তবু তারা অতীতেব স্মৃতি রোমন্থন করে, দাপটের

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৫৩৩

গল্প শুনিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তারাশঙ্কর জমিদার সন্তান,—এদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তাঁর জমিদার বিষয়ক গল্প ও উপন্যাসে সেই সত্যটি প্রতিভাত হয়েছে। এই জমিদার সম্প্রদায়ের চিত্রাঙ্কন বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদান।

তারাশঙ্কর এই সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও পরাক্রমহীনতার চিত্র এঁকেই কেবল ক্ষান্ত হননি—এদের জন্য তাঁর বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাসেরও শেষ নেই। ছোট-বড় ভূস্বামীদের কুটিলতা, ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও লাভপুরের ভূস্বামীকুলের তারাশঙ্কর তাদের দুঃখদুর্দশার দিনে অতীতের আভিজাত্য, অহঙ্কার ও দৃপ্ত পৌরুষের স্মৃতিচারণ করে বিমর্ষ হয়েছেন। এসকল নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাই তাঁকে রাবণেশ্বর রায়ের (জলসাঘর) কিংবা সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদারের চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতার জমিদার গৌবসুন্দর চৌধুরীকে আশ্রয় করে রাবণেশ্বরের চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছিল, একথা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন।[১]

জমিদারী প্রথার বিলুপ্তিকালে ক্রমশ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির আবির্ভাব হতে থাকে আমাদের সমাজে। তারাশঙ্কর এই ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সম্বর্ধনা জানাতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। জমিদার সন্তান তারাশঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনেও এই নূতন ধনিক শ্রেণীর কাছে অবশ্য তেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পাননি, বরং নানা ছলছুতোয় জমিদারদের প্রতি এরাও তাদের বিরূপ মনোভাবটি প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং এই অবমাননার ফলস্বরূপ জমিদারদের প্রতি দুর্বলতা অনুভব করার কারণও হয়েছিল। চৈতালী ঘূর্ণিতে তারাশঙ্কর জমিদার ও কয়লাকারখানার মালিকের অত্যাচারকে সমগোত্রীয় দেখিয়েছেন।

১। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৯শে মে, ১৯৭০।

যার ফলে চাষী গোষ্ঠ একবার জমিদারের অত্যাচার সইল আবার কারখানার মালিকদের অত্যাচারে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হল। ব্যবসায়ীদের কিংবা নূতন ধনিক শ্রেণীর আগমনে কল্যাণকর কোন সামাজিক পরিবর্তনের আশাই পোষণ করতে পারেন নি তারাশঙ্কর। অপরপক্ষে জমিদারী সম্পত্তি পাপ জেনেও জমিদারদের শোষণের নানা অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সামন্তবাদী ঐতিহ্যের অবক্ষয়কে স্বাভাবিকভাবে যেন গ্রহণও করতে পারেন নি। অথচ এই সমাজে সাধারণ মানুষের কাছে ধনতন্ত্র অপেক্ষা সামন্ততন্ত্র অধিক কাম্য নয় তার অজানা ছিল না। তারাশঙ্করের উপন্যাসে চৈতালী ঘূর্ণির শিল্পপতি-ব্যবসায়ী চরিত্র কিংবা কালিন্দীর ব্যবসায়ী-শিল্পপতি বিমলবাবুর চরিত্র পতনশীল জমিদারদের চরিত্র অপেক্ষা উন্নততর নয়। তবে তিনি এই সকল জমিদারদের অসংখ্য দোষক্রটির মধ্যে উদারতা ও মানবিক গুণ কিছুটা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কোন গুণই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি বা তিনি তা লক্ষ্য করতে সচেষ্টও হননি বলা যায়। এটা নিঃসন্দেহে পক্ষপাতিত্ব। কারণ জমিদারদের মত অসংখ্য দোষক্রটি সত্ত্বেও শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের কোনই গুণ থাকবে না—তেমন কোন নিয়ম নেই।

তারাশঙ্কর সেকালের প্রতি এত শ্রদ্ধাবান ছিলেন যে, আধুনিক কালকে তিনি মনে প্রাণে স্বীকৃতি দিতেও পারেননি সংস্কারমুক্ত হয়ে। "সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ক্রটি-বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন, আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ক্রটির মত"…[১] সেকালটাকে নতমস্তকে বরণ করলে একালের মহিমাও অনেক সময়ই দৃষ্টির অন্তরালে থাকা সম্ভব। সেকালের ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তার মহিমা যেমন তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছে—জমিদার ও

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কালের কথা, পৃঃ ২১৭।

জমিদারী ব্যবস্থার অসংখ্য ত্রুটি সত্ত্বেও সেটাও তেমনি তাঁর মমতা লাভ করেছে। একালের নূতন ধনী বা নূতন সমাজ ব্যবস্থা তার কোন মহিমা নিয়ে যদি আসেও তবু সেকাল-সচেতন শিল্পীর পক্ষে সর্বদা তা মেনে নিতে দ্বিধা আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একালের নতুন ধনীকে সেকালের বনেদী ভূস্বামীর সমমর্যাদা দিতে তিনি স্পষ্টতই দ্বিধাগ্রস্ত।

১৯৫৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর যেদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এষ্টেটস এ্যাকুইজিসন এ্যাকট গৃহীত হলো, 'জবানবন্দী' উপন্যাসের প্রারম্ভ সেখান থেকে। জলসাঘরের নব্বই বৎসর পরের ঘটনা-গুলি এ উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে, কীর্তিহাটের প্রাচীন জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী সুরেশ্বর রায় এই উপন্যাসের বক্তা, সেটেল-মেণ্টের ব্যাপারে গ্রামে গিয়ে সে পূর্বপুরুষদের জমিদারী কীর্তির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে—পুরাতন কাগজপত্র থেকে প্রাচীন-কালের সুসংবদ্ধ ইতিহাস উদ্ধার করেছে। সে তখন জমিদারী প্রথায় আকৃষ্ট। সুরেশ্বরের পূর্বপুরুষ বীরেশ্বর রায়—বীরেশ্বরের পুত্র রত্নেশ্বর, এবং রত্নেশ্বরের পুত্র দেবেশ্বর, বীরেশ্বর থেকে সুরেশ্বর পর্যন্ত—এই শতবর্ষকালীন জমিদার চরিত্রগুলিতে দোষত্রুটির সঙ্গে কতকগুলো সদগুণও আছে। তাদের দুর্বলতার মধ্যে সম্ভোগতৃষ্ণা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। কখনো তা পরিমিত ও নীতি-শাসিত—কখনো নীতিজ্ঞানরহিত, মাত্রাহীন ও পরিমিতিশূন্য। অথচ এরাই আবার ন্যায় বিচারে পক্ষপাতহীন। রাবণেশ্বর প্রজাদের ঘর জ্বালিয়ে দেন, আবার দুঃসময়ে মুক্ত হস্তে সাহায্য দানও করেন। রত্নেশ্বর একই সঙ্গে পিক্রু গোয়ান ও ঠাকুরদাস গোপ—হত্যাকারী ও নিহত উভয়েরই পরিবার প্রতিপালন করেছেন। দেবেশ্বর বিলাসে ও মদ্যপানে যত অর্থ ব্যয় করেন সে পরিমাণ অর্থ দিয়েই আবার বিপ্লবীদের সাহায্য করেন। তাদের সুগভীর ধর্মবিশ্বাস, আধিপত্য ও প্রভুত্বপ্রিয়তার সঙ্গে গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসের

নিবিড় সংযোগও লক্ষ্য করা যায়। জমিদারদের ব্যক্তিগত গুণ যতই থাকুক না কেন, একালের মানুষদের জমিদারী প্রথায় আকৃষ্ট হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তারাশঙ্কর এ সময়েও এ যুগের যুক্তিবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত সুরেশ্বরকে এই ব্যবস্থায় আকৃষ্ট করেছেন তাঁর উপন্যাসে।

বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের ইতিহাসে সহস্র অত্যাচার, অর্থ-লালসা ও অপকর্মের কলঙ্কচিহ্ন বর্তমান, ইতিহাসের অনিবার্য আঘাতে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে এবং তারাশঙ্করও এই পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক কিংবা অমঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করেননি। নিরুপায় হয়ে তিনি ভূস্বামিগণের ব্যক্তিচরিত্রের আভিজাত্য, উদারতা ও দৃপ্ত গৌরবের প্রতি তাঁর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিভিন্ন গল্পে ও উপন্যাসে। এখানে তাঁর ঐতিহ্যানুরাগ ও জমিদারপ্রীতিই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। অস্তাচলগামী জমিদারদের প্রতি পাঠকের সমবেদনা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় তাঁর কোন কার্পণ্য নেই।

'কালিন্দী' ও 'ধাত্রীদেবতা' এ দুটি উপন্যাসে মধ্যযুগের আদর্শে লালিত জমিদারগোষ্ঠীর জীবনে আধুনিক জীবনযাত্রা যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে তারই দ্বন্দ্বপীড়িত রূপটি সুস্পষ্ট। ধাত্রীদেবতায় জমিদারের ছেলে শিবনাথের শৈশব কৈশোর যৌবনের ক্রমপরিণতির কাহিনী বিবৃত হয়েছে। শিবনাথ চরিত্রেও দুটি বিরোধী চরিত্রের প্রভাব পড়েছে, মা ও পিসিমার আদর্শদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার জীবন। পিসিমা তাকে সনাতন জমিদারী আভিজাত্য ও বংশ-গৌরবের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করতে চান। মা তা চান না, তিনি ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষায় অনুপ্রেরণা দেন, স্বদেশপ্রেম ও জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করেন। মা-পিসিমার এই সংঘর্ষ যেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক আদর্শের সঙ্গে প্রাচীন আভিজাত্য-প্রিয় জমিদারী মনোভাবের সংঘর্ষ। শিবনাথ ও নাস্তির

ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে আছে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্বেরই প্রভাব। শিবনাথ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান, নান্তি উদীয়মান ব্যবসায়ীর ঘরের মেয়ে, কলহ বেধেছে অর্থ নিয়ে, পড়ন্ত জমিদারের অর্থ নেই তাই অশান্তি। নান্তি শিবনাথকে চাকরি করে অর্থোপার্জনের পরামর্শ দেয়—নিঃস্ব জমিদার শিবনাথের আত্মসম্মানে তখন আঘাত লাগে। নান্তি ব্যঙ্গ করে শিবনাথের জমিদারী নিয়ে "—বাবা, তোমার ধানের চরণেও প্রণাম, তোমার জমিদারীর চরণেও প্রণাম"[১] নান্তি শিবনাথের দাম্পত্য জীবন, পরিবারিক জীবন তুই-ই বিপর্যস্ত হয়েছে এই জমিদার ও শিল্পপতি-ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বে। লক্ষ্মীর বরপুত্রের পায়ের ধুলো পড়ল জমিদারের মেয়ের ঘরে, তাঁর নাম রামকিঙ্করবাবু, লক্ষপতি ব্যবসায়ী কলকাতায় থাকেন, জমিদারের মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে লক্ষপতি তাঁকে ব্যারিষ্টার আখ্যা দিয়েছিলেন, কিছু উদ্দেশ্য ছিল, তাও প্রকাশ পেল, জমিদারদের সামাজিক মর্যাদা লক্ষপতি হলেও ব্যবসায়ীরা তখনও পাননি, সুতরাং 'সেই জাতে' উঠার জন্য তুর্বল পড়ন্ত কোন জমিদারই ব্যবসায়ী বুদ্ধির লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক, রামকিঙ্করবাবু চৌদ্দ বছরের নাবালক জমিদারের সঙ্গে তার মা-মরা ভাগ্নীর বিয়ে দিতে চান। জমিদারী অভিমানে খটকা লাগল। জমিদারের মেয়ে বললেন, "এখন একথার জবাব দিতে পারলাম না ভাই, কাল জবাব দেব।" রামকিঙ্করবাবু এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি ঈষৎ উষ্ণভাবে বললেন, "কেন, আপনাদের জমিদারের ঘরের উপযুক্ত হবে না আমার ভাগ্নী"? অভিমানে অভিমানে সংঘর্ষ ; একটি মধ্যাহ্নগগনচুম্বী নবোদয়ে তীব্র, আর একটি অস্তাচলমুখী সিঁদুরবরণ…"পিসিমার চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, ঠিক উলটো ভাবছি ভাই, ভাবছি হাতীর খোরাক যোগাতে কি আমার শিবনাথ-

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ২১৮

পারবে? লক্ষপতি ঘরের মেয়ে আমাদের মত ছোট জমিদারের ঘরে খাপ খাবে? রামকিঙ্করবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, না, না, আপনার দাদার আমাদের ঠাকুরদার প্রতাপে বাঘে বলদে একঘাটে জল খেয়েছে, তার ছেলে শিবনাথ, সে বাঘিনী হলেও বশ মানাবে"[১] কিন্তু বাপপিতামহের প্রতাপ থাকলেও এ বাঘিনী সর্বদা বশীভূত হয়ে থাকেনি। তাই শিবনাথ, পিসিমা-দুজনের সাথেই লক্ষপতি ব্যবসায়ী বাড়ীর মেয়ে নাস্তির সংঘর্ষ বেধেছে। বংশগরিমা ও জমিদারী অহঙ্কারের আজন্ম সংস্কার অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি বলেই হয়ত তারাশঙ্কর এই অর্থশালী ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রসন্ন বোধ করেননি কোনদিন।

'কালিন্দী'তে ব্যবসায়ী-জমিদার দ্বন্দ্বটি আরো বেশী স্পষ্ট, ধাত্রী-দেবতায় জমিদারগোষ্ঠীর প্রতিদিনের সমস্যা, দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টিতে খাজনা অনাদায়ের জন্য অর্থকৃচ্ছ্রতা ইত্যাদির বর্ণনা আছে। 'কালিন্দী'তে জমিদারদের সমস্যা অনেক বেশী জটিল হয়ে উঠেছে। জ্ঞাতিবিরোধ প্রজাবিদ্রোহ, চরের স্বত্ব নিয়ে মামলা মোকদ্দমা, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সাথে সংঘর্ষ ইত্যাদি। একটি চরকে কেন্দ্র করে রায় বাড়ী ও চক্রবর্তী বাড়ীর দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান হল। এই চরের আধিপত্য লাভ করতে গিয়ে বহু হতভাগ্য প্রাণ দিয়েছে, মহীন্দ্রকে দ্বীপান্তর যেতে হয়েছে, এরপর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন ইন্দ্ররায় ও বিমলবাবু। বিমলবাবু চিনির কলের মালিক, বড় ব্যবসায়ী। জমিদারদের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল, হল মামলা মোকদ্দমা, মামলায় জয় হল তারই। সে এবারে নূতন পদ্ধতিতে চাষ আরম্ভ করল। জমিদার রামেশ্বর রায় এবং ব্যবসায়ী বিমলবাবু দুই জনই দুশ্চরিত্র। রামেশ্বর নিজের চরিত্রহীনতা স্ত্রী রাধারাণীর উপর আবোপ করে তাকে ও নিজ সন্তানকে সন্দেহভ্রমে হত্যা করেন।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ১৩।

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে যান, সারাজীবন ধরে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। সারীকে কেন্দ্র করে বিমলবাবুর ব্যভিচারী প্রকৃতি দেখানো হয়েছে। রামেশ্বরও একই দোষে দুষ্ট কিন্তু সেখানে তারাশঙ্করের লেখনী অনেক সংযত, মিতবাক। বরং বেশী প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কাব্যপ্রিয়তা, রুচিশীলতা ও ধর্মানুরাগ। বিমল-বাবুর মধ্যে—অর্থাৎ শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী চরিত্রে, কণামাত্র সদগুণও দেখা যায় না—নিছক স্বার্থপর এক চরিত্র তার। এই বিরূপ দৃষ্টি তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের ব্যবসায়ী-শিল্পপতি চরিত্রে আরোপিত হয়েছে। তুলনায় জমিদার চরিত্রের প্রতি তিনি অতি সহানুভূতিশীল।

জমিদাররা মামলায় পরাজিত হলে ব্যবসায়ীর অধিকার 'কালিন্দীর' চরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু প্রজারা জমিদার ও ব্যবসায়ী কারো কাছেই সুবিচার পেল না, উভয়পক্ষই তাদের অশেষ নির্যাতন করল। অহীন্দ্র তারই বিশ্লেষণ করছে,

> "কলওয়ালা বিমলবাবু, তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সরলা সাঁওতালদের মেয়ে সারীকে জোর করিয়া করায়ত্ত করিয়া তাহার সর্বনাশ করিয়াছে, সাঁওতালদের জমি আত্মসাৎ করিয়াছে। তাহারা নিজেরা, তাহার শ্বশুর তাহার বাবা বাকি-টুকু কাড়িয়া লইয়াছেন। রাত্রি শেষের অস্পষ্ট আলোকময় অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো মানুষের সারি কাঁধে ভার, মাথায় বোঝা, সঙ্গে গরু ছাগল ভেড়ার পাল, বসতি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, নিঃশেষে ভূমিহীন হইয়া চলিয়া গেল।"[১]

এই ভূমিহীন, নিঃস্বদের নিকট জমিদার যেমন শিল্পপতিও তেমন। কিন্তু তারাশঙ্কর তবু জমিদার চরিত্রের উদারতা ধর্মানুরাগ আর আভিজাত্যের প্রতি আকৃষ্ট, মামলায় পরাজিত হতভাগ্য জমিদার

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কালিন্দী, পৃঃ ৪১৪

ইন্দ্ররায়কে কাশী পাঠাচ্ছেন—সুনীতির বেদনার প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের মধ্যে তবু যেন হৃদয়ধর্মকে খুঁজে পাচ্ছেন—শিল্পপতি বা মহাজনরা তাঁর কাছে কেবল নিষ্ঠুরতার প্রতি-মূর্তি হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই সাঁওতালদের উচ্ছেদ করার জন্য অধিক দায়ী মনে হয় শিল্পপতিদেরই। অথচ জমিদাররা এমন কাজ কিছু কম করেননি। এ সত্য অনুধাবন করা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাননি—তাঁর জমিদারী মোহও ঐতিহ্যানুরাগ যুক্তিবাদকে অগ্রাহ্য করেছে, এবং জমিদার বংশোদ্ভূত তারাশঙ্করকে এখানেই থামতে হয়েছে।

'কালিন্দী'তে জমিদারী ব্যবস্থায় কিভাবে ভাঙন ধরেছে তারাশঙ্কর তারও অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—পাশাপাশি দেখিয়েছেন মধ্যস্বত্ব-ভোগী ও মহাজনদের আবির্ভাব। প্রথমে জমিদারদের আত্মকলহের মধ্যেই সে ভাঙনের শুরু। 'কালিন্দী'র চরটাই এই আত্মকলহের বিষয়বস্তু, "এখানকার প্রাচীন জমিদার বংশ রায়েরা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। সেই বহু বিভক্ত রায় বংশের প্রায় সকল শরিকই চরটার স্বামিত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত একহাতে লাঠি ও অপরহাতে কাগজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইহাদের মধ্যে আবার মাথা গলাইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল জন দুইয়েক মহাজন এবং জনকয়েক চাষীপ্রজা।...জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি—চর তাঁহার সীমানায় উঠিয়াছে সুতরাং সেটা তাঁহারই খাসদখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি—তাঁহার নিকট 'আবদ্ধী'য় জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে সুতরাং চর তাঁহার নিকট আবদ্ধীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।"[১] চক্রবর্তী বাড়ীর বিচক্ষণ নায়েব যোগেশ মজুমদার চক্রবর্তীদের সম্পত্তি কিভাবে গ্রাস করল তারও বিবরণ আছে। মহীন্দ্রের মামলায় চক্রবর্তী বাড়ীর অর্থনাশ হয়েছিল অনেক—

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: কালিন্দী, পৃঃ ১।

"মজুমদারের বন্দোবস্তে টাকার অভাব হয় নাই, হ্যাণ্ডনোটেই টাকা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু টাকা থাকিতেও বাকী রাজস্বের দায়ে একদিন সম্পত্তিও নিলাম হইয়া গেল……সম্পত্তি তখন নিলামে বসিয়া আছে, ডাকিয়াছেন চক্রবর্তী বাড়ির মহাজন—মজুমদার মহাশয়েরই শ্যালক। লোকে কিন্তু বলিল শ্যালক মজুমদারের বেনামদার।"[১] এছাড়া শ্রীবাস পালের মত চতুর ব্যক্তিরাও এই বিবাদে অংশগ্রহণ করে মিলের মালিকের সহায়ক হল স্বার্থসিদ্ধির আশায়, মিলের মালিকের প্রতারণা ও বঞ্চনার সাহায্যকারী হল ঐ নায়েব যোগেশ মজুমদার। চাষী, সাঁওতাল, জমিদার সকলকে এই চরের জমির অধিকারচ্যুত করার কাজটা এদের সাহায্য পাওয়ার ফলেই আরো সহজে হয়ে গেল। রংলাল যোগেশ মজুমদারের ঐ প্রতারণার কথা খুলে বলল ইন্দ্ররায়কে—সেলামির টাকা তাদের ছিল না—'উনিই আমাদিগে টাকা দিয়েছিলেন। আমাদের 'বাপুতি' সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে দলিল করে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, চরের জমি বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এ দলিল ফেরৎ দিয়ে চরের জমি বন্ধক দিয়ে দলিল করে দিতে হবে। এখন নতুন দলিলে সই করিয়ে নিয়ে বলছে হুজুর, বন্ধক নয় জমি তোদের বিক্রী হয়ে গেল এ দলিল কবলা-দলিল।"[২] জমির লোভে জমিদারী সম্পত্তির অংশলাভ করতে নায়েব, মহাজন সকলেই তৎপর, এবং সর্বশেষে তা মিল মালিক অর্থাৎ নব্য ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হল। আমাদের দেশে জমিদারী প্রথার বিনাশ হয়েছিল যে দীর্ঘস্থায়ী ক্রমিক প্রক্রিয়ায় তারাশঙ্কর তারই নিঁখুত চিত্র অঙ্কন করেছেন এখানে।

জমিদারদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি লক্ষ্য করে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—"আপনার লেখায় এমন এক ধরণের দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে আছে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কালিন্দী পৃঃ ৯৯-১০০।

২। " " পৃঃ ৪০৩।

যাকে ঠিক ব্যাখ্যা করে বলা যায় না অথচ প্রতিমুহূর্তে মনে হয় পুরানো আভিজাত্যের পতনে আপনি ব্যথিত ও দুঃখিত, ধরুন 'জলসাঘরের' কথাই। ওতে কি আপনি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিই বেশী সহানুভূতি দেখাননি? মিনিট খানেক ভাবলেন··· হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে রাজেন মল্লিকের বাড়ী গিয়েছ কখনো—যাকে সবাই মার্বেল প্যালেস বলে? ···ভাবো তো এখনকার অবস্থাটা। দেখাশোনার কেউ নেই। এককালে কি জাঁকজমকই না ছিল। দেউড়ীতে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে, চতুর্দিকে লোকজনের কোলাহল, আত্মীয়-স্বজনের ভীড়, ওপরতলা থেকে যখন বড়কর্তা নেমে আসতেন, যখন তাঁর খড়মের শব্দ হতো তখন সমস্ত বাড়ীটাই সজাগ হয়ে উঠতো—সবাই সতর্ক যেন তার উপস্থিতিও একটা ঘটনা। একটু থেমে উদাহরণ দিয়ে বললেন, এই বড়কর্তাকে কি মনে হয় না একটা বাঘের মতো মানুষ? তিনি যতটা ভয়ের ততটাই আকর্ষণীয়। এরকম একটা মানুষের পতনে হাহাকারটাও বড় হয়েই বুকে বাজে। নাহলে শিল্পী হলুম কেন? ···এমন একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশের প্রকৃত শাসনের দায়িত্বটা পড়েছিল আভিজাত জমিদারদের উপর। তাঁরা যেমন ভালো কাজ করেছেন, তেমনি মন্দ কাজও করেছেন। ওঁরাই ছিলেন শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, তৈরী করেছিলেন রাস্তাঘাট মন্দির মসজিদ দীঘি পুষ্করিণী, স্কুলকলেজ, বলা যায় গ্রাম বাংলার পুরো সংস্কৃতিটাই গড়ে উঠেছিল ওঁদের আশ্রয়ে, ওঁদের সাহায্যে। ······যা অনিবার্য তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই, আমিও পরিবর্তন চাই। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে পুরানোকে বিদায় দিতেই হবে একথাও মানি। কিন্তু যা যায়, তারজন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবো না, হাহাকার করবো না—তাই বা কেমন করে হয়?"[১]

১। গৌরাঙ্গ ভৌমিক: কালিকলম (কয়েকপ্রহরের স্মৃতি), অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ: ৭২-৭৩।

বলাবাহুল্য, তারাশঙ্করের এই উক্তি তাঁর জমিদারী ঐতিহ্যানুরাগ সম্পর্কীয় যে কোন সন্দেহ নিরসন করে। তারাশঙ্করও যে পরিবর্তন প্রত্যাশী, কালিন্দীর অহীন্দ্র কিংবা ধাত্রী দেবতার শিবনাথ চরিত্রই তার প্রমাণ। জমিদার সন্তান হয়েও তারা নতুন যুগের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত—নিপীড়িত নিগৃহীত মানুষের দুঃখে বেদনায় ভারাক্রান্ত, জমিদারী সম্পত্তির প্রতি নিরাসক্ত। "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতের গণআন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে, নূতন অধ্যায়ের সূচনায় রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুবক-সম্প্রদায়ের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল।"[১] অহীন্দ্রও এই যুবকদের প্রতিই আকৃষ্ট—এক পথের পথিক।

শিবনাথ জমিদারী সম্পত্তিকে প্রজাহিতসাধনে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা করে ধনতন্ত্রের ধারকদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা চোখে পড়ে না। 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসের অত্যাচারী ব্যভিচারী জমিদার মহেন্দ্রবাবুও যেন স্বগ্রামপ্রীতিতে লেখকের সহানুভূতি পেয়েছেন, "গ্রামের মধ্যে তিনটে টিউবওয়েল করিয়ে দেব ভাবছি, বড় জলের কষ্ট গ্রামের মধ্যে।" কিংবা "গভর্ণমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্টে একখানা পত্র লেখ দিকি টিউবওয়েল বসানোর কথা জানিয়ে। গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন হয়ে গেল, কেউ যদি কিছু ভাবে।"[২] তারাশঙ্কর লিখছেন—

"মহেন্দ্রবাবু চিন্তা করিতেছিলেন দেশের ম্যালেরিয়ার কথা। এ চিন্তা বড়লোকের সখ কিনা কে জানে, কিন্তু তাঁহার এ চিন্তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। জীবনের পাপ, পুণ্য, ন্যায়,

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: কালিন্দী, পৃঃ ৪১২-১৩।
২। " : প্রেম ও প্রয়োজন, পৃঃ ২১।

> অন্যায়, আত্মীয়সমাজ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক একসময়ে এই বিচিত্র মানুষটির মনে এই ধারার চিন্তা জাগিয়া উঠিত।"[১]

তারাশঙ্কর জমিদারদের দান সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন ছিলেন। আত্মকথায় লিখেছেন—

> "তাছাড়া জমিদারদের দান আছে, বাংলার বড় বড় মজে যাওয়া দীঘি, পথের পাশে গাছ—এ তাঁরা দিয়েছেন। বাংলার মন্দির তাও তাঁদের প্রতিষ্ঠা করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত থেকে ইস্কুল হাসপাতাল তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামায়ণ মহাভারত পুরাণের পুনরুদ্ধার—তার বঙ্গানুবাদ তাঁরাই করিয়েছেন। আজও পর্যন্ত শব্দ-কল্পদ্রুমের মত বৃহৎ কর্ম আর সম্ভবপর হয়নি। দুর্ভিক্ষে মহামারীতে ঝড়ে-তুফানে অগ্নিকাণ্ডে পল্লীর সর্বনাশে তাঁরাই অকাতরে সাহায্য করেছেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মহিমময় মানুষগুলি বাঙালীর জীবনে এসে বাঙালী জাতিকে অবিস্মরণীয় গৌরবের অধিকারী করে গেলেন মাত্র একশো বছরের মধ্যে, তাঁদের শতকরা বোধ হয় পঁচাত্তরজন এই এঁদের রক্ত থেকেই উদ্ভূত।"[২]

জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হল যখন, তখন তারাশঙ্কর তাদের সমব্যথী হয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন। এসকল দানের কথা স্মরণ করে বেদনা অনুভব করেছিলেন—"এই কারণেই এই সম্প্রদায়ের এবম্বিধ শোচনীয় ধ্বংসের কথা ভাবতে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: প্রেম ও প্রয়োজন, পৃঃ ১২।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি, চৈত্র, ১৩৭১), পৃঃ ৪৪১।

পারিনি। এর সঙ্গে আরও একটি কথা সত্য বলে মনে হয়েছিল—সেটি হল এই যে, সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য মানুষকে মন্দই করে তুলে, এইটেকে সত্য বলে ধরে নিলে অন্যায় হবে।”[১]

এই দানধ্যান যে আসলে অত্যাচার অবিচার নিপীড়ন বঞ্চনা ও শোষণের ফলে সংগৃহীত পুঁজি থেকেই হয়ে থাকে এবং জমিদারী বদান্যতায় সেই দিক থেকে মহত্ত্ব আরোপ করার তেমন কিছু নেই, তারাশঙ্কর সেই বিষয়ে নিরুচ্চার ছিলেন। তাছাড়া শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরাও যে এমন অনেক দানই করেছেন, শোষণের সঞ্চিত অর্থে সময় সময় জনসেবা করতে তারাও যে জমিদারদের মতই আগ্রহী একথা তারাশঙ্কর স্বীকার করতে চাননি। এটাও তাঁর শিল্পপতিদের প্রতি অপ্রসন্ন মনোভাবেরই নিদর্শন।

আয়ুর্বেদ বনাম আধুনিক ভেষজ :

‘আরোগ্য নিকেতন’ উপন্যাসে প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি তারাশঙ্করের আনুগত্য দেখি আবার। ‘আরোগ্য নিকেতন’ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি। প্রাচীন ও নবীন চিকিৎসাশাস্ত্র কালসন্ধিক্ষণে মানুষের মনে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে ‘আরোগ্য নিকেতনে’ তার সার্থক চিত্র আছে। এ উপন্যাসে জীবন-মৃত্যুর দোলায়িত রূপই কেবল নয়—তাতে জীবনমৃত্যুর পশ্চাৎপটে যে জীবনদর্শন তাকেও রূপায়িত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এ জীবনদর্শন আধুনিককালের জীবনদর্শন নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> “জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সন্ধিস্থাপনের দৌত্যকার্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপর ন্যস্ত। ব্যবসায় মধ্যে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কথা (শনিবারের চিঠি, চৈত্র, ১৩৭১), পৃঃ ৪৪১।

বৃত্তি আর নাই। চিকিৎসা ব্যবসায়ের পিছনে যে মনোভাব ও কর্তব্যনিষ্ঠা বিদ্যমান তাহাই একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড। এই বৃত্তি সম্পর্কিত সদাচার (Professional etiquette) বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন। তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাচীন আয়ুর্বেদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা উভয় পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ভাবদৃষ্টি ও জীবন তাৎপর্যের পার্থক্যটি সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে।"[১] চিকিৎসাশাস্ত্র 'আরোগ্য নিকেতনে' কেবলমাত্র রোগনির্ণয় এবং রোগ নিরাময়ের প্রক্রিয়ামাত্র বলে বিবেচিত হয়নি। রোগীর ঐহিক জীবন ও পারত্রিক জীবনকে সূত্রবদ্ধ করে একই সঙ্গে সমগ্র জীবনযাত্রার নীতি-নির্দেশ, ও আদর্শ প্রদর্শন করে, সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতির শিক্ষা ও উপদেশ দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কুশল সাধনের প্রচেষ্টা দেখা যায়।এখানে চিকিৎসক তাই শারীরতত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও অন্তর্ভেদী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। কারণ তিনি ধ্যানযোগীর ন্যায় ব্যাধির মূল কারণ ব্যাধিগ্রস্তের সমগ্র জীবনযাত্রার পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করে তাকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নির্দেশ করেন। চিকিৎসককে হতে হয় নির্লোভ আদর্শ-পরায়ণ নিরাসক্ত ও উদারচিত্ত।"

'আরোগ্য নিকেতনে' তারাশঙ্কর ভারতীয় জীবনদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন, জীবন-মৃত্যুর আন্দোলনে জীবনে যে সকল উপলব্ধি হয়, তারাশঙ্কর তারই সুগভীরে প্রবেশ করেছেন এখানে। এতে জীবনের নীতিবোধ. অধ্যাত্মবোধ সংমিশ্রিত হয়ে জীবনকে এক

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৫৭২।

দুর্জ্ঞেয় পথে পরিচালিত করে, জীবনের মধ্যে মানুষ তখন মরণের লীলা দেখে, এক একটি স্তরে এক একটি অনুভূতি সোচ্চার হয়ে উঠে —আনন্দের বার্তা আনে। মানুষ অজ্ঞাত সত্যের অনমুমেয় রূপটির অনুসন্ধানস্পৃহায় আকুল হয়—ক্রমে জীবনে আসে গভীরতা, প্রশান্তি —মৃত্যুকে অকুণ্ঠচিত্তে বরণ করে বলে, "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।" জীবনমশায় এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আজীবন তিনি জীবন-মৃত্যুর রহস্য অন্বেষণ করেছেন—মরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনের শাশ্বত রূপ। "জীবনমশায় নাড়ীর মধ্যে কালের পদধ্বনি অনুভব করতে পারেন। এটি তাঁর পিতৃ পিতামহের বংশগত সম্পদ। তাঁরা ছিলেন কবিরাজ। তিনি প্রথম ডাক্তার হয়েছেন। কবিরাজি অবশ্যই জানেন—প্রয়োজনে দুইমতেই চিকিৎসা করে থাকেন। তবে এই নাড়ী দেখাই তাঁর বিশেষত্ব। নাড়ী স্পন্দনের মধ্যে রোগাক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে রোগীর রোগের স্বরূপ এবং কালের দ্বারা আক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে কাল কতদূরে তাও তিনি বুঝতে পারেন।"[১] জীবনমশাই জীবন-মৃত্যুর লীলাকে অনুভব করেছেন— তাই কেবলমাত্র চিকিৎসকই ছিলেন না—ছিলেন জীবনদ্রষ্টা। তাঁর পিতা তাঁকে মৃত্যুর মধ্যে অমৃত অন্বেষণের শিক্ষা দিয়েছেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে নীতিজ্ঞান শিক্ষা, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত উপলব্ধির দীক্ষা, 'পরমানন্দ মাধব'কে পাবার প্রেরণা দিয়েছেন। 'আরোগ্য নিকেতনের' মৃত্যুদর্শন ভারতীয় মৃত্যুদর্শনেরই প্রতিরূপ। বিভিন্ন তান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছে এই মৃত্যুভাবনা—উপনিষদের অমৃত প্রাপ্তির সঙ্গে জীবনের পরিপূর্ণতার তুলনা করা হয়েছে। মৃত্যুটা যে গীতার সেই জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধানের মতো স্বাভাবিক ঘটনা সুতরাং একে শান্ত সমাহিত হয়ে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, এতে পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়—তারাশঙ্কর এই জাতীয় ইঙ্গিতও

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য নিকেতন, পৃঃ ৭-৮

দিয়েছেন বারে বারে। এই মৃত্যুকে স্থিরচিত্তে গ্রহণ করার জন্য মানুষের ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। তারাশঙ্কর সেকালের মানুষের মধ্যেই এই সহিষ্ণুতা দেখেছেন, একালের নয়—একথাও জানিয়েছেন।

"আজকের দিনে নিজেরাই প্রবীণ হয়ে এসেছি, এই বয়সে একালের অনেক প্রবীণের অন্তিমশয্যার পাশেও উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সেকালের মানুষদের মৃত্যু সম্মুখীনতার সময়ের রূপ বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। প্রবীণদের কথা বাদই দিচ্ছি, যাঁরা নাকি পঞ্চান্ন ষাট বৎসর বয়সেও মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁদেরও শতকরা আশী জনকে আশ্চর্য প্রশান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেখেছি, যেটা নাকি একালে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হবে না।"[১]... "সজ্ঞানে প্রবীণেরা মৃত্যুকালে প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন, পরমাত্মীয়দের নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন। একটা কথা সকলেই বলে যেতেন—অধর্ম করো না সংসারে, দুঃখ কাউকে দিয়ো না, আর বলতেন কে তাঁর কাছে কি পাবে। সে পাওনা শুধু আর্থিক পাওনাই নয়—অন্যবিধ পাওনাও বটে। বলতেন অমুক আমার এই বিপদের সময় মহৎ উপকার করেছিল ; আমি তার কিছুই করতে পারিনি তুমি এই উপকারের ঋণশোধ করো...অনেকে কাশীতে অথবা গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করতে আয়োজন করে খোলকরতাল বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে প্রতি দেবালয়ে প্রণাম করে চলে যেতেন—দৃষ্টি আবদ্ধ থাকতো হয়ত আকাশের দিকে অথবা গ্রামের সর্বোচ্চ তরুশীর্ষে—কে জানে!

আজ পঞ্চাশোর্ধে যখন দিন চলেছে, তখন এই যাওয়াকে আর তুচ্ছ করতে পারিনি কোনমতেই। বসে বসে ভাবি আর অনুভব করি যেন তাদের এই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে অন্তত কিছু

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৪৬।

পরিমাণও অমৃতের স্পর্শ আছে, সাধক রামকৃষ্ণের গান মনে পড়ে—
"আনরে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে"। হয়তো সবটাই
মানসিক বিকৃতি। এই বিকৃতি এতই প্রচণ্ড যে, পাগলের আনন্দে
মৃত্যুকে বরণ করতেন তাঁরা—এ বললে তর্ক করব না। সবিনয়ে মাথা
নত করে হার স্বীকার করেও বলব নূতনকালকে—নূতনকালের সত্যকে
স্বীকার করে মাথায় নিয়েও কামনা করি, মৃত্যুর সময় যেন এমনই
পাগলের আনন্দেই মৃত্যুকে বরণ করতে পারি অর্থাৎ কল্পনায়ও
অমৃতবিন্দুর আস্বাদ পাই।"[১] তারাশঙ্কর সেকালের এই ভাবধারায়
অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এছাড়া নিজেও অনেক মৃত্যুপথযাত্রী
মৃত্যুকালীন স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা দেখেই সম্ভবতঃ মৃত্যুকালে এই প্রশান্তি
ও আনন্দ নিজেও কামনা করেছিলেন. 'আরোগ্য নিকেতনে' জীবন-
মশায়ের চরিত্রে এই সত্যই চিত্রিত করেছেন।—"আজকাল প্রায়ই
একটা কথা শোনা যায়—মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কেউ
করে কি? মৃত্যু জীবনের পরিণাম, মৃত্যু নূতনকালের নব বংশধারার
পৃথিবীতে অবতরণের গোমুখী। এ নিয়ে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা
অনেক গবেষণা করেছেন। আজই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য
নানাদেশে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রসার লাভ করছে।
বৈজ্ঞানিকেরা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন না—করেন রোগের সঙ্গে।…
ভারতবর্ষ চিরদিন মৃত্যুর মধ্যে অমৃত কল্পনা করেছে, সন্ধানও করেছে।
মৃত্যুভয়কে জয় করো, পরিণত বয়সে মৃত্যুর সিংহদ্বার পথে অমৃত-
লোকে প্রবেশ করো; উত্তর পুরুষের আগমনের পথ উন্মুক্ত করো।"[২]
আরোগ্য নিকেতনে' জীবনমশাই মৃত্যুর মধ্যে সেই অমৃতকে অন্বেষণ
চিকিৎসক হিসাবে মৃত্যুর শাশ্বত লীলাকে বিভিন্ন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কালের কথা, পৃঃ ৪৬-৪৭।

২। " : আরোগ্য নিকেতন, নাট্যরূপের ভূমিকা
পৃঃ ৵০।

মানুষের জীবনে লক্ষ্য করেছেন—নিজের জীবনে এই মৃত্যুকে স্বাগত জানিয়েছেন। সেকালের এই মৃত্যু ভাবনাটি জীবনমশাইয়ের চরিত্রে সুস্পষ্ট সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে।

'আরোগ্য নিকেতনে'র ভাবধারা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার কথা'য় ৫ই জুন ১৯৬৪র নিজস্ব ডায়েরী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন —"আরোগ্য নিকেতন যখন লিখেছিলাম, তখন মনে একটি আদর্শ বা কল্পনা গড়ে তুলেছিলাম। শেষজীবনটা শুধু ভাবব, খুঁজব, ডাকব, এই তিনপথে জগৎ এবং জীবনের উৎসকে, কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি, সেইটে জানবার বোঝবার বা যদি কেউ বলবার থাকে তবে তাব কাছে শোনবার চেষ্টা করে যাব। অতি সজ্ঞানতার মধ্যে মৃত্যু আসবে তার পদধ্বনি শুনব, তার স্পর্শ অনুভব করব। বলে যাব, সে ধ্বনি, সে স্পর্শ এমনি এমনি। মৃত্যুকে অনুভব করে তাও বলে যাব, কিন্তু কর্মচক্র আমাকে নিয়ে চলেছে ঠিক উলটো পথে, হয়ত খাটতে খাটতে মগ্ন থাকব, তারই মধ্যে অতর্কিতে সে কখন কোনদিক থেকে আসবে জানতেও পারব না। হয়তো পিছন দিক থেকে অতি পরিচিতের মত চুপিচুপি এসে চোখ চেপে ধরার মত চেপে ধরবে, আমি বলবারও সময় পাব না যে, চিনেছি তোমাকে চিনেছি গো, তার আগেই তার স্পর্শমাত্রে পরমানন্দের নৈঃশব্দের মধ্যে আমার চৈতন্য আমার ব্যক্তিসত্তা নিমগ্ন হয়ে যাবে প্রসন্ন নিথরতায়।

মৃত্যুকে পুরুষ ভাবতে চায় নারীরূপে, নারী ভাবতে চায় পুরুষ-রূপে। মৃত্যুর একটি ছবি এঁকেছি, মহাভারতে মহর্ষি বেদব্যাসের কল্পনাতেও সে নারী"[১] তারাশঙ্কর 'আমার কথা'য় রঞ্জনকুমার দাসকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১), পৃঃ ১২৩।

সম্বোধন করে লিখেছেন—"মোটকথা, আমি বর্তমানে বর্তমান জীবনের আনন্দ প্রতিষ্ঠা গৌরব এসব থেকে ভবিষ্যতের মৃত্যুর অজ্ঞাত রহস্য—সে যদি এক মহাশূন্যতা বা মহানাস্তিই হয়—তাই আমি জানতে চাই গভীরতর আগ্রহে। এ নিয়ে অনেক কথা তোমার সঙ্গে হয়েছে। তুমি নাস্তিবাদী আমি জানি। তবু তোমার সঙ্গে কোনখানে একবিন্দু বিরোধ নেই। এই আমার যে বর্তমানের স্বরূপ এর মধ্যে সাহিত্যের স্থান যেরূপ আছে, তেমনি আছে আবার জীবনচর্যা সবটুকু। একেই আমার সাহিত্যে বর্তমানে রূপ দিতে চেয়েছি।" মোট কথা এই মৃত্যুতত্ত্বের অজ্ঞাত রহস্য নিয়ে তারাশঙ্কর অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত। তাই তাঁর নিজস্ব চিন্তার স্বরূপই নিঃসন্দেহে ধরা পড়েছে জীবনমশাই-এর চরিত্রে। তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন—জীবনমশাই-এর জীবনদর্শন। এখানে জীবনমশাই-র মৃত্যুভাবনা তাঁরই মৃত্যুভাবনা। সনাতন ভারতের মৃত্যুদর্শনই এখানে বিধৃত। প্রাচীনপন্থী জীবনমশায়ের অধ্যাত্ম পিপাসায় তারাশঙ্করের অধ্যাত্ম পিপাসার ছায়াপাত হয়েছে, এবং তার অতৃপ্তিতে তারাশঙ্করের অতৃপ্তির সুরটিই বেজে উঠেছে। যা চাই যাকে চাই পাই না, সেই বিরহবেদনা অবিরাম উৎসারিত বিশ্বজীবন জুড়ে। যা চাই যাকে চাই তা অন্নে নেই, বস্ত্রে নেই, প্রতিষ্ঠায় নেই, হয়তো বা জীবনে যাদের পরমধন ভাবি, তাদের মধ্যেও নেই। সে আছে ওই বিরহের উৎসকেন্দ্রে, বা বিরহের মধ্যেই তার স্থিতি। সময় সময় মনে হয়, সে ধরা দিতে দেখা দিতে চেয়েও পারে না তাই তার বাস ওই বিরহে বা তার স্বরূপই হয়ে গেছে ওই বেদনা। এই বিরহ বা বেদনাস্রোতের উৎসকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১), পৃঃ ১২৫।

ছুঁতে আমি পারিনি, তবে তার দূরাগত স্পর্শ পেয়েছি। মৃত্যুর মধ্যে আমি সেই উৎসকে স্পর্শ করব। মৃত্যুতে আমার বিমুখতা নেই। তাকে ভয় আমি করিনে।"[১]

প্রাচীনকালের এই মৃত্যু ভাবনা ও চিকিৎসাপ্রণালী আধুনিক ভেষজ বিদ্যার সাথে আধুনিক জীবনধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। সূচনা হয়েছে উত্তাপ, উত্তেজনা ও সংঘাত—দুই জীবনধারার মধ্যে। নূতন বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় যে অবিশ্বাস ছিল তা নয়, কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রও ভ্রান্ত নয়, তাই এই উপন্যাসের বক্তব্য, আসলে কোনটিকেই বর্জন করতে না পারায় লেখক দ্বন্দ্ব-পীড়িত হয়েছেন। প্রদ্যোৎ ডাক্তার ও জীবনমশাইয়ের আদর্শের দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে তারাশঙ্করেরই অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছে। প্রদ্যোৎ ডাক্তার এযুগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবিদ্যায় বিশ্বাসী, প্রাচীন পদ্ধতিতে নিদানহাঁকা ইত্যাদি সে পছন্দ করে না। সে ভাবে, "নতুনকাল, বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ। ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে। একালে অনেক আয়োজন চাই। অনেক কিছুর আয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন—এই লোকগুলির নির্বাসন। এই জীবনমশাইদের, নিদান, নিদান। মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটা প্রেম করে বসে আছে এদেশ। গঙ্গার ঘাটে মরাই যেন এখানে জীবনের কাম্য।"[২] লড়াই শুরু হয় প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র আর নবীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের। প্রদ্যোত প্রাণপণে চিকিৎসা

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমার কথা (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১), পৃঃ ১২৫।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আরোগ্য নিকেতন, পৃঃ ১৮১—১৮২।

করে—একাগ্রতা, নিষ্ঠার কোন অভাব নেই সে চিকিৎসায়, জীবনমশাই অবশ্য তাতে স্থানচ্যুত হননি। কারণ গ্রামের অনেক লোকই এখনও নিদানহাঁকা, আয়ুর্বেদশাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা, নাড়ী পরীক্ষায় অতিবিশ্বাসী। জীবনমশাই এই এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি বিরূপ মতবাদ পোষণ করেন না সত্য, বরং কখনো কখনো এর অত্যাশ্চর্য রূপ তাকে মুগ্ধ করে—কিন্তু তাই বলে নিজের প্রতি এই অবহেলাও কাম্য নয় তাঁর। ব্রজলালবাবুর দৌহিত্রের নাড়ী পরীক্ষাকালে "এসব কী করছেন এঁরা, হাতুড়ে ডেকে হাত দেখানো—এগুলো ভালো নয়"[১] এসব কথা তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন। অথচ তাঁর নাড়ী পরীক্ষাই বাস্তব সত্যকে ঘোষণা করেছিল, ছেলেটি মারা গিয়েছিল আঠারো দিনের দিন। এছাড়া প্রদ্যোত ডাক্তারকেও মশাই তাঁর চিকিৎসার ফলাফল দেখিয়েছেন, চিকিৎসা সম্পর্কে তাকে নানা সদুপদেশও দিয়েছেন, রঙলাল ডাক্তারের উক্তিকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুসারী চিকিৎসা ও আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন। রঙলাল ডাক্তার জীবনমশাইকে বলেছেন—"তুমি যদি ডাক্তারী পড়তে হে বড় ভালো করতে, তোমার মধ্যে একজন জাত চিকিৎসক রয়েছেন। কবিরাজি শাস্ত্রে কিছু নেই একথা আমি বলছি না। কিন্তু আমাদের জাতের মত শাস্ত্রটিও কালের সঙ্গে আর এগোয়নি। যেকালে এই শাস্ত্রের সৃষ্টি—চরম উন্নতি, সেকালে কেমেষ্ট্রির এত উন্নতি ছিল না, তাছাড়া আরও অনেক কিছু আবিষ্কার হয়নি। তারপর ধরো, কত দেশ থেকে কত মানুষ আমাদের দেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে তাদের দেশের রোগ এদেশে এসেছে—জল বাতাস মাটির পার্থক্যে বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। তাছাড়া আয়ুর্বেদ আগন্তুজ ব্যাধি বলে যেখানে থেমেছে, ইউরোপের চিকিৎসাবিদ্যা মাইক্রোস্‌কোপের কল্যাণে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আরোগ্য নিকেতন, পৃঃ ২১৫।

জীবাণু আবিষ্কার করে অনুমান ও উপসর্গের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছে বহু দূরে এগিয়ে।

আধুনিক কালের রোগচিকিৎসা নিয়ে ইনি অনেক কথা বলেছিলেন, জীবন দত্তও তন্ময় হয়ে শুনেছিলেন। বারবার মনে পড়েছিল নিজের বাপ এবং মহাগুরু জগৎমশাইকে, পার্থক্যের মধ্যে জগৎমশাই শিক্ষার মধ্যে বারবার উল্লেখ করতেন অদৃষ্টের, নিয়তির, ভগবানের এবং সমস্ত বক্তব্যই যেন রোগ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্য একটি ভাব ব্যাখ্যা জড়িত বলে মনে হত। যেন কথার অর্থ ছাড়াও একটি ভাব থাকত। রঙলাল ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যে ঈশ্বর ছিল না, অদৃষ্ট ছিল না এবং সমস্ত বক্তব্য ছিল শুষ্ক, কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, কথার মানে ছাড়া কোন ভাববাষ্পের অস্তিত্ব ছিল না। রঙলাল ডাক্তার বলতেন—"মানুষ মরে গেলে আমরা আর কোনদিকে তাকাই না। বুঝেছ, এই দেহপিঞ্জর করি ভঙ্গ প্রাণ বিহঙ্গ কেমন ফুড়ুত করে উড়লেন সে দেখতে আমরা চেষ্টা করি না।"[১] বলা বাহুল্য রঙলাল ডাক্তারের এই মতবাদে তারাশঙ্করের পূর্ণ সমর্থন ছিল না। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করবার প্রশ্ন অবান্তর—তবু কেবলমাত্র এর শুষ্ক কঠিন যুক্তিবাদকে গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁর আকর্ষণ ছিল মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্বলাভের রহস্যে—জাগতিক, পার্থিব, অতিবাস্তব সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে পরমার্থ লাভের প্রয়াসে তিনি অধিকতর মনোযোগী। বিজ্ঞান-বিরোধী না হলেও অদৃষ্টবাদ, নিয়তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ছিল—তাই বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চিন্তাকে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। জীবনমশাইর পিতা আয়ুর্বেদ শিক্ষাদানকালে মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন : প্রজাপতি ব্রহ্মা মৃত্যুরূপিনী পিঙ্গলকেশা পিঙ্গলনেত্রা পিঙ্গলবর্ণা কন্যাকে সৃষ্টি করেছিলেন সংহারের জন্য। কারণ সৃষ্টি তো লয় ছাড়া বাঁচতে পারে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য নিকেতন, পৃঃ ১১৮।

না। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ছিল গুরুমুখী বিদ্যার কথা—শাস্ত্র জানা আর শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ দুটো এক নয়। গুরুর কৃপা ব্যতীত জ্ঞান হয় না, শিক্ষা জ্ঞানে পরিণত হয় না, এ চিন্তাও ভারতীয়। রোগ নিয়ত মৃত্যুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কাল করছে নিয়ন্ত্রণ। "যার কাল পূর্ণ হয় তাকে যেতে হয়। অকালমৃত্যুও আছে, নিজের পাপে মানুষ নিজের আয়ুক্ষয় করে কালকে অকালে আহ্বান করে। আমাদের যে পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদ—তার শক্তি হল, কাল যেখানে সহায়ক নয় রোগের, সেখানে রোগকে প্রতিহত করা। রোগ এমন ক্ষেত্রে ফিরে যায়, তার সঙ্গে অন্ধ বধির মৃত্যুও ফিরে যায়। কিন্তু কাল যেখানে পূর্ণ হয়েছে, সেখানে আক্রমণের বেগে নাড়ীতে যে স্পন্দন বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় তা থেকে বুঝতে পারা যায়, মৃত্যু এখানে কালের পোষকতায় অগ্রসর হচ্ছে, এমনকি কতক্ষণ, কয় প্রহর, কয় দিন, কয় সপ্তাহ, পক্ষ বা মাসে সে গ্রহণ কর্ম শেষ করবে, তাও বলা যায়—এই নাড়ী পরীক্ষা করে।"[১] তারাশঙ্করের এই নাড়ী পরীক্ষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধে আস্থা ছিল, নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। সম্ভবত এইজন্যই জীবনমশাইকে ডাক্তারীশাস্ত্র শিক্ষা করতে রঙ্গলালের কাছে যেতে দেখা যায়। কিন্তু অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ছিলেন বলে জীবনমশাইকে তিনি ফিরিয়ে দেন—"তোমার বাবা তোমার ধাতুকে পুড়িয়ে পিটিয়ে শক্ত করে গড়ে গিয়েছেন —তাকে নতুন করে না গালিয়ে আর নতুন কিছু করা যাবে না। তলোয়ার আর খাঁড়া দুটোই অস্ত্র। কিন্তু প্রভেদ আছে। তলোয়ার দিয়ে মহিষ বলি হয় না, আর খাঁড়া দিয়ে এ-যুগের যুদ্ধ হয় না।"[২] অবশ্য জীবনমশাই কবিরাজী চিকিৎসার সাথে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আরোগ্য নিকেতন, পৃঃ ৬৬।
২। " " পৃঃ ১২৬।

এ্যালোপ্যাথিক এবং মুষ্টিযোগকেও রাখলেন—এতে ঔপন্যাসিকের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দুই চিকিৎসাপ্রণালী ও জীবনধারার মধ্যে সমঝোতার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। একটিকে গ্রহণ করতে গিয়ে অন্যটিকেও ছাড়বার মত প্রত্যয় ছিল না তাঁর। তাই কবিরাজী চিকিৎসা, নিদানহাঁকা, নাড়ীজ্ঞান ইত্যাদি যে উপহাসযোগ্য নয় তাও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। প্রদ্যোত কোন সময়ে এ বিদ্যাকে প্রাচীন বলে যতই অবহেলা করুক না কেন, একসময় সেও এই নাড়ীজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যায় চমৎকৃত হল। জীবনমশাই অবশেষে তাঁর কবিরাজী চিকিৎসা, বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত নাড়ীজ্ঞানের মহিমা প্রদর্শনে সক্ষম হলেন। উপন্যাসের শেষে প্রদ্যোত বলছে—"এই আপনাদের নিদানহাঁকা ?···এ আপনার কাছে আমার শিখতে ইচ্ছে করছে।"[১] প্রবীণকে নবীনও এভাবে স্বীকার করে নেয়। যে প্রদ্যোত এ বিদ্যার বিরূপ সমালোচনা করেছিল, বিরক্ত হয়েছিল মশাইয়ের প্রতি, সেও এই মানুষটির চরিত্র-মহিমা ও সংবেদনশীল মনের স্পর্শে এসে প্রসন্ন হয়—মশাইয়ের অসুস্থতার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—"শেষটায় ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেলাম।"[২]

তারাশঙ্কর এভাবেই আরোগ্য নিকেতনে প্রবীণের প্রতি তাঁর প্রীতিচিহ্ন রেখেছেন। জমিদারদের মধ্যে তিনি যে চারিত্রিক মাহাত্ম্য, মানবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন, এখানেও জীবনমশাইর চরিত্রকে তিনি সেসব সদ্‌গুণে ভূষিত করে নবীন ডাক্তারের শ্রদ্ধা-ভালবাসা সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছেন, প্রাচীন রীতি-নীতির প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে ব্যক্তি-চরিত্রের বিশালতাকে আশ্রয় করেছেন। এতে তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতি আরো প্রকট হয়েছে। প্রবীণকে যুক্তির দিক থেকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য নিকেতন, পৃঃ ৩৫৫।
২। " " পৃঃ ৩৫৭।

প্রতিষ্ঠিত করতে যদি বা কিছু বাধা থেকে থাকে, ব্যক্তিজীবনের নানা গুণাবলী ও উন্নত মানসিকতা ইত্যাদি দ্বারা তিনি সে বাধা অতিক্রম করার সপক্ষে কিছু কারণ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন—যাতে পরিশেষে ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রাচীনের নিকট সংস্কারমুক্ত নবীনকে নতিস্বীকার করাতে তাকে অধিকতর কষ্ট কল্পনার সাহায্য নিতে না হয়।

প্রাচীন বনাম নবীন, কৃষি বনাম শিল্প :

তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বিষয়-বস্তুতে নিহিত আছে সেই প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ। হাঁসুলী বাঁকের কাহারকুলের মুরুব্বী বনওয়ারী হল প্রাচীন ঐতিহ্যের অক্টোপাশে বাঁধা মানুষ, যে নবীনযুগের নতুন ভাবনাকে গ্রহণ করতে পারে না। তার জীর্ণ সংস্কার বিশ্বাসকে সে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না, তাই একালের নব্যযুবক করালীর আচার-আচরণ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল একসময়। চন্দনপুরের কারখানায় কাজ করে এই করালী। শক্তদেহ, স্বাস্থ্যবান এই যুবক কিছুতেই কাহারকুলের বাবা কত্তাঠাকুরকে বিশ্বাস করে না। সে এই অতীত ঐতিহ্যমুখী কাহারদের আচার-নিষ্ঠাকে কিছুতেই মানতে চায় না, উপরন্তু প্রবল শক্তি দিয়ে যেন সব পুরানো বিশ্বাস সংস্কারকে ভেঙেচুরে ফেলতে চায়। সুতরাং বনওয়ারী আর করালীর বিরোধ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী, বনওয়ারী এখানে প্রাচীন—করালী নবীনের প্রতীক। বনওয়ারী এই নতুন কালের আঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত। বনওয়ারী যে কাহার সমাজের মোড়ল, তারা নতুন কালকে চায় না, তাদের জীবনদর্শন অপরিবর্তনীয়—তাদের জীবনে যা কিছু ব্যতিক্রম ও বিপর্যয়, যা কিছু আকস্মিক ও অসাধারণ সবই দেবলীলা, অদৃশ্য শক্তির অমোঘ নির্দেশ। এই অলৌকিক দৈবশক্তিকে বৃদ্ধা সুচাঁদ অনুভব করে। এর ব্যাখ্যা করে তার পরবর্তী বংশধরদের আশ্চর্য করে দেয় প্রতি-

নিয়ত। এরা তাদের সামাজিক হীনতাও স্বেচ্ছায় ও সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছে, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা তাই সম্পূর্ণ বিদ্বেষ ও হীনমন্যতামুক্ত, তাই বহু শতাব্দীর এই অচলায়তন সমাজের বুকে যখন নবীনযুগের স্পর্শ লেগে পরিবর্তন হল একান্ত প্রয়োজনীয়—তখনও তারা ঐ প্রাচীন ধ্যানধারণামুক্ত হতে পারল না—উদাসীন হয়েই রইল। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সমাজের বুকে আন্দোলন ও আলোড়ন তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সামাজিক কূপমণ্ডুকতা অতিক্রম করে দারিদ্র্য-পীড়িত কাহাররা তখন বহির্জগতের মুক্ত বাতাসে সুস্থভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণে আগ্রহী—কিন্তু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সংস্কার তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে—সমাজবিধি তাদের মস্তবড় প্রতিবন্ধক। প্রাণরক্ষার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা জরুরী, যুগের আহ্বান শেষ পর্যন্ত তারা অস্বীকার করতে পারে না, তাই পরিবর্তনের এই আকুতিকে আগ্রহে হোক অনাগ্রহে হোক মেনে নিতে বাধ্য হয়। কাহার সমাজে অতীতেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছিল—কিন্তু তখন নীলকর সাহেবদের সহযোগিতায় বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পীড়ন দ্রুত উপশমিত হওয়াতে তাদের ঐতিহ্যধর্মী মনোভাব অনেকটাই অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল। এবারে কিন্তু সে অনড় অবস্থা আর রইল না, আধুনিক যুগের সুদূরবিস্তারী প্রতিক্রিয়ায় তাদের বাসভূমিও প্লাবিত হল। সেকাল আর একালের এই প্রশ্ন নিয়ে তাদের জীবনেও নানা সমস্যা, দ্বন্দ্ব দেখা দিল—আধুনিক মনিবদের স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীনতায় তাদের অর্থনৈতিক জীবনে ভাঙনের সৃষ্টি হল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল মহাযুদ্ধের আমন্ত্রণ, যন্ত্রদানবের সম্ভাষণ। তাই জীবিকার্জন করতে গিয়ে তাদের বিসর্জন দিতে হল সেই প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজকে, যুদ্ধের নির্মম হস্তের নিপীড়নে 'কালারুদ্র' 'কর্তাবাবা' মৃত, বিলুপ্ত, দেবস্থান পরিণত হল রণসম্ভারের গুদোমে।

কিন্তু নবীনকালের এই আহ্বান গ্রহণ করতে গিয়ে কাহার

কুলে প্রতিমুহূর্তে অস্বস্তিকর আলোড়ন জেগেছে। বনওয়ারী তার প্রাচীন সংস্কার বিশ্বাস টিঁকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে। করালীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে যখন কাহার পাড়ার আরো অনেকে মুগ্ধ এবং রেলকোম্পানী কিংবা কারখানায় নাম লেখাতে ইচ্ছুক তখনও বনওয়ারীকে অগ্রাহ্য করতে তারা সন্ত্রস্ত-ভীত—"যে মাতব্বর আছে, সেকি ওমুখে কাউকে হাঁটতে দেবে? করালীর মত বুকের পাটা তাদের নয়, তারা বনওয়ারী মাতব্বরকে অমান্য করে রেল-কোম্পানীতে খাটতে যেতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে ভেসে ওঠে বনওয়ারীর মূর্তি। চোখ বড় কবে হাত তুলে বললে, 'পিতিপুরুষের বারণ। সাবোধান!' "

কিন্তু বনওয়ারী মাতব্বর করালীকেও এবার কায়দা করলে। তাকে বারবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, পঞ্চায়েতের হুকুম অমান্য করা চলবে না, দেবতা-গোসাইকে মানতে হবে, অনাচার, অধর্ম্ম করবে না। পাকাচুলের কথা না শোন নাই শুনবে, কিন্তু প্রবীণ মুরুব্বির 'রপমান' কখনও করবে না, করালী সে প্রতিজ্ঞা করেছে।[১] বনওয়ারী সংস্কারাচ্ছন্ন, ঐতিহ্য-প্রিয় হলেও করালীর প্রতি সে ঈর্ষাপরায়ণ নয়—বরং অপত্যস্নেহে সে প্রথম তাকে বশ করতে চেয়েছে। করালী 'কত্তাবাবার বাহন' চন্দ্রবোড়া সাপকে মেরে যখন অত্যন্ত অপরাধ করেছে, তার হয়ে তখন মার্জনা ভিক্ষা করছে বনওয়ারী—"হে বাবা, হে কত্তাঠাকুর, হে কাহারদের মা-বাপ! মাজ্জনা কর বাবা মাজ্জনা কর। অবোধ মুখ্যু করালীকে মাজ্জনা কর। বনওয়ারীকে মাজ্জনা কর। পূজো দেব বাবা আবার পূজো দেব।"[২] করালীকে নিয়ে তার সারাক্ষণ ভয়। ছোকরা রেলে চাকরি করে, সেখান থেকে অনেক খারাপ ব্যাপার নিয়ে আসে।...করালী যদি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ১০৯।
২। " " পৃঃ ১১৩।

ধরম বাঁচিয়ে ইজ্জত রেখে সোজা রাস্তায় চলে তবে করালী হতে কাহার পাড়ার অনেক 'হিতমঙ্গল' হবে বলেই বনওয়ারীর বিশ্বাস, নইলে ও-ই উচ্ছন্ন দেবে কাহার পাড়াকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওই কলকারখানার তেলকালিভরা অলক্ষ্মীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়, ছেলেগুলো চাষ ছাড়বে, পাল্কি বইবে না, পিতিপুরুষের কুলকর্মে জলাঞ্জলি দেবে। মেয়েগুলোও যাবে পিছনে পিছনে, বনওয়ারী তা হতে দিতে পারবে না। কখনও না। "তাই সে করালীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে আদর করে তার আব্দার রেখে কোলগত করে নিতে চায়।"[১] করালী কিন্তু নবীন যুগের সংবাদ আনে গাঁয়ে, চন্দনপুর থেকে এক একটা জিনিস কিনে এনে গ্রামবাসীকে বিস্মিত করে দেয়। তারই কল্যাণে গ্রামের মানুষ প্রথম 'তেরপাল' দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, এই গ্রাম্য লোক, তাদের কথাবার্তার ভাবভঙ্গী ও বিশ্বাস—সবকিছুই করালীর হাস্যকর মনে হয়। বনওয়ারী তাকে তবু ধর্ম-অধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দেয়—"বাবাধন ধরমের পথে থাকলে বাবাঠাকুর আদেক এতে—মানে দরগা যেয়ে—দোপর তিনপোর এতে নিজে ভাত এনে ছামনে ধরে আমাকে বলবেন—"লে বেটা ধরমের পথে থেকে আজ ভাত জোটে নাই লে, খা।" কথাগুলি ভাল, গোটা কাহার পাড়ার প্রবীণদেরই আধ্যাত্মিক মনোভাব গদগদ হয়ে উঠল, কেউ বলবে হরিবল মন, হরিবল, কেউ বলবে—শিবো হে। কেউ বলবে এ সংসারে মরণই সত্যি। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে তারা দেবতাকে। করালীর কিন্তু হাসি পেল। কথাগুলির বিপরীত কোন সত্যে সে বিশ্বাসী বলে নয়, ওই কথা বলার ভঙ্গী দেখে তার হাসি পায়, চন্নপুরে মিটিং শুনেছে সে, কি করে যে বাবুরা বক্তৃতা

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ১২২।

করে। ওঃ, সে শুনে চনচন করে ওঠে শরীল।"[১] করালীর অপরাধ নিয়ে যখন বনওয়ারী আশঙ্কাগ্রস্ত—করালী নির্বিকারভাবেই তখন বিতর্কে উপস্থিত হয়।

"—তোমার ঐ এক কথা। সাপ আবার—

—ও কথা বলো না বাবা, ওকথা বলো না—

—চন্নপুর ছাড় তু করালী, ওখানে গিয়েই তোর এই সব মতিগতি। কিছু জমি কেন্—

—জমি?

—হ্যাঁ জমি কেন্, বলদ কেন্, চাষ কর।

—সে বুড়ো বয়সে করব—হাসতে লাগল করালী। তারপর বললে—ওরে বাপরে, এখন রেলের কাজ ছাড়তে পারি? যুদ্ধ আবার জোর ধরল, রেলের কাজ যুদ্ধের সামিল হবে বুয়েচ? মজুরি বেড়ে ডবল হবে। এখন লোক লোক শব্দ উঠেছে।

যুদ্ধের ব্যাপার। কালারুদ্দের মন, মহিমা, তিনিই লাগান যুদ্ধ। তাঁর চড়কের পাকে ঘটে বড় বড় ব্যাপার। আকাল আসে, মহামরণ আসে, যুদ্ধও এসেছে।"[২]

সমাজপতি বনওয়ারী সেকালের মানুষ, এ সব বাস্তব সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না; এতেও দেবতারই লীলা প্রত্যক্ষ করে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাও তার ভীতি জন্মায়, তাই উড়ো জাহাজ, কলকারখানা তার মনে অশান্তি আনে, তাকে আশঙ্কাগ্রস্ত করে, সে সেই জমি বলদ চাষকেই পুরোনো সংস্কার বিশ্বাস নিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়, এদিকে করালী আর্থিক সচ্ছলতার আশায় ক্রমশই কলকারখানায় আকৃষ্ট হচ্ছে। কৃষিনির্ভর, কুসংস্কারগ্রস্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রাম্য জীবনে তার অরুচি এসেছে। ঝড়ে ঘর উড়ল

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ১৭২।
২। " " পৃঃ ১৭৩।

তার—তাতে সে খুশী—কারণ এবারে কোঠাবাড়ি করতে পারবে, কিন্তু কাহাররা কিছুতেই এ সঙ্কল্পে উৎসাহ দিতে পারে না, বলে—কাহার পাড়ায় কোঠাবাড়ি করলে নাকি তার মৃত্যু সুনিশ্চিত, কিন্তু করালীর মত নূতন কালের যুবক কি করে মানবে এই যুক্তি? রতন, সুচাঁদ, প্রহ্লাদ কাউকেই সে এখন মানতে রাজী নয়—এমন কি মাতব্বর বনওয়ারীকেও সে মানবে না। সে তখন ভাবে এই মাতব্বররা কোঠাবাড়িতে বাস করতে পারেনি বলেই তাকে সমর্থন জানাতে চায় না। এহেন করালী যে কাহারকুলে দানবতুল্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! করালী পাপ, করালী সাক্ষাৎ 'দানো' অর্থাৎ দানব। কাহারকুলের অনেক পাপে হাঁসুলী বাঁকে ওর আবির্ভাব হয়েছে, বনওয়ারীর বয়স প্রায় তিনকুড়ি হল, সুচাঁদ পিসির বয়স চার কুড়ি হবে, চোখে তো দুজনের একজনও দেখে নাই এমন 'দানোর আবির্ভাব'।[১] অবশেষে ঐ 'দানো'ই চন্দনপুরের কারখানার কুলিসর্দার হলো—কোট পেন্টুলুন জুতো টুপি পরে সে আজকাল হুকুম চালায়। এদিকে তখন যুদ্ধ বেধেছে। বনওয়ারী এসব খবর বেশী জানতে চায় না, কর্তাঠাকুর যে তাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। তাই করালীকে বলে—"কোথা কোন দ্যাশে যুদ্ধ লেগেছে তা হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশ আদাড়ের ভিতরে কাহারপাড়ার কাহারদের কি? উসব গল্পে তাক লাগিয়ে মেয়েছেলের মনে অঙ ধরানো যায়, কিন্তু উসব এখানে চলবে না বাপু।" করালী ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললে—'তার মানে? এসব কি বলছ তুমি?' 'বলছি ঠিক, তুমি বুঝছ ঠিক। তোমার পরিবার আসছে, ছেলে ছোকরার কানে মন্তর দিচ্ছে—পিতিপুরুষের কুলকম্ম ছেড়ে জাতনাশা কারখানায় চল মজুর খাটতে।

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ৩০৩।

তুমি আসছ মেয়েদের মনে'—করালী চেঁচিয়ে উঠল "ভালো হবে না বলছি ব্যানোমামা"। বনওয়ারী বললে, জাতনাশা! বেজাত কোথাকার, তোর লজ্জা নাই, তোর মা এই নাইনে কাজ করতে গিয়ে চলে গেল কুল ভাসিয়ে দেশ ছেড়ে, আর তুই ওই নাইনে কাজ করছিস? আবার পাড়ার ছোকরাদের মাথা খারাপ করতে এসেছিস? পয়সার গরমে কোট পেন্টুল পরে মেয়েদের কাছে দেখাতে এসেছিস —কতবড় মরদ তু।

করালী উঠে দাঁড়াল, বললে—জাত কার আছে? কোন বেটার কোন বাবার আছে এখানে। ওই সুচাঁদ বুড়ী বসে রয়েছে বলুক, ওই বলুক শুনি। জাত! লজ্জাও নাই তোমাদের, সদজাতের—ভদ্দর লোকের পা চেটে পড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে, পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ করে মুখ বুজে সহ্য কর। লজ্জা! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ তোমরা? জাত! কুল-কম্ম! তো লাঙলের চাষীদের মন্দেরি কৃষাণী রাখলি? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা। পেটে ভাত জোটে না, পরনে কাপড় জোটে না, কুলকম্ম! কুলকম্ম! তোমার কি? তুমি মাতব্বর গুছিয়ে নিয়েছ, জমি করেছ, ধান রেখেছ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ! লজ্জা! বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে লজ্জা নাই? মাতব্বর! লোকে গতরে খেটে, পেটভরে খাবার মত পরবার মত রোজকার করবে তাতে তুমি ধম্ম দেখাও! কেনে মানবে তোমার সেকথা লোকে? কেনে মানবে? আমি হাঁক দিয়ে বলে যাচ্ছি—যে যাবে কারখানায় খাটতে আমি কাজ করে দোব। দিন পাঁচসিকে মজুরি। কোম্পানী দেবে সস্তা চাল, সস্তা ডাল, সস্তা কাপড়।"[১] করালী প্রাচীন অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে, বনওয়ারী তার যুক্তিতে স্তম্ভিত হয়ে যায় প্রথম এবং

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ৩৬০-৩৬১।

পরক্ষণেই ক্রোধে উত্তেজনায়, অসহিষ্ণু হয়ে করালীর চুলের মুঠো ধরে টানতে থাকে। করালী তবু মাথা নত করে না—অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও মাথা নীচু করল না সে। এদিকে যুদ্ধের বাজার, ক্রমাগতই জিনিসের দাম বাড়ছে, কাপড় নেই, কেরোসিন নেই, চিনি নেই, সারা দেশে, সারা অঞ্চলে হাহাকার। ছেলে-ছোকরারা বনোয়ারীকে দোষারোপ করছে —তোমার কথায় আমরা চাষে লেগেছি, এর উপায় কর তুমি।[১] পরোক্ষে বলছে কারখানায় গেলেই ভালো ছিল। তারপর এল ঝড় -- তিনদিন পর থামল এ প্রলয়কাণ্ড। এ ঝড়ে অনেকে মরেছে অনেকে আহত। ঘর ভেঙেছে, ফসল শেষ হয়েছে, গরু বাছুর কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কালারুদ্রতলায় যুদ্ধের আপিসের তাঁবু পড়ল. মটর গাড়ী এল, আর করালী এল সেখানে।

বনওয়ারী তখন একেবারেই পরাজিত। তারাশঙ্করের ভাষায়, —"কাহারপাড়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ কোশকেঁধে বনওয়ারী বাবাঠাকুরের পরিত্যক্ত স্থানটিতে টলতে টলতে এসে লুটিয়ে পড়ে হা হা করে কাঁদতে লাগল। বুক চাপড়াতে লাগল আহত আরণ্য বানরের মতো।"[২] খানিকক্ষণ আগে তার সাথে করালীর লড়াই হয়ে গিয়েছে। করালী লাথি মেরেছে তার মাথায়. সে ভাবছে করালীর ঘর জ্বালাবে, প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু পাবল না, তার আজ শক্তি নেই। তার বাবাঠাকুর নেই, হাতের মাদুলী করালীর সাথে লড়াই করতে গিয়ে ছিঁড়ে পড়েছে, বেলগাছ শুকিয়েছে, কে তাকে আজ রক্ষা করবে? সেই বা কাকে ডাকবে।

এরপর রোগশয্যায় রইল সে দুমাস—মরণের সাথে লড়াই করে বেঁচে উঠল। তার ধারণা পাপের ফলে হাঁসুলী বাঁকের দেবতা তাদের ত্যাগ করেছেন। তাই এই দুর্দশা তার মানুষের—তার নিজের।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ৩৬৯।

২। " " পৃঃ ৩৭২।

সে বাইরে গিয়ে দেখল তার নিজের মাটিকে। বাবাঠাকুরের থান মোটরগাড়িতে ভরে আছে। সেই বনজঙ্গল কিছু নেই আজ—এখানকার মেয়েপুরুষ সব পেটের দায়ে চন্দনপুর গেছে।

এবার এল বনওয়ারীর মৃত্যু। মরণের আগে সে কোপাইয়ের গর্ভে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে শয্যা পেতেছিল, গোটা কাহারপাড়াকে ডেকে নয়নভরে দেখে সে শান্ত মনে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। তারপর আবার সর্বগ্রাসী ক্ষ্যাপা বান—১৯৪৩ সালের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কোপাইয়ের দুকূল। কিছুই রইল না আর, বছর দুয়েক পর তারই উপর সেই ডাকাবুকো করালী এলো নতুন কাহারপাড়া গড়ে তুলতে। এ কাহারপাড়া সংস্কারজীর্ণ নয়, এতে নতুন সভ্যতার আলো লেগেছে তাই করালী নতুন বাঁধ দেবে, বাঁশের বদলে শরবন লাগাবে।

এই হল হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, করালী-বনওয়ারী-দ্বন্দ্ব সমাপ্ত হল এভাবে—প্রাচীন ভেসে গেল—নবীন এল তার নতুন ভাবনা নিয়ে। কিন্তু এখানে লেখকের বক্তব্য কি? বনওয়ারীর মতো স্থানচ্যুত হতে কি তিনিও অনিচ্ছুক? উপন্যাসের শেষে কোপাইয়ের বানের জলে প্রাচীন কাহার পল্লী ভেসে গেল, নিঃশেষিত হয়ে গেল তাদের পুরাতন ভাবনা-বাসনা—তাদের মোড়ল বনওয়ারী মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিল। কিন্তু লেখক এই প্রবীণের বিদায়কে যেন মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না—পাগল ও নসুবালার কণ্ঠের গানে তারাশঙ্করেরই বেদনাহত অন্তরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

—হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়,
যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশে হয় বাঁশি
বাঁশবাদির বাঁশগুলিরে তাইতো ভালবাসি,
বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহারকুলের পিতা
বাঁশবনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা

পরাণ ভ্রমরে সে থাকত আগুলি
তারে দাহন করে মারল করালী।
বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার কুলের পরাণ ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর
বাঁশের ঘরের ঝাঁপি শেষে ভাঙল মিলিটারি-
কাহারেরা হায়রে বিধি হল ভ্রমণকারী
ঘর ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়।
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই
বিধাতা বুঢ়ার খেলা দেখে যারে ভাই।[১]

এই 'দুখের কথা' শুনে চোখের জল ফেলা বারণ বলেই আরো বেশি চোখের জল পড়েছে,—এ গানের শ্রোতার সাথে লেখকও পাঠকদের একই সঙ্গে কাঁদাতে চেয়েছেন। বাঁশবাদির বনওয়ারীর জন্য, বাঁশবাদির প্রাচীন জীবনের জন্য লেখক এখানে নিঃসন্দেহে সহানুভূতি রেখেছেন। নবীনের নিকট প্রবীণের পরাজয় সুনিশ্চিত একথা জানা সত্ত্বেও লেখক প্রবীণের জন্যই বেদনা অনুভব করেছেন। তাই হয়ত উপন্যাসের শেষে--কাহারেরা এখন নতুন মানুষ, পোশাকে-কথায়-বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে, মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্দনপুরে কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা পড়ে মরে. কিন্তু তার জন্যে বাবাঠাকুরকে ডাকে না ..."[২] কাহারদের এই পরিবর্তনের পরও তারা

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ৪১৭-৪১৮।
২। " " পৃঃ ৪১৭।

"তবু চন্ননপুরের পাকা খুপচি কোয়ার্টার্স থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে। কিন্তু কি করে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে?"[১] অর্থাৎ এখানেও তাদের ফিরে যাবারই প্রশ্ন তুলেছেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু কেন ফিরবে তারা ওখানে সেই দারিদ্র্যজর্জরিত অভিশপ্ত পুরীতে, কিসের আশায়? এর কোন উত্তর নেই। এই অযৌক্তিক আবেগের পশ্চাতে ঐতিহ্যমুখী চেতনাই কাজ করেছে, একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কাহারদের জীবনযাপন পদ্ধতিকে যে করালী সমগ্র উপন্যাসে উপেক্ষা করল—তাদের সংস্কার বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলতে বিদ্রোহী হয়ে উঠল, সেই করালী আবার ফিরতে চাইল বাঁশবাদিতে নতুন কাহারপাড়া গড়ে তুলতে, কিন্তু নতুন কাহারপাড়া গড়ে তুলতেই সে এমন আগ্রহী কেন? আর বাঁশবাদির এই চর ছাড়া কি আর কোথাও নতুন কিছু গড়তে নেই? তাছাড়া নতুন এই শিল্প-সভ্যতার যুগে, যান্ত্রিক ক্রমোন্নতিকালে হঠাৎ কেবল কাহারদের নিয়ে নতুন এক কাহারপাড়া গড়ে তোলার কি প্রয়োজন? এযুগে এভাবে বিশেষ কোন জাতের শ্রমিকদের জন্য একটি অঞ্চল গড়ে তোলার চিন্তা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে, বাস্তবে তা সম্ভবও নয়। উপন্যাসে এ সব জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। যে করালী একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করল—সেই শেষে আবার বালি খুঁড়ে খুঁড়ে মাটি খুঁজে ফিরল কাহারপাড়া গড়ার সঙ্কল্প নিয়ে। কেন তার এই পরিবর্তন? কাহারপাড়ায় বাস করারই বা সঙ্কল্প কেন হঠাৎ? তার পরিবর্তনের কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি উপন্যাসে। তারাশঙ্কর এখানেও তাঁর সেই ঐতিহ্যানুরাগের আকর্ষণেই সম্ভবত অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে উপন্যাস শেষ করেছেন। কাহারদের নতুন জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে তিনি মেনে নিয়েছেন, পরিবর্তনকে স্বাভাবিক

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ৪১৭

স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু এতে তিনি যে খুব আশাবাদী নন, তাঁর বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কারণ চন্দনপুর কারখানায়ও যে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা যথেষ্ট—একথা তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। যেন তাদের পল্লীগ্রামে অস্তিত্বরক্ষার কোন সংগ্রাম ছিল না—জীবন সেখানে সুখ, শান্তি, আর সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। বস্তুত, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জগদ্দল পাথরকে উপড়ে ফেলে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্ভুক্তি লাভ করা যে নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ, তারাশঙ্কর তার প্রতিটি উপন্যাসে সেই বিষয়ে নিরুক্ত থেকে, চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছেন।

"আসলে তারাশঙ্কর শিল্পায়ন, শিল্পেব অগ্রগতি বা শ্রমিক মজুরের বিষয়টি আদৌ ভালোভাবে জানতেন না বা জানবার চেষ্টা করেননি। যন্ত্র মানে সভ্যতার ধ্বংস, শ্রমিক মানে নাস্তিক ইত্যাদি অত্যন্ত অপরিণত ধারণা তারাশঙ্করের মনে গেঁথে গেছে তাঁর রক্ষণশীলতার প্রতি প্রীতির জন্য। অথবা তিনি নিজে যে শ্রেণীর সন্তান ছিলেন, সেই শ্রেণীর অবক্ষয় দ্রুত শিল্পায়নের জন্য ত্বরান্বিত হয় বলে তিনি যন্ত্রশিল্পের উপর বীতশ্রদ্ধ। তারাশঙ্করেব এ ধারণা অনেকটা প্রকৃত অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে মেনে নেওয়া সিদ্ধান্ত। কারণ বীরভূমের সাক্ষ্য অন্য কথা বলে।

শ্রীঅশোক মিত্র সঙ্কলিত ১৯৫১ সালের জনগণনার সাধারণ বিবরণী থেকে জানা যায় যে, শিল্পের দিক থেকে বীরভূমের বিশেষ গুরুত্ব নেই, যদিও রামপুরহাটে রেলের অফিস স্থাপিত হয়েছিল। তবে সাঁইথিয়া ও আহমেদপুব ব্যবসার কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে এবং সেখানে কয়েকটি চালের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বীরভূমের কৃষি উৎপাদনের ক্রমাবনতি সত্ত্বেও জেলার বাইরে লোকে খুব কমই বেবিয়েছে, হাজার অভাব অনটন সত্ত্বেও তারা নিজেদের ছোট্ট জমি আঁকড়ে পড়ে থাকে। আবার বীরভূমে অন্য রাজ্য থেকে লোক

আসে কম, এর কারণ অবশ্য ভূমির অনুর্বরতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বল্পতা এবং আবাদযোগ্য ভূমির আনুপাতিক অভাব।

তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে বীরভূমের প্রকৃত অবস্থার কথা জানতে হয় এইজন্য যে, তিনি নির্দিষ্টভাবে বীরভূমকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পটভূমি রূপে নির্বাচিত করেন। বীরভূমে কিছু কিছু চালকল, তেলকলের প্রতিষ্ঠা হলেও ব্যাপক শিল্পায়ন কোনদিনই হয়নি। ফলে যন্ত্রশিল্পের বিভীষিকা বা কলকারখানার বীভৎস রূপ দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না সেখানে। আর চালকল, তেলকলকে যন্ত্রশিল্পের প্রতিভূ কেন, ঐ মিলগুলিকে যথার্থ যন্ত্রশিল্পের পর্যায়ে ফেলা চলে কিনা বিবেচ্য।"[১] যন্ত্রসভ্যতার বীভৎস রূপ দেখে কিংবা যন্ত্রসভ্যতার অনুশাসনে ক্লিষ্ট মানুষের দুর্দশা দেখে যে তারাশঙ্কর যন্ত্রের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনে হয়, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে তিনি কৃষি ও শিল্পের সংঘাতকালে পুরাতন ব্যবস্থার পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও তাঁর দুর্বলতা গোপন করে রাখতে পারেননি। একালে নবীন শক্তির অভ্যুদয় হবে, বনওয়ারীর পতন হয়ে করালী জয়ী হবে এ সত্য তাঁর কাছেও স্পষ্ট, তবু অতীতের প্রতি তাঁর পিছুটান। করালী এত বিদ্রোহের পরও আবার তাই কাহারপাড়া গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। সবশেষে রোগজর্জর বনওয়ারী যখন এই পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়ায় অতীতের প্রতিভূ হয়ে—তখন পাঠকচিত্ত আর্দ্র হয়ে ওঠে সমবেদনায়।

ঐতিহ্য ও প্রগতি :

এই কাল পরিবর্তনের চিত্রটি তাঁর গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামেও অতিশয়

১। কার্তিক লাহিড়ী : ঐতিহ্য প্রগতি—তারাশঙ্করের উপন্যাস (এক্ষণ নবম বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৭৮), পৃঃ ৯৬-৯৭।

স্পষ্ট। "গণদেবতা'য় তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপকে আশ্রয় করে ব্যষ্টিজীবন গোষ্ঠীজীবনে পরিণত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রিত গোষ্ঠীজীবন এবং গোষ্ঠীজীবনের বিলয়, উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব, শহরকেন্দ্রিক নূতন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব, কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্প অর্থনীতির প্রাধান্য—বিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের যুগান্তরের এই ইতিহাস ধরা পড়েছে তারাশঙ্করের গণদেবতা পরিকল্পনায়।"[১] 'গণদেবতা'র প্রথমেই যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক সঙ্কট গ্রামীণ জীবনের নানা দুর্ভোগ এবং ধনী ব্যবসায়ীদের ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের বর্ণনা দিয়েছেন—"দুঃখদুর্দশা সবকালে আছে, কিন্তু যুদ্ধের পর এই কালটির মত দুর্দশা আর কখনও হয় নাই⋯জমির দামও ডবল হইয়া গিয়াছে। দর পাইয়া হতভাগা মূর্খের দল জমিগুলা কঙ্কণার বাবুদের পেটে ভরিয়া দিল।"[২] এই কঙ্কণার বাবুরা কয়লার ব্যবসায়ী। যুদ্ধের বাজারে চড়া দামে কয়লা বিক্রয় করছে এবং জমি কিনছে গ্রামে। এই সমাজেই ছিরু পাল বা শ্রীহরি ঘোষ মহাজনী ব্যবসায়ে লিপ্ত ক্রমশ পরাক্রমশালী হয়ে উঠছে অর্থবলে। 'জমিদারের এখন অবস্থা খারাপ, শ্রীহরির টাকা আছে, আদায় হোক না হোক সমস্ত টাকা শ্রীহরি দিবে—এই শর্তে জমিদার শ্রীহরিকে গোমস্তাগিরি দিয়েছে। শ্রীহরি এখন এক ঢিলে দুই পাখী মারিতেছে বাকী খাজনার নালিশের সুযোগে। লোকের জমি নীলামে তুলিয়া আপন প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতেছে সুদে-আসলে,⋯জমিদার এ গ্রামখানা পত্তনি বিলি করিবে কিনা ভাবিতেছে। শ্রীহরি গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে।"[৩] শেষ পর্যন্ত সে গ্রামের জমিদারীস্বত্বই ক্রয় করে

১। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ঃ তারাশঙ্কর রচনাবলী ৩য় খণ্ডের ভূমিকা, পৃঃ ॥০—॥৴০।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ গণদেবতা, পৃঃ ২৭।

৩। " " পৃঃ ১৪৬-১৪৮।

ফেলে। কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে কারণে-অকারণে বিবাদ-বিসংবাদ প্রায়ই লেগে থাকে—এই সুযোগে গদীওয়ালা মহাজন, মিলমালিক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের নানা স্বার্থ পূরণের সুযোগ আসে।

মিলওয়ালা শ্রীহরিকে বলে—কলের মজুর নিয়ে আপনারা তো আমাদের সাথে হাঙ্গামা কম করেন না। কথায় কথায় আপন আপন এলাকার মজুরদের আটক করেন। প্রজাদের বলেন—"কলে খাটতে যাবিনে, গদীওয়ালার দাদন দিতে পারবিনে। এখন আপনাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেঁধেছে, এইতো আমাদের পক্ষে সুবিধের সময় তাদের আরো আপনার করে নেবার······আপনি কোন্‌টা চাচ্ছেন ? আমরা টাকা না দিলে প্রজারা টাকার অভাবে মামলা করতে পারবে না, তাহলেই বাধ্য হয়ে মিটমাট করবে ! না তার চেয়ে আমরা টাকা দিই প্রজাদের ? মামলা করে যাক তারা আপনাদের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত তারা তো হারবেই, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে হারবে। তখন আপনাদের আরও সুবিধে"[১] গ্রাম্য অর্থনীতিতে ও সমাজে এইভাবেই পত্তনীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ক্রমশ। অবশ্য এসব কোন সমাজ-ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেই প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়নি। এই শ্রীহরি পাল আজ জমিদারের পদে অধিষ্ঠিত, অর্থবলের জন্য সমস্ত গ্রাম তার করতলগত। সে অনিরুদ্ধের জমি কেড়ে নিয়ে তাকে দেশান্তরী করতে পেরেছে—পঞ্চায়েত ডেকে দেবু ঘোষকে পতিত করেছে, সমাজের অধিকর্তা এখন শ্রীহরি ঘোষ। এমনকি এই আর্থিক প্রতিষ্ঠার সাহায্যে সে দ্বারিক চৌধুরীর লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরকে পর্যন্ত পাঁচশো টাকা দিয়ে ক্রয় করতে সমর্থ হল। সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগশোক ক্রমশ গ্রামখানিকে গ্রাস করে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ৭৩-৭৪।

ফেলে। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট গ্রাম্য মানুষ আর তাই মাটিকে নির্ভর করে গ্রামের ভিটে আঁকড়ে থাকতে চায় না। 'জংশনের কলে' খাটতে যেতে তারা তখন উন্মুখ। এদিকে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।—গ্রামের কেউ কৃষক সমিতি করছে—কেউ বা মুসলিম লীগ করছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতি চিন্তার মধ্যে গ্রাম্য মানুষও তাদের আদর্শ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এইভাবেই তারাশঙ্কর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে' বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাল পরিবর্তনের সামগ্রিক চিত্রটিকে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহ্যানুরাগের দুর্বলতা থেকে তিনি এখানেও মুক্ত হতে পারেন নি,—গ্রামীণ সমাজের গণজাগরণ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও সহানুভূতি ছিল তাঁর প্রাচীনের প্রতি। তাই ন্যায়রত্ন যিনি প্রাচীন গ্রাম্য সমাজের সমাজপতি, তার পরাজয়ে লেখক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, ন্যায়রত্ন-বিশ্বনাথ দ্বন্দ্বটি এখানে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব, যুগসন্ধিক্ষণের সংঘাত। এখানেও দেবু ঘোষ—যে প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করেছে, সে বিশ্বনাথের আদর্শে মুগ্ধ হয়েও ন্যায়রত্নের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেছে। ন্যায়রত্নের ধর্মানুরাগ ও সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি দেবুর অধিকতর দুর্বলতা, যা বারবার তাকে নবীন-ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত করেছে। ঐতিহ্যপ্রিয় লেখক তাই ন্যায়রত্নের গ্রামত্যাগের ঘটনাটিকেও এক ট্র্যাজিক মহিমায় অঙ্কিত করতে প্রয়াসী। অথচ বিশ্বনাথ—যে আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছে অনেক, তাকে কিংবা তার বিরোধী মতবাদকে ততখানি গুরুত্ব দান করেননি। ঐতিহ্যাবেগ বশতঃ লেখক এখানেও নবীন শক্তিকে সমান মর্যাদা দিতে পারেন নি—বরং তাঁর বীতরাগই এতে প্রকাশ পেয়েছে।

তারাশঙ্করের এই দ্বন্দ্বটি তাঁর সমাজচিন্তা, রাজনীতিচিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তায়ও তাঁকে নানাভাবে বিচলিত করেছে—এবং অবশেষে

তিনি প্রগতিকে স্বীকৃতি জানিয়েও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য বোধ করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রধানত এই ঐতিহ্যপ্রীতি সকল চিন্তার ক্ষেত্রেই তাঁকে পরিচালিত করেছে—তাঁর ভাবধারায় এর প্রভাব পড়েছে সর্বত্র।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্কর সম্পর্কে লিখেছেন—"··তারাশঙ্কর ঐতিহ্য বিশ্বাসী—যা বংশগত, সংস্কারগত উত্তরাধিকারে আমাদের মধ্যে এতকাল ধরে চলে আসছে—তাকে কখনো কখনো নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দিলেও তার কোনো ঐকান্তিক পরিবর্তন তিনি কামনা করতে পারেননি। রাজনৈতিক মতবাদকে তারাশঙ্কর মানবতাবাদের মত প্রসারিত করেছেন, কিন্তু গ্রামীণ সংস্কার বিশ্বাসকে ত্যাগ করাও তাঁর পক্ষে সুকঠিন হয়েছে। তাই অতীত আর বর্তমান—ক্রমাবক্ষীয় পুরাতন আর অপ্রতিরোধ্য নবীন—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের শিল্পসত্তারও দ্বন্দ্ব।

তারাশঙ্করের যুক্তি-সচেতন মন এ সত্য উপলব্ধি করে যে নতুনের আবির্ভাবকে প্রতিহত করবার শক্তি কারো নেই—বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন যুগসত্যরূপে অনিবার্যতায় আসন্ন হবে। তারাশঙ্কর হয়তো সজ্ঞানে এই যুগপ্রবাহের বিরোধিতা করতে চাননি, কিন্তু তার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া খানিকটা অবচেতনভাবে নতুনের নির্মমতাকেই যেন প্রধানত অভিব্যক্ত করতে চেয়েছে।"[১] তারাশঙ্করের ব্যক্তিমানসের এই দ্বন্দ্বটি সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করছে নানাভাবে নানাসময়ে। তিনি এইজন্যই পরাভূত অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন সর্বত্র।

এই যুগসন্ধির দ্বন্দ্ব ও কাল-পরিবর্তনের নানা চিত্র তাঁর অন্যান্য অনেক উপন্যাসে আছে। 'স্বর্গমর্ত্যে'র ব্রজদাসী-দুলালের দ্বন্দ্বে প্রাচীন-নবীনের আদর্শগত বিরোধেরই আভাস আছে। 'সন্দীপন

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ বাংলা গল্পবিচিত্রা, পৃঃ ১২৮-১২৯।

পাঠশালা'য় তিনি কাল-বিবর্তন চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধীরানন্দ ও তাঁর মায়ের দ্বন্দ্বও তুলে ধরেছেন। ধীরানন্দ একালের যুবক—মা সেকালের ভাবধারায় অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী। তাই তার সংস্কার অনেক। ধীরানন্দ জাত মানে না, মানুষ তার কাছে ঈশ্বরের চেয়ে অধিক সত্য। তাই সে কায়স্থ কন্যাকে বিবাহ করে বিনাদ্বিধায়। অথচ সংস্কারাচ্ছন্না মা এই অপরাধে তাকে ঘরে তুলেন না। "ধীরাবাবুর কত নাম, কত গৌরব, দেশ-দেশান্তরে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। তবু এই এক অপরাধের জন্য তিনি কোনদিন ছেলের কাছে গেলেন না, ছেলেকে ডাকলেন না, বলেছেন, একা ধীরাকে কি করে ডাকব? বউমার ছোঁয়া-নাড়া খাব না, তার ছেলেদের বুকে নিয়ে মন খুঁত খুঁত করবে—তাদের ডাকতে পারব না, ধীরা কি খুশী হয়ে আসতে পারবে?"[১] একালের যুবক ধীরানন্দের মা তাই সন্তানের চেয়েও জীবনে ঐতিহ্যাশ্রয়ী আচার-নিষ্ঠাকেই অধিক মনে করেন। ধীরানন্দ এই পুরাতন নিয়ম-নিষ্ঠার প্রতি বিরূপ। সীতারামের মন্ত্র নেবার কথা শুনে সে হাসে, "কোন্ মন্ত্র নিলে পণ্ডিত? সরস্বতী মন্ত্র হলে কিছু বলবার নেই আমার কিন্তু সে দীক্ষাও তো তোমার অনেকদিন হয়েছে। নিজেই নিয়েছিলে, তার গুরু কে সে তুমিই জান। পণ্ডিত, কপালে ফোঁটা তিলক কাটা তোমার চেহারা কল্পনা করেছি আর হেসেছি। না না পণ্ডিত এ আমার ভালো লাগল না।"[২] কিন্তু চাষী সদ্‌গোপের ছেলে সীতারাম নতুনকালের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও, বিদ্যাশিক্ষায় অনুরক্ত হয়েও একালের সবকিছু গ্রহণ করতে পারে না। নিজে প্রগতির পথে এগিয়েও একটি বিশেষ সীমা লঙ্ঘন করার শক্তি সে এখনও অর্জন করতে পারেনি, তাই ধীরাবাবুর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: সন্দীপন পাঠশালা, পৃঃ ১৮২।
২। " " পৃঃ ১৮৩।

ভালবাসা থাকা সত্বেও প্রাচীনা জননীর উপদেশ পরামর্শকে শিরোধার্য করে চলে। ধীরাবাবুকে বলে এর প্রত্যুত্তরে, "আপনার কর্ম উচ্চ, সাধনা বিপুল, হয়তো জন্মান্তরের পুণ্য—নয়তো যে কোন কারণেই হোক জন্ম থেকেই আপনার উপলব্ধির প্রতিভা বড়। আপনার মন্ত্রের প্রয়োজন নাই আমার আছে।"[১] বলা বাহুল্য তারাশঙ্কর সীতারামের এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি এনে আবেগনির্ভর হয়েছেন এবং বাস্তব কারণকে এড়িয়ে গেছেন। এবং "যারা আকাশে ওঠে—উঠতে পারে—তাদের কাছে আকাশের কথা, আকাশে উঠবার পথের উপদেশ বা মন্ত্র না নিয়ে মাটির মানুষের উপায় কি?"[২] এই আকাশ মাটির মানুষের পার্থক্য দেখিয়ে লেখক সীতারামের মানসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—যে সীতারাম সমস্ত জীবন ধরে চাষী সদ্গোপ শ্রেণীর সম্মান অর্জনের জন্য সাধনা করল, সেই সীতারাম একসময় এমন দুর্বল হয়ে পড়ল যে, ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ কামনায় ঈশ্বরদর্শনের ব্যাকুলতা নিয়ে পুরাতন জীর্ণ মানুষের ন্যায় দিন কাটাল। এতে সেই নিষ্ঠাবান সংগ্রামী চরিত্রটির প্রতি বোধ করি অমর্যাদা করা হয়েছে।

'ভুবনপুরের হাট' উপন্যাসে হাটের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের মধ্যে যুগের, কালের পরিবর্তন ধারাটি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কারের মৃত্যু হচ্ছে—পৌরাণিক নানা ভাবধারা জীর্ণ বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে—নতুন ভাবধারা জন্ম নিচ্ছে। জাতধর্মের ব্যবধান কালে কালে নিঃশেষিত হয়েছে—আর মানুষের বিশ্বাস নেই ঐসব পুরাতন সংস্কারে—তাই দেবতার কাছে ঢেলা বাঁধায়ও কোন আস্থা নেই একালের মেয়ে মালতীর। সে গন্ধেশ্বরীতলায় গিয়ে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : সন্দীপন পাঠশালা, পৃঃ ১৮৩।
২। " " পৃঃ ১৮৩।

ঢেলা খুলে এসেছিল। কিন্তু তবু উপন্যাসের শেষে আবার মালতী কি সেই বিশ্বাসকেই বরণ করল? তা নইলে নবু ঠাকুর ও মালতী যখন পরস্পরকে গ্রহণ করল তখন কেন যেতে হল তাদের বাবা ভুবনেশ্বর তলায়? কেন আবার দেবতাকে সাক্ষী করতে হল এভাবে? শিব আর দুর্গা বাস করছেন মা গন্ধেশ্বরী আর বাবা ভুবনেশ্বর হয়ে এই ভুবনপুরে—তখনও কি তাদের এই প্রত্যয়ের প্রতি পিছুটান ছিল? সম্ভবত তারাশঙ্করের ঐতিহ্যানুরাগ, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি মমতা কিংবা দেবদেবী বিশ্বাস এভাবেই যুগ পরিবর্তন-ক্ষণেও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। উপন্যাসের শেষে তারই স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

'গুরু দক্ষিণা' উপন্যাসে আদর্শবাদী শিক্ষক চন্দ্রভূষণকেও এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। যুগের পরিবর্তনে নবীনরা আর প্রবীণদের আদর্শ অনুসরণ করতে চায় না। এ যুগ বিজ্ঞানের—ধর্মের নয়, ছাত্ররা ঈশ্বরবাদী নয়, বিজ্ঞানবাদী—তাই চন্দ্রভূষণের ঈশ্বরবিশ্বাসে আঘাত করে এ কালের নবীন যুবকরা—স্তোত্র পাঠ করতে এজন্য তারা অসম্মত হয়ে দরখাস্ত করে। কিন্তু চন্দ্রভূষণবাবুও তার ভাবধারাকে কোন-মতেই ত্যাগ করবেন না—বরং পদত্যাগপত্র দিলেন—এত সাধের স্কুল ত্যাগ করলেন। নবীন শক্তির কাছে প্রবীণকে পরাজয় স্বীকার করতে, হল, যেখানে মতানৈক্য সেখানে তাঁর শিক্ষাদান আর চলবে না। তারাশঙ্করের সহানুভূতি কিন্তু এখানেও পরাজিত ব্যর্থ শিক্ষকের প্রতি।

তারাশঙ্করের নবীনতম উপন্যাস 'শতাব্দীর মৃত্যু'তে তিনি কাল পরিবর্তন ও দুইকালের দ্বন্দ্ব সংঘাতের একটি পরিপূর্ণ রূপ তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাস সমাপ্তির পূর্বেই ঔপন্যাসিকের মৃত্যু হয়। তবু এই উপন্যাসে ১৮৭২ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যবর্তী কালে ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির একটি সামগ্রিক বিবর্তন-ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। "একালের বাংলাদেশের

ইতিহাস বাঙালীর অত্যন্ত সুপরিচিত কাল। যদি বলি বিগত এক দীর্ঘায়ু বৃদ্ধ জরাজীর্ণ কালের সদ্যমৃত্যু ঘটেছে এবং ওইকালের বৃদ্ধা পত্নী এক নূতন কিশোর কালকে নাবালক পুত্র হিসেবে অবলম্বন করে সমস্ত বাংলাদেশের বাঙালী সমাজরূপী যজমানকে ধরে রেখেছেন --নূতন মন্ত্র, নূতন তন্ত্র মতে সংসার যজ্ঞ সবে প্রজ্বলিত করেছেন, তাহলে অন্যায় বলা হবে না, তখন সতীদাহ প্রথা উঠে গেছে, বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছে, প্রচলিত হয়নি, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও দুচারজন লেখাপড়া শিখছে।"[১] বাঙালীর নবজাগরণের পরক্ষণেই এই উপন্যাসের নায়ক মন্মথ জন্মায় বাংলাদেশের এক গণ্ডগ্রামে -নিষ্ঠাবান সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে। ঐ পরিবারের অন্য একজনও সেকালেই ভাগ্য অন্বেষণে গ্রাম ত্যাগ করে কলিকাতায় আসে এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্মথের একদিকে তার পিতা প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, বিশ্বাস, দারিদ্র্য নিয়ে উপস্থিত—অন্যদিকে তার সচ্ছল খুল্লতাত, নগরজীবন, নগর সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ। খুল্লতাত জটাধর কলিকাতা নগরীর সব আধুনিকতাকেই যে গ্রহণ করতে পেরেছেন তা নয়--কিন্তু এযুগের মন্মথ একালের এই আধুনিক শিক্ষা সভ্যতার প্রতি গুণমুগ্ধ হয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে এবং ক্রমশ তার চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। "মধ্যে মধ্যে অনুভব করে যে, তার বাবা সেই অতি প্রসন্ন সৌম্যদর্শন মানুষটি অনেক দূর থেকে আরও অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন, তাদের গোবিন্দপুর গ্রাম, তাদের ঠাকুর গোবিন্দ, তাদের বাড়ীর সংলগ্ন বাগান···এসব অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে।"[২] এক সময়ে যে মন্মথ পাশ করে রাধাগোবিন্দের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: শতাব্দীর মৃত্যু, পৃঃ ২।
২। " " পৃঃ ৩৪৭-৪৮।

সেবা ও দীক্ষা দেবার সঙ্কল্প নিয়েছিল—আজ সেই মন্মথ আইন পাশ করে ওকালতি করার স্বপ্ন দেখে। "বাবাকে পেলে সে আজ প্রশ্ন করত—আপনি বলেন যে যা অমৃত নয়, তা নিয়ে করব কি? কিন্তু এই অমৃতই বা কি? একি সত্যি? স্বর্গ? স্বর্গ আছে?"[১] এ প্রশ্ন শুধু মন্মথর নয়—একালের মানুষের প্রশ্ন এটা। এই পরিবর্তনের স্রোতে মন্মথর পুনর্জন্ম হল—এখন সে নানা বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী চিন্তায় অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। বাসুকী নাগের মস্তিষ্ক চালনার ফলে ভূমিকম্প হয় না—একথা সে অকপটে বলতে পারে। গ্রামের শ্রদ্ধেয় স্মৃতিতীর্থের চরণ ধুইয়ে দেবার পিত্রাদেশ পেয়ে সে ভাবে অন্য কথা—"স্মৃতিতীর্থের পা দুখানির দিকে চেয়ে দেখলে, না পায়ে আঙুলের ফাঁকে হাজা নেই", "অর্থাৎ এসব সংস্কারকে বিচার করার প্রবণতা তখন তার এসেছে। সে ব্রাহ্মধর্ম, পাশ্চাত্য সভ্যতা, নগরজীবনকে ক্রমশ যাচাই করছে, উপলব্ধি করছে, ফলে দুইকালের এই সন্ধিলগ্নে তার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নানা চিন্তাভাবনা, নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত দুই কালের বিপরীতধর্মী দুই প্রভাবে সে প্রতিনিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়ে চলেছে।

---

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: শতাব্দীর মৃত্যু, পৃঃ ৩৪৯।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনীতি-চিন্তা ও সমাজ-চিন্তা

তারাশঙ্কর স্থায়িভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে। এর পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি একান্তভাবেই রাজনৈতিক কর্মী, কংগ্রেস কর্মী, মুখ্যত আদর্শবাদী সমাজসেবী ছিলেন। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল বিস্তৃত এবং নানা অভিজ্ঞতা সংগ্রহে সুযোগও ছিল যথেষ্ট। তারাশঙ্কর সাহিত্য রচনাকালে যে বরাবর বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছেন তার একটা বড় কারণ দেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শুধু বহিরঙ্গ দেখেই তিনি ক্ষান্ত হননি ; বাস্তব সত্যকে তার গূঢ় তাৎপর্যসহ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যও তাই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, এরই ফলে সমাজ সংকট, রাজনীতি সংকট ও তার পরিবর্তন ধারাটি তাঁর সাহিত্যে বাস্তব-সম্মত রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সমাজসেবা থেকে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে উত্তরণ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তারাশঙ্কর যে রাজনীতির মোহ ত্যাগ করে কলম ধরেছিলেন এবং একান্তভাবেই সাহিত্য সেবাকে গ্রহণ করেছিলেন সেটাই বরং ব্যতিক্রম। বস্তুতঃ রাজনীতির একটা অদম্য আকর্ষণ আছে যা অনেকের পক্ষেই অতিক্রম করা প্রায় দুঃসাধ্য। তারাশঙ্কর নিজেও এই কথা স্বীকার করে বলেছেন: "কল্লোল, কালিকলম গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্যপথে, রাজনীতির পথে, সে বন্ধন, সে আকর্ষণ আমার তখন কম দৃঢ়, প্রবল নয়।"[১]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন, পৃঃ ৩৩।

সুতরাং এমন ক্ষেত্রে রাজনীতি-চিন্তা বা সমাজ-চিন্তার একটি বিশিষ্ট রূপ তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে উপস্থিত থাকাই স্বাভাবিক এবং তারাশঙ্করের এ সম্পর্কে কি জাতীয় মতবাদ ছিল, এটিও একটি সঙ্গত প্রশ্ন। তাঁর সাহিত্যে এই সমাজ চিন্তা ও রাজনীতি-চিন্তা প্রতিফলিত হয়ে তাঁর ঐ মতবাদটিকে সুস্পষ্ট রূপদান করেছে, বলা চলে।

সমাজ রাজনীতিনিরপেক্ষ কোন বস্তু নয়। সমাজজীবন চিরকাল একইভাবে চলে না এবং সামাজিক ব্যবস্থা, সংগঠন, আচারবিধিও পরিবর্তনশীল। কোন কিছু সেখানে অনাদি ও অনন্ত নয়, যেহেতু পরিবর্তনই তার অমোঘ নিয়মে যথাসময়ে উপস্থিত হয়। এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া ইতিহাস সচেতনতার লক্ষণ, তবে এই পরিবর্তন মানেই পুরাতনের সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হওয়া নয়। পরিবর্তনে পূর্ব অবস্থা রূপান্তরিত হয়, কিন্তু নূতনের সঙ্গে পুরাতনের যোগও কিছুটা থাকে। তবে এই পরিবর্তন কখন, কেন আসবে, কিভাবেই বা আসবে তা নির্ভর করবে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও পরিবর্তন কামনা কি অবস্থায় আছে বা কি আশা করে তার উপর। রাজনীতি এই পরিবর্তনকে কখনো করে ত্বরান্বিত, কখনো করে শ্লথ। রাজনীতিই এই পথ নির্দেশ করে, কোন্ উপায়ে সমাজ ধারাটি বদলাবে তা স্থির করে দেয়। এরই ফলে নানা মত-পার্থক্যের ও মতভেদের মধ্য দিয়ে কম্যুনিজম, সোস্যালিজম ইত্যাদি নানা 'ইজম' বা 'বাদ' সৃষ্টি হয়। দেশসেবা বা সমাজসেবার সঙ্কল্পে মানুষ এক একটি মতবাদ সমর্থন করে, তার পছন্দমতো রাজনীতি খুঁজে নেয়।

প্রথমজীবনে তারাশঙ্কর যে রাজনীতির পথ থেকে বিদায় নিয়ে সাহিত্যসেবার পথ গ্রহণ করতে সঙ্কল্প করেছিলেন, তার কারণ রাজ-নীতির দলীয় উপদলীয় সংঘর্ষ তাঁর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়েছিল। তখন তাঁর কাছে সম্ভবত, 'দেশসেবার' অর্থ ছিল রাজনীতিহীন সমাজসেবা। কলেরা, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে

তিনি গ্রামের যে সেবা করেছিলেন তেমনি সেবা, সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজ। তাই 'দেশসেবা' এবং 'সমাজসেবা'—দুটিকে ভিন্ন অর্থে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজনীতির উদেশ্যও তো এই সমাজ ও দেশেরই সেবা, উপরন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিজ দল, মত বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া যায়। রাজনীতি-সচেতন মানুষের কাছে এইজন্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের লড়াইটি সময়বিশেষে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। শুধু সৎ মানুষ, বিবেকবান মানুষ রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়াটাই একমাত্র কাম্য নয়, কি প্রণালীতে তারা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবেন, সেটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেমন সমাজকাঠামো তাদের কাম্য, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটি তাদের কেমন, ব্যক্তিগত মালিকানা, না সামাজিক কর্তৃত্ব, না রাষ্ট্রীয় শিল্পে তাদের আস্থা, গণতন্ত্রে তাদের কতটুকু বিশ্বাস, ব্যষ্টির চেয়ে তারা সমষ্টিকে বেশী গুরুত্ব দেন কিনা—এইসব প্রশ্নই তখন বিস্তৃত বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। তাই দেশসেবাকে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন রাখা গেলেও পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশসেবা এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়—দুটি অভিন্ন হয়ে পড়ে। মোটকথা, দেশসেবারই শৃঙ্খলাবদ্ধ তত্ত্বভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রণালীর জন্য রাজনৈতিক দল ও মতের প্রয়োজন, এই ভিন্ন মতাবলম্বী দলের ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করে বহুলোক তাদের দেশসেবার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াটি খুঁজে নেন। সেইজন্য রাজনীতি-বর্জিত দেশসেবা সীমিত গণ্ডিতে সম্ভব হলেও বৃহৎ পরিধিতে একেবারেই সম্ভব হয় না।

এই অবস্থায় রাজনীতির কলহও মারাত্মক কিছু ত্রুটি নয়। যদিও এ সকল দ্বন্দ্বে অনেক সময় অনেক কদর্যতা-কলুষতা-ছুৎমার্গ দেখা দেয়, কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে এসব থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয় না। কংগ্রেসের রাজনীতিতে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব অনেক সময় কদর্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শগত

পার্থক্যটাও ঐ সময়ই প্রথম প্রকট হয়ে পড়ে। কংগ্রেস সে আমলে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মিলিত রণক্ষেত্র, কংগ্রেসের উদার আঙিনায় তখন নানা মতের নানা দলের মানুষ ঐ একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছেন, দেশ স্বাধীন হলে তার সমাজ কিংবা অর্থনীতির রূপটা কেমন হবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে অনেকেরই কোন ধারণা ছিল না—আবার যারা এ নিয়ে ভাবতেন তাদের মধ্যে মতভেদের ব্যবধান ছিল দুস্তর। জেলখানাই সাধারণত এইসব আদর্শগত বিরোধ ও তাত্ত্বিক বিতর্কের স্থান ছিল। দেশকর্মীরা সমাজবাদ—সাম্যবাদ—পুঁজিবাদ নিয়ে জেলে বসে পড়াশুনা করতেন এবং নিজ নিজ মতের সপক্ষে অন্যদেরও দলে টানতে চাইতেন। আবার এই-সব দলমতকে ভিত্তি করে কংগ্রেসের ভিতরে উপদলীয় কোন্দলের সূত্রপাতও হত জেলে বসেই। দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী দ্বন্দ্বের যে রূপ দেখে ১৯৩০-এর জেলবাস কালে তারাশঙ্কর শিউরে উঠেছিলেন, সেটা তো ভারতীয় রাজনীতির একটি অতি পরিচিত রূপ। ১৯০৭-এ সুরাট কংগ্রেসে এই চরমপন্থী-নরমপন্থী কলহের প্রথম প্রকাশ্য সূত্রপাত। গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব নেওয়ার পর তাঁর দেশব্যাপী প্রভাবের ফলে কিছুকাল হয়ত বা দ্বন্দ্ব একটু স্তিমিত হয়েছিল কিন্তু অবসান কখনও হয়নি। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ এই মতভেদের সূত্র ধরেই আলাদা স্বরাজ্য দল করেছিলেন, এই চরম নরম কলহে স্বয়ং গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে সুভাষ-পট্টভি সীতারামাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হন, এমন কি সুভাষকে তিনি অসহযোগও করেন। স্বাধীনতার পথটি কি হবে তাই নিয়ে যে চরমপন্থী দ্বন্দ্ব (এবং এর আনুষঙ্গিক উপদলীয় কোন্দল) তারাশঙ্করকে পীড়িত করে, কয়েক বছর পর ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেসের ভাঙনে সেই কলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয়। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ১৯৭০-এ দেশগঠনের রূপটি কি হবে তাই নিয়ে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মতভেদ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে

দ্বিধাবিভক্ত করতেও দেখা গেছে। রাজনীতিতে আদর্শগত বিরোধ একটি সাধারণ ঘটনা, এতে অনিবার্যভাবেই কদর্যতারও অনুপ্রবেশ ঘটে, কিন্তু সেই কদর্যতাই একমাত্র সত্য নয়, আদর্শগত বিরোধটাই প্রধান।

তারাশঙ্কর প্রথমাবস্থায় যখন বেদনা বা বিরক্তি নিয়ে রাজনীতি ছেড়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে বিরোধটাই প্রধান মনে হয়েছে। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও তখন কম ছিল—এবং ঐ বয়সে তেমন বিশ্লেষণক্ষমতাও তাঁর সম্ভবত ছিল না এর বাস্তব রূপ সম্পর্কে। দেশপ্রেমের আবেগটাই তখন মুখ্য ছিল। দলীয় কলহে উদাসীন থেকে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন, "আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসি, তারা তো সুভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের সেবা করতে আসে না।"[১] দেশসেবার এই আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীই তাকে একসময় উদ্দীপ্ত করেছিলেন—"একসময় কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে জাগিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত করার সঙ্কল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মত লেলিহান।"[২]

গান্ধীবাদ:

প্রথম জীবনে বিপ্লববাদের প্রতি আকর্ষণবোধ করলেও প্রথম মহাযুদ্ধকালে বাংলার বিপ্লবীদের ব্যর্থ উদ্যমসমূহ সম্ভবতঃ তাঁর মনে দ্বিধা সৃষ্টি করেছিল এবং এতে কার্যকরী কোন ভূমিকা নেই ভেবে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ৫২।
২। " : " " পৃঃ ৩৩।

তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই জার্মান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে ইউরোপে বৃটিশ শক্তির ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল, সেই সময় একদিকে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব বৃটিশ-শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নেয় এবং অপরদিকে ভারতের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্যসংখ্যক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবপন্থীরা মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা কোন সময়ই শ্রমিক কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেননি। মহাযুদ্ধের সময় তারা যে বৈপ্লবিক আন্দোলন চালান, একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া তা সর্বত্র গণ-সংযোগহীন হয়ে পড়ে। ফলে তা জাতীয় সংগ্রামের পর্যায়ে উঠতে পারেনি এবং দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগহীন হয়ে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তারাশঙ্কর লিখেছেন: "ওদিকে বাংলার বিপ্লবের ক্ষেত্রে নিদারুণ দুর্যোগ নেমে এল—দিকে দিকে ব্যর্থ হয়ে গেল বিপ্লবের উদ্যম।"[১] এর পরই গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন—গান্ধীর নীতিবোধের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন তিনি এবং এতেই ভবিষ্যতের রাজনীতি চিন্তা কি হবে, সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়। তিনি নিজেই লিখেছেন: "তারপর এল উনিশশো একুশ। একটা যুগান্তর ঘটল ভারতের রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে। আমার জীবনক্ষেত্রেও এল। আমি দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ পাইনি। কাজেই আমার জীবনে দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশা বড় ছিল না। দেশপ্রেমের আবেগটাই বড় ছিল। কোন সমিধে যজ্ঞ বিধেয়, যজ্ঞডম্বুরে বা অশ্বত্থ কাষ্ঠে এ নিয়ে শাস্ত্র বিধান তখনও আমার বড় হয়ে উঠতে পায়নি। যজ্ঞবহ্নিই ছিল বড়, তাতে আত্মাহুতিই

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃ: ৩৩।

একমাত্র বিধি ছিল আমার কাছে। ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে। যা ঘটে নাই—সকলে যা ঘটতে পারে না বলে ভাবে—তাই ঘটবে—সেই আকাশ কুসুম ফোটানোর উন্মাদনাই বড় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমার জীবনে সাহিত্যের দিক থেকে ওই আবেগ আমাকে আকর্ষণ তখন বেশী করত। আরও একটা দিক আকর্ষণ করেছিল সেটা হল মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা।"[১]

সে সময় গ্রামের সমাজ জীবনে তিনি ক্রমশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন, অল্পবিত্ত জমিদারের গ্রামোন্নয়নের নেশা নয়, দেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগসঞ্জাত সমাজসেবা, গান্ধীজীর আদর্শে হাতে-কলমে পল্লী উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়েছেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯—এই তিন বৎসর তারাশঙ্কর গ্রামের মানুষের আত্মার আত্মীয়, ইতিমধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারেও বসেছেন তিনি। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি জেলে গেলেন এবং কারাবাসে থাকাকালেই রাজনীতি ছেড়ে আসার সঙ্কল্প নিলেন। জেলখানাতেই 'পাষাণপুরী', 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস দুখানি রচনা শুরু হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের রাজনীতি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পরিবর্তিত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে আদর্শগত বিরোধ যে স্বাভাবিক ঘটনা সেকথা তারাশঙ্করও নিশ্চয় মেনে নিয়েছিলেন। নিজে আদর্শগত সামীপ্য-বোধ করেছিলেন বলেই আজীবন কংগ্রেসী ছিলেন, আবার আদর্শগত বিরোধ দেখা দিতেই কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ফ্যাসিবিরোধী লেখকসংঘ পরিত্যাগ করে চলে আসেন।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ৩৩-৩৪।

কিন্তু সেই ১৯৩০।৩১-এ তাঁর পক্ষে রাজনীতির জটিল, কুটিল রূপ স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই জেলখানার মোহ কাটিয়ে তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তারাশঙ্কর রাজনীতি ছাড়লেও রাজনীতির মূল প্রবাহের সঙ্গে তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক রয়ে গেল।

রাজনৈতিক নেতা নরেন ব্যানার্জী যিনি একসময় লাভপুরে অন্তরীণ ছিলেন তিনি তারাশঙ্কর সম্পর্কে বলেছেন: "কংগ্রেসের আন্দোলনে ও তো জেলে গিয়েছিল, এখন আর যাবে না বলেছে। ওর দেশবোধ যাবে কোথায়? ঠিকই, সাহিত্যের কামড়ই শুধু কচ্ছপের কামড় নয়, ওই রাজনীতির কামড়ও কচ্ছপের কামড়—যাকে ধরে তাকে আর ছাড়ে না, ছাড়লেই কি ঘা শুকোয় সহজে? তারাশঙ্করের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে বুঝেছিলাম, বাইরে ঘা শুকিয়েছে, কিন্তু মনে ঘা শুকোয়নি। না ভেবে পারেন না দেশে কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিত?"[১] তারাশঙ্করের রাজনীতিচিন্তার ধারাবাহিক সূত্রটি তাই তাঁর সাহিত্যে বর্তমান। রাজনীতিতে গান্ধীবাদেই যেহেতু তাঁর মূল আকর্ষণ ছিল তাই তাঁর উপন্যাসেও গান্ধীবাদের প্রতি সশ্রদ্ধ বিশ্বাস সর্বদাই অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাহিত্যরসের শর্তপূরণ করেও গান্ধীবাদকে তিনি কোন সময়ই বিস্মৃত হতে পারেননি কারণ মানব-জীবনের মূল নীতিবোধ—ন্যায়, সত্য, ইত্যাদিতে পরিচালিত হতে গিয়ে গান্ধীবাদকেই তিনি সর্বত্র মহিমামণ্ডিত করে রেখেছেন।

পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদের সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন—"মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এই সাম্যবাদের আদর্শের সঙ্গে মিলিত হলে এক মহত্তর আদর্শে পরিণত করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। নিছক বৈষ্ণব ও শাক্ত মতের গোঁড়ামির মত মতবাদের গোঁড়ামি

১। গোপাল হালদার: তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর (কালি ও কলম, ১৩৭৮ অগ্রহায়ণ), পৃঃ ৬৩৪।

অন্তরায় হয়েছে।[১] অর্থাৎ সাম্যবাদ বা মার্ক্সবাদকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসানীতি দ্বারা মহৎ আদর্শে রূপান্তরিত করার কল্পনা করেছেন লেখক—এতে অহিংস ধর্মের প্রতি তাঁর যে সুগভীর শ্রদ্ধা তা ব্যক্ত হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর রচনায়ও কোন-না-কোন উপায়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ এনেছেন—গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। শ্রেষ্ঠ কটি উপন্যাসে যেমন : গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম ইত্যাদিতে তারাশঙ্কর একজন খাঁটি গান্ধীবাদী সাহিত্যিকের ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং গান্ধীবাদের আদর্শকেই রূপায়িত করেছেন। চৈতালী ঘূর্ণি, মন্বন্তর ইত্যাদিতে যদিও কম্যুনিষ্টদের প্রতি তাঁকে সহানুভূতিসম্পন্ন মনে হয়, কিন্তু সেখানেও গান্ধীবাদের মূল সোপান থেকে নেমে দাঁড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন এবং এই কম্যুনিজম বা বিপ্লব ইত্যাদি পরিকল্পনার সঙ্গে গান্ধীবাদী আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

আশাবাদী প্রত্যয় : 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী'

তারাশঙ্করের 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসটির পত্তন জেলখানায় এবং এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। 'এই গল্পটির মধ্যে আমার ভাবী সাহিত্যিক জীবনের সুর নিহিত আছে'।[২] পল্লীসমাজের বিধ্বস্ত অবস্থা। পল্লীর মানুষের উপর জমিদার, মহাজন কাবুলিওয়ালার অত্যাচার তখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। গ্রাম্য চাষী এই অত্যাচারে অনাহারে মৃতপ্রায়—'চৈতালী ঘূর্ণি'তে তারই চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। গোষ্ঠ দুঃখে-কষ্টে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায়, জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে স্ত্রীর হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এল,

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কথা (শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৭১), পৃঃ ২৬৫।

২। ,, ,, : আমার সাহিত্যজীবন, (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪৮।

কাজ নিল এক কারখানায়। অত্যাচার, নিপীড়ন সেখানেও কিছু কম নয়। এখানে এক ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়ে তাকে প্রাণ হারাতে হল। অবশেষে জমিদারী অত্যাচার থেকে বাঁচতে গিয়ে গোষ্ঠ যে ছোট্ট শহরে এসে কাজ নিল কারখানায়–সেখানেও শোষণের চেহারাটি একই রকম। ধর্মঘটের প্রাক্কালে এখানকার শ্রমিকদের মধ্যে ভদ্রলোক বাবুদের প্রতি অবিশ্বাস দেখা গেছে। তাদের ধারণা—বাবুরা শেষ পর্যন্ত তাদের সমর্থন করবে না, নিশ্চয়ই বেইমানি করে সরে যাবে। এঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর তবু ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন শিবকালী আর সুরেনবাবুকে, যেহেতু তাঁরা গান্ধীশিষ্য। ধর্মঘট ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত, কিন্তু এই চৈতালী ঘূর্ণি যেন কালবৈশাখীর আগমনের ইঙ্গিত দিয়ে গেল। সেই চূড়ান্ত পরিবর্তনের আশাই শিবকালীর মুখে শোনা গেল—'চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর'।[১]

'চৈতালী ঘূর্ণি'র রচনাকাল ১৯৩১। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে বইখানি উৎসর্গ করেন তারাশঙ্কর—'বইখানি উৎসর্গ করলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে। বাংলার যৌবনশক্তির তিনি প্রতীক। নবযুগের অগ্রদূত। শুধু তাই নয়···এই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'[২] এই চৈতালী ঘূর্ণিতে কালবৈশাখী বলতে তারাশঙ্কর কি ধ্বংসের আবাহন করছেন? যে ধ্বংস বর্তমানের সহস্র মালিন্যকে, কদর্যতাকে নির্মূল করে নতুন সমাজ গড়ে তুলবে, তাই কি তিনি চেয়েছেন? সুভাষচন্দ্রের সাহচর্যে মুগ্ধ তারাশঙ্কর কি সেই সময় গান্ধীবাদের ঐতিহ্য ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সহিংস বিপ্লব কামনা করেছিলেন ঐ কালবৈশাখীকে স্বাগত জানিয়ে? তবে কি লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য যে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: চৈতালী ঘূর্ণি, পৃঃ ১২১।
২। " : আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪৯।

কোন পন্থা গ্রহণের নীতিতে ক্ষণকালের জন্যও তিনি সহানুভূতি বোধ করেছিলেন ?

১৯৩০-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ অচিরাৎ মিলিয়ে যেতে সম্ভবতঃ দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে তারাশঙ্কর শঙ্কিত হয়েছিলেন। কারণ যে-কোন উপায়েই হোক, তাঁর ঐকান্তিক দেশানুরাগ ও দেশমুক্তি-কামনা অক্ষুণ্ণ ছিল। তখন ঐ আন্দোলনের ক্ষীণ ঘূর্ণিতে হয়ত তাঁর মন ভরেনি, যার ফলে সুভাষচন্দ্রের ঐ বিদ্রোহী সত্তাকে তিনি এই মুক্তিযুদ্ধের দিশারীরূপে কল্পনা করেছিলেন, দেশব্যাপী স্তিমিত অন্ধকার ও হতাশার মধ্যে তিনি হয়ত আশার আলো অন্বেষণ করেছিলেন এবং তখন সুভাষচন্দ্রকে তাঁর নবযুগের অগ্রদূত মনে হয়েছিল।

এইখানে তারাশঙ্করের রাজনীতির একটি বিশিষ্ট দিক উল্লেখ করতে হয়। তারাশঙ্কর রাজনীতিতে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায়ও রাজনীতি-সর্বস্ব মানুষ ছিলেন না। রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে বিপ্লববাদ বা সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যদিও তাঁর পরিচয় ছিল, তবু একটি বিশেষ মতবাদ অর্থাৎ গান্ধীবাদকে জীবনে গ্রহণ করার মূলে রাজনীতিচিন্তা তত প্রকট ছিল না মনে হয়। তিনি রাজনীতির সূক্ষ্মবিচারে যে গান্ধীবাদ বা কংগ্রেসী নীতিকে আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন তা নয়, মানবজীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস নীতির সাযুজ্যই তাঁকে এ পথে আকৃষ্ট করেছিল। গান্ধীবাদের এই অহিংস আদর্শের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-অন্যায় বোধ ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি তাঁর মানসিকতার পক্ষে উপযুক্ত ছিল— এবং তাই এই নীতি, এই আদর্শ থেকে তিনি কোন অবস্থায়ই বিচ্যুত হয়ে পড়েননি। সুভাষচন্দ্র-সেনগুপ্ত বিরোধকালেও তিনি সুভাষকে কংগ্রেসের বিচারালয়ে অন্ধ সমর্থন জানাতে পারেননি। নিঃসঙ্কোচে বলেছেন—"আমি দেশের সেবা করতে চেয়েছি—চাই—

তাই সত্য বলতে সাক্ষী দেব আমি।"[১] সুভাষচন্দ্রও কিন্তু এতে অসন্তুষ্ট না হয়ে প্রসন্ন হেসে সায় দিয়েছিলেন—"নিশ্চয়, মানুষকে দেবতা হিসাবে সেবা করলে সাধনাই পণ্ড হয়ে যাবে।"[২] তারাশঙ্কর তখন অভিভূত হয়েছিলেন তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতায়, মনে মনে এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত প্রণতি জানিয়েছিলেন, আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

গান্ধীর সঙ্গে সুভাষের আদর্শগত বিরোধ তখনো দানা বেঁধে ওঠেনি। তারাশঙ্কর সে সময় আসলে সুভাষের বিরাটত্বের কাছে, সৎ উদার ব্যক্তিত্বের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। সুভাষকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে এই মানুষটিই বুঝি দেশের কাণ্ডারী হবেন। তখন তারাশঙ্করের এমন একটি বিশ্বাসের প্রয়োজনও ছিল, কারণ জেলখানায় রাজনীতিসর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে তাঁর চিন্তা তখন ভারাক্রান্ত, আশঙ্কিত ও রাজনীতিবিমুখ। এই আত্মকলহে হতাশার মধ্যে দীপ্তিমান তারুণ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি সুভাষকে তখন হয়ত ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়েছিল তাঁর।

কিন্তু তবু 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে বিপ্লবের ইঙ্গিতই একমাত্র বক্তব্য নয়। সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, জমিদারের, মহাজনের, কাবুলীওয়ালার অত্যাচার সমাপ্ত হবে কোন বিপ্লবের ভাঙনের মধ্য দিয়ে? নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়ে মানুষের রিক্ততা, ব্যর্থতার, সমাধি রচনা হবে এ তার কাম্য হলেও এই পঙ্কিল সমাজের মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য সুরেন ও শিবকালী-চরিত্র দুটির মধ্যে তিনি সততা ও বিশ্বাসকে খুঁজে পেয়েছেন। মহাজন, জমিদার, কলের মালিক সকল যখন প্রবঞ্চক, প্রতারক—তখন গান্ধীর শিষ্য এই

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ৫২।
২। " " " পৃঃ ৫২।

দুজনই সৎলোক হিসাবে তারাশঙ্করের সহানুভূতি লাভ করেছে। শ্রমিকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এমন রাজনৈতিক কর্মী এরা নয়, তারাশঙ্কর সেকথা স্পষ্টই জানিয়েছেন। ফলে শ্রমিক ধর্মঘটে ইন্ধন জোগাবার অপরাধে তাদের চাকরী গেল, অথচ তাদের আদর্শনিষ্ঠা কমল না। ধর্মঘটরত শ্রমিকদের অন্নসংকট কালে সুরেন-শিবকালী ভিক্ষা করে, রাজমিস্ত্রী তার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার খুলে দেয়, সুবল খুলে দেয় তার দোকান, ছোট মিস্ত্রী তার ঘড়ি। গোষ্ঠের সঞ্চয় কিছু নেই—শেষ সম্বল জীর্ণ বালা দুগাছি দামিনী এনে দেয় তার গোপন ভাণ্ডার থেকে। কিছু শ্রমিক কিন্তু কাজে যোগ দিল ক্ষুধার তাড়নায়—গোষ্ঠ তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ দিল "জান দে গা, লেকিন নেহি যায়েগা"[১] গোষ্ঠ এ কথা বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আর একযুগ পর গান্ধীজীর আহ্বান 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র সঙ্গে এই উক্তির তুলনা করা চলে। আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়াটা বড় কথা। ন্যায়সংগত সংগ্রামের সাময়িক পরাজয় কেবল ব্যর্থতাই নিয়ে আসে না। এতে চূড়ান্ত সংগ্রামে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় ও অনির্বাণ আশাবাদের সূচনা করে—এই গান্ধীবাদী প্রত্যয় তরুণকর্মী শিবকালীর মধ্যে রয়েছে। আত্মঘাতী কলহে শ্রমিকরা পরাভূত আজ, কিন্তু তবু তরুণ নেতারা আশা করে, এই চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি কালবৈশাখীরই অগ্রদূত। অর্থাৎ এই সাময়িক সংগ্রাম পরবর্তীকালে অনেক উচ্চস্তরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সংগ্রামে পরিণত হয়ে সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করবে—বর্তমানের এই দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন, অত্যাচার-অনাচার সমাজ থেকে অন্তর্হিত হবে এই কালবৈশাখীর আবির্ভাবে। সুভাষের মত মানুষের তাই প্রয়োজন এই সমাজ ও রাজনীতিকে পরিচালিত

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: চৈতালী ঘূর্ণি, পৃঃ ১২১।

করতে—একথা তখন তারাশঙ্করের মনে হওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। তারাশঙ্কর কোন 'ইজমে'র পক্ষ নিয়ে এখানে কিছু লেখেননি বোধ হয়। কেবল সমাজে, রাজনীতিতে একটা বড় পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন। তবে শিবকালীবাবু ও সুরেনবাবু ঠকাবার আদমী নয়, এরা মহাত্মাজীর চেলা[১] এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তখন ছোট মিস্ত্রী বলছে "আমি কাউকে বিশ্বাস করিনে, সে চেলাই হোক আর ফেলাই হোক, আমাদের ভাতে মারে, আমরা হাতে মারব—এই বোঝাপড়া হয় রাজি আছি।"[২] 'হাতে মারা' অবশ্য গান্ধীবাদী আদর্শের বিরোধী, কিন্তু এখানে গান্ধীবাদী তারাশঙ্করও সম্ভবত সুভাষ বসুর আদর্শকে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। চৈতালী ঘূর্ণি সুভাষ বসুকে উৎসর্গ-এর সংগে সঙ্গতিপূর্ণ।

একই সময়ের রচনা 'পাষাণপুরী', এই উপন্যাসেও তাঁর গান্ধীবাদে প্রত্যয় অক্ষুণ্ণ আছে। গান্ধীশিষ্য রাজনৈতিক বন্দী যারা, তারা অন্যান্য বন্দীদের চেয়ে অনেক বেশী সমাদর ও শ্রদ্ধা পেত, তা তিনি উল্লেখ করেছেন। নরু চরিত্রের প্রশান্ত নম্রতার মধ্যে সত্যাগ্রহীদের আদর্শের আভাস আছে। তাদের সুন্দর হাসি দেখে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত ভাবে, কি করে এরা এমন করে হাসতে পারে, এই নির্যাতন সহ্য করেও জেলখানাকে এরা কি করে বলতে পারে 'মুক্তি মন্দির'। জেলখানায় সকলশ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে তাই নরুর ভাবাদর্শ এক নবীন ভাবলোক রচনা করে। নরু অনশন ধর্মঘট করেছে, দুশ্চিন্তা করছে জেলের সকল মানুষ। নরুর ভাবধারা জেলের সঙ্কীর্ণ বদ্ধ জীবনকেও যেন আন্দোলিত করে, তার মৃত্যুতে প্রতিটি মানুষ বিষাদগ্রস্ত হয়, জেলখানার গ্লানিকর মনুষ্যত্ব বিলাসী বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে মুক্তির ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়েছে নরু।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : চৈতালী ঘূর্ণি, পৃঃ ৮৮।
২। " " : পৃঃ ৮৮।

চরমমূল্য সে দিয়েছে তবু মানবাত্মার অপমানের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করেনি। তার এই আত্মদানের মহিমার কাছে পাষাণপুরীর দুর্ভেদ্যতা প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছে।

'পাষাণপুরী' 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে তারাশঙ্করের গান্ধীবাদে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক চিন্তাধারাটি সুস্পষ্ট নয়। 'চৈতালী ঘূর্ণির' হাতে মারার মত 'পাষাণপুরীতে'ও গান্ধীবাদী প্রত্যয়ের বিপরীতধর্মী চিন্তা বা মন্তব্যও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পাষাণপুরীতে "বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত কবিবার উপায় মানুষের বুঝি আজও জানা নাই"[১] মন্তব্যের সঙ্গে গান্ধীবাদী প্রত্যয়ের কোন সামঞ্জস্য নাই। তাই মনে হয়, তখন তারাশঙ্করের রাজনীতি-চিন্তায় কিছুটা সংশয় সন্দেহ ছিল, তাই তাঁর মতবাদও কোন একটি বিশ্বাস দ্বারা সুগভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠেনি তখন পর্যন্ত। এইজন্য হয়ত গোঁড়া গান্ধীবাদী সমালোচক প্রিয়রঞ্জন সেন তারাশঙ্কর সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত। প্রবাসীতে তখন তিনি লিখেছেন: "কলের শ্রমিক ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে। নায়ক গোষ্ঠ পুলিশের গুলি খাইয়া মরিয়াছে, লেখক এই ঘটনাকে 'চৈতালী ঘূর্ণি'র সহিত তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে। চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্রদূত কালবৈশাখীর। অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক কি হয়। কালবৈশাখী আসে কিনা।"[২]

'চৈতালী ঘূর্ণি' বেরোবার পর অনেকে তারাশঙ্করকে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু তারাশঙ্কর অসঙ্কোচে জানিয়েছেন, মার্কসের ক্যাপিটেল বা তাঁর লেখা কোন বই তিনি তখনও পড়েননি। বাংলাতে প্রকাশিত মার্কসবাদ সম্বন্ধীয় কিছু লেখা পড়েছেন মাত্র। 'আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধি-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কারণ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: পাষাণপুরী, পৃ: ১০।
২। " : আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃ: ৮৯।

ও কর্মে, এবং সেই কর্ম ও কারণে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রবাহ চলেছে, রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেই পেয়েছিলাম এই তত্ত্বের সন্ধান।···হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম।"[১] তারাশঙ্কর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া অপর ঘটনায় সংক্রমিত হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রামায়ণে ও মহাভারতেই আবিষ্কার করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, অন্যায়ের প্রতিকার একদিন হবেই এ ধারণা ও নীতিবোধ তাঁর ছিল এবং চৈতালী ঘূর্ণির শেষে একটি ঘটনা অন্য একটি বৃহত্তর ঘটনার বীজ রোপণ করেছে এবং এই অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই একদিন এই আশা পোষণ করেছিলেন, বলেছেন। অবশ্য মার্কসবাদের কয়েকটি অভিনব তত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল এ কথাটিও স্বীকার করেছেন "সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমন ভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফত জেনেছিলাম প্রথম—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে। কিন্তু তার বস্তুবাদসর্বস্বতাকে মানতে পারিনি। পথ ও লক্ষ্যের বৈষম্যকেও আমি ভ্রান্তি এবং অপরাধ বলে মনে করি। মনে করি এতেই নিহিত আছে তার ভবিষ্যৎ বিপদ।"[২]

তারাশঙ্কর কোনদিনই তাঁর সাহিত্যে মার্কসবাদকে মহিমান্বিত করতে পারেননি, মার্কসবাদের এই বস্তুবাদসর্বস্বতা তাঁর পছন্দ ছিল না বলে। এছাড়া সামাজিক সাম্যই মানুষের সব নয়—কেবল অর্থ-

---

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ৮৯-৯০।

২। " " " পৃঃ ৯০-৯১।

নৈতিক সাম্য দ্বারা পরম কাম্য লাভ হয় না। পরম কাম্য বলতে তিনি অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধতাকেই বুঝিয়েছেন। "ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব, সত্যকামের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অবস্থায় উত্তরায়ণে, পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের ভিত্তির উপর। সমাজকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করে ছাঁচে ফেলা মানুষ তৈরী করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না। মনুষ্যত্ব কোনও মেড ইজি উপায়ে পাবার নয়। সমাজতান্ত্রিক বায়োলজি বিজ্ঞানের কথা শুনেছি। আমি বৈজ্ঞানিক নই, অভ্যাসে অভ্যাসে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় কি না হয় সে তর্কে না গিয়েও বলব মানুষ গিনিপিগ নয়, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিতে সে প্রচণ্ডতম শক্তিশালী। মানুষকে অ্যাটম বোমার ঘায়ে মেরে ফেলা যায়। তাকে ভীত করে সাময়িকভাবে হার মানানোও যায় কিন্তু সত্যকথা জয় করা যায় না। হিরোসিমা নাগাসিকির মানুষদের প্রকৃতি কি পরাজয় মেনে নিয়েছে? তারা কি কখনোও ভুলতে পারবে একথা?···বিড়ম্বিত জীবনের দুর্ভোগ ও পীড়ন থেকে মুক্তিই শুধু তার কাম্য নয়—সে জন্মান্তরেও এর প্রতিহিংসা চাইবে। যে আজ যত দান নিয়ে আসুক, যত সাহায্যই করুক, তবু সে ভুলবে না। যাতে ভুলানো যায়, যাতে হিংসা-জর্জর প্রকৃতিকে প্রসন্ন করা যায় সে হল প্রেম, সে হল অহিংসার সাধনা।"[১]

গ্রামীণ সমাজে মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনার নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় রাজনৈতিক বিক্ষোভের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে স্থানীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, আজীবন সমাজ-কর্মী তারাশঙ্করের দৃষ্টি তা এড়িয়ে যায়নি। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দীপনা বা কারাবরণের উন্মাদনা নিঃশেষ হয়ে গেলেও তাঁর

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন, পৃঃ ৯১-৯২।

দেশাত্মবোধ দেশব্যাপী নানা নৈরাশ্য লক্ষ্য করেও সে সময় আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'চৈতালী ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী'তে আশাবাদকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই 'পাষাণপুরী'র তমসার পাশাপাশি জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রাখল নরুর আত্মত্যাগ—'চৈতালী ঘূর্ণি'র অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যেও কালবৈশাখীর আবির্ভাবের ইঙ্গিত—অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শুভদিনের আগমন প্রত্যাশা লক্ষ্য করা যায়। তখন তারাশঙ্করের রাজনীতি-চিন্তা বা সমাজ-চিন্তা কোন বিশিষ্ট অবয়ব না পেয়েও বা তাঁর চিন্তাধারায় যথেষ্ট অস্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও তিনি যে নতুন কথা বলতে চেয়েছিলেন অন্তরের স্বতন্ত্র এক উপলব্ধি নিয়ে তা অস্বীকার করা চলে না। এই রাজনৈতিক জীবন-ধারায়ও তিনি সনাতন মানব-জীবনের মনুষ্যত্বের বা মানবতাবাদের কোন বিশেষ সত্তাকেই অন্বেষণ করছিলেন বলা যায়। "রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা। জীবনমুক্তি বলতে দেহমুক্তি বা পরলোক সাধনা নয়। জীবনমুক্তি বলতে জীবনের চারি-পাশের সকল প্রকার ভয়ের বন্ধন, সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন অর্থাৎ গণ্ডি, সকল অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষে সংগ্রাম করে চলেছে অবিরাম। ···সে সময়ের রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি-সংগ্রামই প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমি, মানবীয় মহিমার সনাতন লীলা এ পটভূমিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং দিনে দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। আমার কল্পনা ছিল এই দেশের মানুষের একদিন অভ্যুদয় হবে। উঠবে বিপুল মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, আত্মপ্রকাশ করবে বিরাট অভ্যুত্থানে। সে অভ্যুত্থান হবে অহিংস অভ্যুত্থান, পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন, সর্বপ্রথম। বুদ্ধের আবির্ভাব তপস্যাবীজ গান্ধীজীর কর্মসাধনায় তা পরিণত হবে ফলবান

বৃক্ষে। সে অমৃতফল থেকে মুক্ত হবে মানুষের ইতিহাসের ভাবী অধ্যায়গুলি।"[১]

হিংসা বনাম অহিংসা : 'ধাত্রীদেবতা'

'ধাত্রীদেবতা'য় (১৩৪৬) তারাশঙ্কর লেখক হিসাবে অনেক পরিণতবুদ্ধি। 'ধাত্রীদেবতা' তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। তখনকার কালের রাজনীতিতে হিংসা-অহিংসার যে সংঘাত প্রবল ছিল, 'ধাত্রী দেবতা'য় তা সম্পূর্ণরূপে চিত্রায়িত। চৈতালী ঘূর্ণিতে 'হাতে মারা' এবং গান্ধীশিষ্যদের মহত্ত্ব দুটি ভাবধারার সহাবস্থানে লেখকের রাজনীতি চিন্তা যেমন সংশয়াচ্ছন্ন মনে হয়,—'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের সমাপ্তিতে সেই দ্বিধার অবসান হয়েছে। তারাশঙ্করের নিজের জীবনেও তিনি হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্বটি দেখেছেন. নিজের পরিবারের মানুষের মধ্যে। তাঁর মাতুল বাড়ীর সঙ্গে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল—তিনি নিজে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর দেশানুরাগের প্রতি আকর্ষণবোধও করেছিলেন, সুতরাং হিংসা নীতির সঙ্গে তাঁর প্রথম জীবনেই পরিচয় হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসার বিরুদ্ধে অহিংস অভিযানের আদর্শ নিয়ে এলেন গান্ধীজী। প্রথম এর সক্রিয় প্রয়োগ ঘটাতে চাইলেন ১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে—তাতে তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। 'ধাত্রী-দেবতা' যখন প্রকাশিত হয়, তার আগে থেকেই বাংলাদেশের সর্বত্র রাজনীতির জোয়ার নেমেছে—দেশের মুক্তি অন্বেষণ করছে মানুষ। ১৯৩০-এ একদিকে গান্ধীজীর অহিংস আইন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃঃ ১০৭—১০৮।

অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। তারাশঙ্কর জেলের মধ্যে থাকতেই এই বিপরীতমুখী তরঙ্গ দুটিকে দেখেছেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের পরই বাংলার বিভিন্ন গলি-ঘুঁজিতে বিদ্রোহের বাণী শোনা যায়—অবাস্তব বলে অহিংসাকে পরিহার করতে চাইছে একদল তরুণ, তাদের মুখে জীবন দাও, জীবন নাও। এই নিদারুণ সংঘাতকালে 'ধাত্রীদেবতা' আসন্ন। মা-পিসিমার মধ্যে এই দ্বন্দ্বটি শিবনাথকে কেন্দ্র করে পরিস্ফুট হয়েছে। হিংসে করা মার অপছন্দ, তাই সে জীব হিংসা করে না। ১৯০৫-এর স্বদেশী ও ১৯২১-এর অহিংসা একই সঙ্গে পাওয়া যায় ধাত্রীদেবতায়, যে সব আদর্শে পিসিমার কোন বিশ্বাস নেই—"কি যে তোমার শিক্ষার ধারা বউ, তুমি বোঝ ভাই। শাক্ত জমিদারের ঘরের ছেলেকে তুমি মালা জপাতে চাও নাকি?"[১] শিবনাথের রাজনীতি-চিন্তায় যে দ্বন্দ্ব, সেটা অনেকটা শিবনাথের অধিকার নিয়ে মা-পিসিমার সংঘর্ষের প্রতিরূপ।

মা বলেন, "দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে।"[২] পটো পাড়ার কথা তোলেন মা। 'লক্ষ্মীর কৃপায় সুন্দর হয়ে থাকত, সেই জায়গাটা, আজ এইখানে ভেবে দেখ মা কি ছিলেন, কি হয়েছেন।"[৩] মায়ের দেশবোধ পটো পাড়ার দৈন্যে ব্যথিত, কিন্তু এর বেশী তিনি এগোতে পারেননি। শিবনাথ রোগে, শোকে, মহামারীতে সেবাধর্ম করতে চায়, দেশপ্রেম প্রকাশের অন্য কোন রাস্তা তখনো সে খুঁজে পায়নি। কিন্তু স্বাধীনতা হীনতা যে সকল অনর্থের মূল, এই রকম একটি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ২৬।
২। " " পৃঃ ৬৫।
৩। " " পৃঃ ৬৫।

ধারণা তখন তার মনে ক্রমশ দৃঢ়মূল হচ্ছিল, সুশীলকে সে বলে, 'উই হ্যাড আওয়ার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, ইন দি ল্যাণ্ড এণ্ড দি পিরিয়ড অব দি গ্রেট মোগলস'[১]। তাই শ্মশানকালী পূজোতে আনন্দমঠের কথা মনে পড়ে যায় শিবনাথের—"কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিকাময়ী, হৃতসর্বস্ব, এইজন্য অগ্নিকা, আজি দেশের সর্বত্র শ্মশান তাই মা কঙ্কালমালিনী, আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—মা যা হইয়াছেন।"[২]

অতঃপর তিনজন দেবী প্রতিমাকে প্রণাম করল। সুশীল প্রণামের মন্ত্র বলে দিল 'বন্দেমাতরম্'। পরিশুদ্ধ এই আবেগ এই একটি শব্দ মন্ত্রের মত সমগ্র বাংলাদেশে, প্রধানত হিন্দু তরুণদের মন্থিত করেছে। মা, পিসিমার পর শিবনাথের উপর আনন্দমঠের প্রভাব পড়েছে খুব বেশী। আনন্দমঠ তাকে অভিভূত করেছে। শিবনাথের প্রস্তুতিকালে একদিকে মা, রতনমাষ্টার, পিসিমা, রামজী বাবা, অন্যদিকে রাজসিংহ ক্যাসাবিয়াঙ্কা, আঙ্কল টমস কেবিন ও আনন্দমঠ। ধাত্রীদেবতায় আনন্দমঠের বহু উদ্ধৃতি আছে। ভক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ভক্তির তো কোন অভাব ছিল না। শিবনাথ মাকে, পিসিমাকে, গ্রামের লোককে, দেশকে ভক্তি করেছে কিন্তু কোন্ পথে কল্যাণ আসবে? শিবনাথের চোখে অনেকদিন পর্যন্ত তা অস্পষ্টই থেকে যায়, ফলে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার যথার্থ পথ। অপবাদের ভয়ে সে কখনো দেশসেবা করতেও ভীত হয়ে উঠছে। সুশীল তাকে অভয় দেয়—"অপবাদ অপমান লাঞ্ছনা নির্যাতন বিষাক্ত অস্থি কণ্টকের মত চারদিকে বিস্তৃত, প্রণাম করিতে গেলেই সে ললাটে ক্ষতচিহ্ন না আঁকিয়া ছাড়িবে না।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ৯৫।
২। " " পৃঃ ১১৫।

আবার পরম ভক্তের ভাগ্যে জোটে কি জানেন? সর্বনাশীর লোল রসনায় জাগিয়া উঠে আকুল তৃষ্ণা, তাহার স্কন্ধে পড়ে খড়্গাঘাত, ভক্তের রক্তে পূর্ণ হয় দেবীর খর্পর। তৃষ্ণা না মিটিলে দেবী প্রসন্না আত্মস্থা হইবেন কেন?"[১]

এই সুশীলের মারফতই বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সঙ্গে শিবনাথের পরিচয়, সুশীল তাকে ভক্তি নিয়ে দেশের সেবা করতে বলল বটে, কিন্তু কোন্ পথে সে অগ্রসর হবে, সে পথের সন্ধান পেল না। আসলে সুশীলের মত অন্যান্য বিপ্লবীরাও এর স্পষ্ট জবাব কি, জানতেন না। ফলে বারবার তারা অনুগামীদের নিরাশ করেছেন এবং আত্মপ্রতারণাও করেছেন। প্রতিকারের কোন উপায় তারা দীর্ঘকাল ধরেই খুঁজে পাননি। আবেগসর্বস্ব দেশপ্রেম অকারণ আত্মত্যাগের কারণ হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে তা সহায়ক হতে পারে না। ইংরেজ লুণ্ঠনকারীদের প্রতি সকল বিদ্বেষ অভিযান চালিয়ে দেশীয় লুঠেরাদের তারা আবার আড়ালও করে রেখেছেন। নইলে, এই গ্রামীণ বাংলার দুঃখ-বেদনার কারণ তো একমাত্র ইংরেজ ও তার যন্ত্রসভ্যতা নয়। বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী গর্ভেই দেশের নানা সমস্যা যন্ত্রণার উদ্ভব হয়েছে, সেখানে প্রতারণা, বঞ্চনা ও হতাশার ইতিহাস দীর্ঘকালের, শিবনাথ ও সুশীল-চরিত্রের নেপথ্য প্রাণপুরুষ তারাশঙ্কর কিন্তু সেইদিকে নির্লিপ্ত। সুশীলের মত বিপ্লবীরা জমিদারকুলের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ইংরেজ-বিরোধী ও স্বাধীনতাকামী। কিন্তু এই পরাধীনতার সঠিক বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের অবকাশ বা ইচ্ছা তাদের দেখা যায় না, 'মা কি ছিলেন আর মা কি হইয়াছেন,' একথা তাদের মুখে আছে। কিন্তু কি করে কার সহযোগিতায় এমন অবস্থা হয়েছে সেকথা তারা

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ১৩৪-৩৫।

কোন সময়ই বলেননি। ভক্তি দিয়ে মাকে পরিতুষ্ট করার শপথে আবেগের ঘাটতি নেই, আন্তরিকতারও অভাব নেই, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে শুধু আবেগ ও ভক্তিই যথেষ্ট নয়। ভক্তির পণ নিয়ে এই সকল বিপ্লবীরা কখনও বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেছেন (১৯০৫), কখনো বা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন (১৯০৮), আবার নিরস্ত্র অহিংসাকেও মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন (১৯২১), কিন্তু তাতে তুষ্টি আসেনি। "কোন একটা নিশ্চিত কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে ঐ অটল 'ভক্তি'তে একটানা লড়াই করতে পারেনি, বিভ্রান্তির পর বিভ্রান্তি ঘটেছে।"[১] সুশীল যেভাবে সেদিন ভক্তিতত্ত্বের কথা বলে বিদায় নিল, তাতে মনে হতেপারে পথটা ওর জানা আছে, শিবনাথকে তা বলার উপযুক্ত হয়নি এখনো। বিপ্লবী নেতারা দীর্ঘদিন অনুগামীদের অনুরূপ ভাঁওতা দিয়েছেন। কেননা তাঁরাও সঠিক পথ জানতেন না।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেমে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু প্রধানত এঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ, বিশেষ করে বর্ণহিন্দু সমাজের প্রভাবিত ছিল বলে এই দেশপ্রেম শ্রেণী-নিরপেক্ষ, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদের বিদ্বেষ যতটুকু ছিল, স্বদেশী জমিদার মহাজনের উৎপীড়নের কথা তাঁরা তেমন করে ভাবতেই পারেননি। বরং জমিদার মহাজনদের বিপন্ন অবস্থায় এঁরা সহায়তাই করেছেন এবং কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণ সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। জামালপুরের কৃষকরা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদার মহাজনের করবৃদ্ধি ও পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়, তখন ঐ সকল

১। পুলকেশ দে সরকার: ধাত্রীদেবতা (কম্পাস—শারদীয়া সংখ্যা, ১০৭৩), পৃঃ ১১২৩।

জমিদার মহাজনরা এই বিদ্রোহকে (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে) হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ নামে রটনা করে। 'যুগান্তর' দলের স্বেচ্ছাসেবক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তখন হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করতে আসেন—এমনকি এ খবর কলিকাতায় পৌঁছাবার পর আরো কিছু বিপ্লবী বোমা, পিস্তল, রিভলভার নিয়ে হিন্দুদের সাহায্য করতে আসে। জামালপুরের কৃষকদের জমিদার-মহাজন বিরোধী অভ্যুত্থান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয় এবং এইভাবেই বিপ্লবীদের সহায়তায় জমিদার মহাজনদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিপ্লববাদীদের সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে যারা প্রকৃত সাহায্য করবে—সেই সাধারণ মানুষই এখানে অবহেলিত, উপেক্ষিত থেকে যায়। সম্ভবত, এইজন্যই তাদের আদর্শবাদ ও কর্মপন্থার মধ্যেও স্ববিরোধিতা ছিল। নানা সময় নানাভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা। সুশীলের মত বিপ্লবীরাও এই দলেরই, ফলে তাদের কাছে সেদিন কোন্ উপায়ে, কিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রসর হতে হবে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বারবারই ভক্তি আর আবেগেরই প্রকাশ ঘটেছে কেবল। দেশ, দেশ করে মেতে উঠেছেন, কিন্তু দেশবাসীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেননি।

এই সময় সুশীল একদিন মহাযুদ্ধের খবর নিয়ে এল—সময়টা ১৯১৪, ১৫ বা তারও আগে। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, মাণিকতলা বোমার মামলা, আলিপুর মামলা অবশ্য এই সময়ই—১৯০৮ থেকে ১৯১১র মধ্যে। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টা চলে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতেই। ধাত্রীদেবতায় আছে— "ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করিবার কল্পনা করিয়া বাংলার যে তরুণ দল ভারতের স্বাধীনতালাভের সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধানে উন্মত্ত অধীর গতিতে নীরন্ধ্র অন্ধকার পথে ছুটিয়াছিল, এই সময় তাহাদের গতিবেগ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। ভাবীকালের

কোন মণিকোঠায় স্বাধীনতার দীপশিখা জ্বলিতেছে, কত দীর্ঘ সে দূরত্ব, কালের কালো জটাজালের অন্ধকার কত জটিল, সে বিবেচনা করিবার অবসর তখন তাহাদের নাই। পশ্চিমের রণাঙ্গনের রণবাদ্যের ধ্বনি, সৈন্যবাহিনীর পদক্ষেপের শব্দ, মারণাস্ত্রের গর্জনশব্দে উন্মত্ত হইয়া তাহারাও বর্তমানকালকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালকে জয় করিতে যাত্রা শুরু করিয়া দিল। সুশীলকে দেখাই যায় না। সে নাকি সমগ্র উত্তরাপথ—লাহোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটা বিরাট ব্যবস্থার চেষ্টায় ফিরিতেছে।"[১]

শিবনাথ বৈপ্লবিক আয়োজনের সঙ্গে যখন প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে, তখনই পলিটিক্যাল দাদার মুখে শোনা যায় "বৈদেশিক রাজনীতির ফল এই এ্যানার্কিজম অনুসরণ করা আমার মত বিরুদ্ধ। এপথ ভুল।"[২] তপস্যা অথবা যজ্ঞের পথ না হলেও অন্ততপক্ষে গুপ্তহত্যা আর গুপ্তষড়যন্ত্রের পথ নয় এটা ঠিক। পূর্ণর পিস্তলে দাদার মৃত্যু শিবনাথের জীবনের দিক পরিবর্তন করে এবং হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসায় আস্থা জন্মে। এখানে হিংসার বিরুদ্ধে দাদার প্রত্যেকটি কথা তারাশঙ্করের নিজস্ব প্রত্যয়সম্ভূত। শিবনাথের ছায়ায় তারাশঙ্করের কায়া ভেসে উঠেছে—তারাশঙ্কর ক্রমশ গান্ধীবাদে আশ্রয় লাভ করেছেন—"আমি আর একটু বেশি চাই। চরম উন্নতির সঙ্গে চাই পরম উন্নতি। আমার সভ্যতা, আমার জাতীয় ভাবধারা অনুমোদিত পন্থায় পরমপ্রাপ্তির সাধনার সুযোগ, অধিকার, আমার উপর বিদেশী রাজশক্তির চাপিয়ে দেওয়া বিদেশী জীবনদর্শনকে আমি অস্বীকার করতে চাই, আমার জীবনের সাধনায় অপরের নির্দেশ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ১৬৩-১৬৪।
২। " " " পৃঃ ১৭৪।

আমি মানতে চাই না। পূর্ণ, আজ বৈদেশিক শাসনের ফলে তাদের জীবনদর্শনের চাপে চরমবস্তু পরমকে ভুলিয়ে দিল, আমি স্বাধীনতা চাই সেইজন্য আর সেইজন্যেই বিদেশী নির্দিষ্ট এনার্কিজম বা টেররিজম আমি গ্রহণ করতে পারি না।"[১] এই উক্তিটিতে গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতেরই প্রতিধ্বনি রয়েছে—"ঐশীশক্তির অস্ত্রে ভারত সংগ্রাম করে এসেছে এবং এখনও ভারত তা করতে পারে। অন্যান্য জাতিসমূহ পশুশক্তির উপাসক…ভারত আত্মার শক্তিতে সবকিছু জয় করতে পারে,… জঙ্গীনীতি গ্রহণ করলে ভারত সাময়িকভাবে জয়লাভ করতে পারে। সে অবস্থায় ভারত আর আমার হৃদয়ের গৌরব-স্বরূপ থাকবে না…আধ্যাত্মিক ক্ষুধার প্রয়োজনীয় খোরাক জোগায় বলে মাতৃবক্ষ সংলগ্ন শিশুর মত ভারতকে আঁকড়ে থাকি।"[২]

বিপ্লববাদের পথ থেকে বিচ্যুত হবার অপরাধে গান্ধীবাদী দাদার মৃত্যুর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শিবনাথ। শিবনাথ এই গুলি করে হত্যায় যত না বিচলিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী পীড়িত বোধ করেছে পূর্ণর মানসিক যন্ত্রণা দেখে। অথচ এই পূর্ণরই নাকি সেন্টিমেন্ট কম, সবার ধারণা। শিবনাথ দেখেছে মৃত্যুকালেও দাদা স্থির ও শান্ত—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অবস্থায়ও তিনি অগ্রিম চিঠি লিখে গেছেন—আততায়ীকে ক্ষমাও করে গেছেন। একখানা চিঠিতে লিখেছেন, "আমার কৃতকর্মের জন্যই জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমি আত্মহত্যা করিতেছি।"[৩] অপর খানায়—"তোর চোখে যে আগুন দেখলাম পূর্ণ, তাতে আজই বোধহয় ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হবে। যদি সত্যিই হয় আমি জানি দলের হুকুমে তোকে এ কাজ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ১৭৪।
২। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী: আমার ধ্যানের ভারত, পৃঃ ১-২।
৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ১৭৬।

করতে হবে, আর এ নিয়ম যারা করেছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন···কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ রইল ভাই এপথে আর অগ্রসর হোসনি।"[১] কেননা যে পথে যে মতে তার বিশ্বাস নেই—সে পথে কাউকে যেতে উৎসাহিত করতে পারেননি দাদা। এই পরিপ্রেক্ষিতে একজন মহামানবের মৃত্যুকালীন উক্তি স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ে যায়। যীশুখৃষ্ট মৃত্যুর সময় বলেছিলেন—

> O Father forgive them, they knoweth not what they doeth.

এবং স্বয়ং গান্ধীরও মৃত্যু একই ভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে। তাঁরও শেষ কথা ছিল 'হা রাম', শেষ সময়ে রামের শরণাগত। এই দাদার যুক্তি তর্ক আবেগের মধ্যে তারাশঙ্কর স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন এবং এককালে বিপ্লববাদে আকৃষ্ট একটি মানুষ যে ক্রমশ গান্ধীবাদকে গ্রহণ করছে, এরও স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সম্ভবত এই বিপ্লববাদকে কোন সময় সমর্থন করার জন্যই, গোঁড়া গান্ধীবাদীদের ন্যায় বিপ্লববাদের প্রতি কোন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নেই বরং তাদের দেশপ্রেমের প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে—"তোদের কি ভুল বুঝতে পারি রে? এ মিশন কতবড় পবিত্র, নিঃস্বার্থ সে কি আমি জানি না? ধর্ম নেই, অধর্ম নেই, প্রবৃত্তি নেই, নিবৃত্তি নেই দেশমাতৃকা তোদের ঋষিকেশ আদি জননী, তোদের আমি চিনিনা?"[২]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ধাত্রীদেবতা পৃঃ ১৭৬।
২। " : " পৃঃ ১৭৮।

গান্ধীবাদে আশ্রয় :

'ধাত্রীদেবতা'য় এইভাবেই বিপ্লবদলে বিশ্বাসী শিবনাথকে অহিংসায় দীক্ষিত করার অতি নিপুণ প্রস্তুতি দেখা যায়। দাদার ভ্রান্তিস্বীকার, মৃত্যু, উদার মার্জনা, পূর্ণর বেদনা সব মিলিয়ে সে সন্দেহাকুল, বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তারপরই এল মার মৃত্যু—যে মা তাকে জীবহিংসা পাপ এ শিক্ষা দিয়েছিলেন। পিসিমা গেলেন কাশী বাসে। পারিবারিক নানা ঝামেলা, জমিদারীর নানা অভাব অভিযোগ ইত্যাদির মধ্যেও দেশমাতৃকাকেই সে দেখছে, "মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে দেশের অবস্থা দেখিয়াছে। এই দুঃখের প্রতিকার খুঁজিয়া সে সারা হইয়া গেল, দেশ দেশান্তরের ইতিহাসের মধ্য হইতে প্রতিকারের উপায় খুঁজিতেছিল।"[২] কিন্তু রক্তাক্ত পথের প্রতি সে বিরূপ। দেশের স্বাধীনতার কামনা, জমিদারী রক্ষার সমস্যা—সব তাকে বিব্রত করে। কি দরকার এই জমিদারীর ? প্রুধোর কথা সে পড়েছে এবং জমিদারী সম্পর্কে সে তা বিশ্বাসও করে "Property is theft, because it enables him who has not produced to consume the fruits of other people's toil" অথচ তবুও "যেমন করিয়া হউক সম্পত্তি রাখিতেই হইবে।"[৩] এই তার সঙ্কল্প। এখানেও শিবনাথ ও তারাশঙ্কর একাত্ম। কিন্তু তাতেও শান্তি নাই, পথ কই ? শিবনাথ দেশকর্মী। সে তো জমিদারীর ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারে না, আবার দেশ ছেড়ে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে সে আবার দেশসেবায় ফিরে এল। জমিদারী সম্পত্তির পুরোপুরি মায়া কাটানো শিবনাথের মতো তারাশঙ্করেরও সম্ভব ছিল না মনে হয়, এখানেও তারাশঙ্করের সমাজ-চিন্তা আদর্শ জমিদারসুলভ—ন্যায় ও কল্যাণবোধের আদর্শে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ২২১।
৩। „ : „ পৃঃ ২৩৩।

অনুপ্রাণিত। গান্ধীজী বলেছেন—“বর্তমানে রায়তদের যে বোঝা বইতে হচ্ছে, একজন আদর্শ জমিদার তার বেশ কিছুটা ভার লাঘব করবেন। তিনি রায়তদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবেন এবং তাদের অভাবের কথা জেনে যে হতাশা তাদের জীবনী-শক্তিকে ধ্বংস করেছে তার বদলে তাদের ভেতরে আশার সঞ্চার করবেন, রায়তদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি নিজে জানবেন এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি একসঙ্গে সেখানে নিজের ও রায়তদের সন্তান সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তিনি গ্রামের কূপ ও পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করবেন।'[১] জমিদার কুলের প্রতিনিধি শিবনাথের (তারাশঙ্করের) পরিকল্পনাও প্রায় তেমনি তাই—“পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে সে এক পয়সাও গ্রহণ করে না, সে অর্থে প্রয়োজনমত প্রজার সাহায্য হয়, বাকি জমিতেছে, জমিয়া প্রচুর হইলে তাহা হইতে একটা বড় কাজ হয়তো হইবে। প্রজাদের গ্রামে গ্রামে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিবে।”[২] এইভাবে যদি প্রজাদের মঙ্গল সাধিত হয় তাহলে প্রজারা অনেক উন্নত হবে এবং এই চাষীদের মধ্যে কর্ম প্রচেষ্টার ফলে তার কল্পনার গণ-আন্দোলন - গণবিপ্লবও হয়তো সম্ভব হতে পারে কোনদিন। এসব তার ক্ষীণ আশার সূত্র—“চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে পড়িল রাওলাট রিপোর্ট, রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, নাগপুর কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হইতে চলিয়াছে, ধীরে ধীরে মন আবার আশায় ভরিয়া উঠিল। সে কল্পনা করিল এই গ্রাম হইতে একদিন ভাবী পুরুষের দল সারি বাঁধিয়া অভিযান করিয়া চলিয়াছে গণ-আন্দোলনকে পুষ্ট

১। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী : আমার ধ্যানের ভারত, পৃঃ ৫৫

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ২৬৭-২৬৮।

করিতে। অহিংসা তাহার মূলমন্ত্র।”[১] মোটকথা তারাশঙ্করের চিন্তাও সে সময় সমাজ ও দেশ সম্পর্কে এইভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

আড়াই বছরের নির্জনবাসে, একক কর্মসাধনায়, অধ্যয়নে অভিজ্ঞতায় শিবনাথ পুরোপুরি গান্ধীবাদে দীক্ষিত হয়েছে, পুরাণো সাথী সুশীল এসে যখন জানাল পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত বিপ্লবের একটি ধারা ব্যর্থ হয়ে গেল, শিবনাথ তাতে বিস্মিত হল না। সুশীলের কাছে শিবনাথের এই তাঁতচরকা অর্থহীন, এই সংগ্রাম পন্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও শিবনাথের এতে অটল আস্থা—“তুমি বিশ্বাস কর না সুশীলদা, আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি, আমার সাধনা জীবনেই হয়ত সিদ্ধ হবে না, কিন্তু সাধনার সঞ্চয় হারাবো না, সে হারায় না, সে থাকে। আবার একজন এসে তাকে পরিপুষ্ট করে, অহিংসায় আমি বিশ্বাস করি।”

তেত্রিশ কোটি লোকের স্বাধীনতার জন্য ছেষট্টি কোটি হাত উদ্যত করার সাধনা, অর্থাৎ গণবিপ্লব—এই হচ্ছে ধাত্রীদেবতার রাজনৈতিক নির্দেশ, কিন্তু এটা বাস্তবে কতখানি সম্ভব তার যুক্তি বিচারে শিবনাথ আগ্রহী নয়। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গান্ধীবাদীরা চরকার মধ্যে স্বাধীনতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছেন “আমার দৃঢ় ধারণা ভারতের আর্থিক ও নৈতিক অভ্যুত্থানের পথে চরকা ও হস্তচালিত তাঁতের পুনরুদ্ধারই হবে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পাথেয়।”[৩] গান্ধীজী একথা বলছেন তখন। শিবনাথ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ২৬৮।
২। „ „ পৃঃ ২৬৯।
৩। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী: আমার ধ্যানের ভারত, পৃঃ ৬৫।

গান্ধীর আদর্শ বা অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে খুব আশাবাদী। ১৯২১, ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪২—এই ক'বছর ধরে ভারতবর্ষে আন্দোলন কম হয়নি, কিন্তু তবু ছেষট্টি কোটি লোকের হাত কোন সময়ই উদ্যত হয়নি। বরং বলা চলে, অহিংসার প্রচার যারা করতেন তারাও যখনই ছেষট্টি কোটির হাত উদ্যত হবার উপক্রম হয়েছে দেখেছেন, তখনই লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন। ১৯২১-এর আন্দোলন থামিয়ে দেন স্বয়ং গান্ধীজী, ১৯৩০-এর আন্দোলনে শীতল বারি সিঞ্চিত হল আরউইন-গান্ধী চুক্তিতে, ফলে ১৯৩২-এর আন্দোলনও স্বভাবতই দুর্বল হয়ে যায়।

'চৈতালী ঘূর্ণি'র রাজনীতি বা সমাজনীতি বিষয়ক চিন্তাধারায় যে অস্পষ্টতা ও সংশয় ছিল—'ধাত্রীদেবতা'য় তার অবসান দেখা যায়। হিংসা অহিংসার আদর্শগত দ্বন্দ্বে শিবনাথ সম্পূর্ণভাবে অহিংসাকে গ্রহণ করেছে জীবন-সাধনা রূপে। শিবনাথের এই বিশ্বাস—'অহিংসায় আমি বিশ্বাস করি, গণ-আন্দোলন আমি প্রত্যাশা করি, বিশ্বাস করি আমি মানুষকে'[১] তারাশঙ্করের নিজ আদর্শ থেকে উদ্ভূত। 'গণ-দেবতায়' এই বিশ্বাসকে আরো প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর—গ্রাম সংগঠনের স্বপ্নে তিনি তখন অত্যন্ত কল্পনাবিলাসী এবং নতুন সমাজের—সত্যযুগের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা তাঁর মনে, পঞ্চগ্রামে সেই কল্পনা ও স্বপ্নই বিধৃত হয়েছে।

সংগ্রামবিমুখতা : 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' সম্পর্কে তারাশঙ্করের দাবী 'নিজে যেমন দেখিয়াছি তেমন লিখিয়াছি। কতকগুলি হুবহু সত্য ঘটনা কাহিনীর আকারে সাজাইয়া দিয়াছি মাত্র।...অকথিত অনেক কিছু

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ধাত্রীদেবতা, পৃঃ ২৬৯-২৭০।

থাকিল, তবে যাহার কথকতা করিয়াছি, তাহার বাস্তব রূপ সম্পর্কে আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।"[১] 'গণদেবতা'র মুখ্য চরিত্র দেবু ঘোষ। ধর্মভীরু সমাজকর্মী চাষীর ছেলে, পাঠশালার শিক্ষক। গ্রামীণ সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে চরিত্রগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে, সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে—ছিরু তেজারতি করে এখন প্রভাবশালী। অনড় সামন্ততান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রতীক দ্বারিক চৌধুরী, সামাজিক জীবনের সুসংবদ্ধতার নিয়ামক ন্যায়রত্ন—সবাই এখন দুর্বল। অনিরুদ্ধ কর্মকার এই সমাজ-ব্যবস্থার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে—কিন্তু দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দুর্বল গ্রামবাসীদের সমর্থন সে পাচ্ছে না। যে সকল পুরানো সামাজিক অনুশাসন শোষণের স্বার্থে টিঁকিয়ে রাখা প্রয়োজন, সেইগুলি টিঁকে আছে। দেবু ঘোষের মত লোক, যে নাকি চাষীদের পক্ষ নিয়ে পরে শ্রীহরির সঙ্গে সংঘর্ষে নামে সেও অনিরুদ্ধ কামারের পূজো গাঁয়ের পূজোর সঙ্গে এক হতে দেয় না। দেবুর কাছে দুজনই অপরাধী। 'সে ভাবে অনিরুদ্ধ এবং এই ছিরুপাল এই দুইজনই গ্রামখানার সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিল।'[২] কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের গণজীবনে ঔপনিবেশিক আমলের সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক শাসন শোষনের সাঁড়াশী-আক্রমণে যে বিপর্যয় আসে, তারই বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ আছে 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে'। অনিরুদ্ধ সেখানে বিদ্রোহী গণমানসের প্রতীক—সে দিশেহারা, নেতৃত্বহীন। ছিরুপাল সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রতিভূ, এর মাঝখানে রয়েছে আপোষপন্থী দেবু ঘোষ। সে সকলের কল্যাণ কামনা করে, গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষের অত্যাচার নিষ্পেষণের অবসান দেখতে চায়, সুখী সমৃদ্ধশালী গ্রাম সংগঠন করার পরিকল্পনা করে কিন্তু সে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চগ্রামের ১ম সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ৵০।
২। " : গণদেবতা পৃঃ ৭১।

জানে না কোন্ পথে এ পরিবর্তন আসবে, আর এই পরিবর্তন উদ্দেশ্যে সে সংগ্রাম চায় না। সে আশা করে—"দেবতা একদিন আপন মহিমায় জাগ্রত হইবেন, অন্যায়ের ধ্বংস করিবেন, ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন।"[১] পরিবর্তন-সাধনে তাই এই দেবতার মহিমাকেই মানুষের মহিমার চেয়ে সে অধিক প্রাধান্য দেয়। এতকাল ধরে গ্রাম্য সমাজের শাসক, ধারক ও বাহক যে চণ্ডীমণ্ডপ, তার মৃত্যুর আশঙ্কায় আঁতকে উঠার কি প্রয়োজন ছিল দেবুর? কারণ সে তো নতুন সমাজই চায়, চায় পরিবর্তন। কিন্তু এখানে তার এই দুর্বলতা প্রমাণ করে যে সনাতন সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে সে সম্পূর্ণভাবে সম্মত হতে পারছে না। নজরবন্দী যতীনেরও কার্যকরী প্রভাব আছে দেবুচরিত্রে। বস্তুত দেবু যে পরে ঘটনা-প্রবাহে প্রজাসমিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল তা যতীনের প্রেরণাতেই সম্ভব হয়েছে। ডেটিনু্য যতীন কিন্তু বিপ্লববাদী হয়েও ন্যায়রত্নের প্রতি দেবুরই মত শ্রদ্ধাশীল। যতীনের বিশ্বনাথের কথা মনে পড়ে "সে আসিবে, দেবু ঘোষ নবরূপে পল্লীর এই শৃঙ্খলাহান যুগে ভাঙাগড়ার আসরের মধ্যে শ্রীহরিপাল, কঙ্কনার বাবু, থানার জমাদার, দারোগার রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহামারীর আক্রমণকে সে রোধ করিয়াছে। দেবুর বুকে বুক রাখিয়া আলিঙ্গনের সময় সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে অভয়ের বাণী তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইতেছে। সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভের অদম্য আগ্রহের বাণী।"[২]

'গণদেবতা'র প্রথম খণ্ডে দেবু চরিত্রটি বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তৈরী হচ্ছে মাত্র। পঞ্চগ্রামে এসে তা পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে। খাজনা বৃদ্ধির চক্রান্তের বিরুদ্ধে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ গণদেবতা, পৃঃ ৭৮।

২। " " পৃঃ ২৭৪।

পঞ্চগ্রামের চাষীরা আন্দোলনের সঙ্কল্প নিয়েছে। নেতৃত্বের আসনে তাই চাইছে দেবুকে। 'প্রজা ও জমিদারের অর্থশক্তির কথা এবং আইনানুযায়ী অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া সে প্রকারান্তরে নিষেধই করিয়াছিল।'[১] এবং তার মতে বৃদ্ধি দেব না একথা ঠিক হবে না। যা ন্যায়সঙ্গত তার বেশি দেব না-ই বলা উচিত। অবশেষে সকলে দেবুর অভিমতেই স্বীকৃত হল তবু "ভদ্রলোকেরা ধর্মঘটে যোগ দিতে রাজী হয় নাই।"[২] দ্বারিকা চৌধুরী যাকে তারাশঙ্কর অতি সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন "তাহার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী একটি বৃদ্ধি জমিদারের প্রাপ্য হইয়াছে।"[৩] এইখানেই বিশ্বনাথের সঙ্গে এদের প্রভেদ। বিশ্বনাথ আইন পাল্টাবার কথা বলে, মজলিশের অন্যরাও তা অনুমোদন করে—"সরকারের এমন আইন কি করিয়া ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে।"[৪] কিন্তু তবু বিশুকে এই পরিবর্তনের আন্দোলনে কোন বিশিষ্ট আসনে না বসিয়ে দেশান্তরী করেছেন ঔপন্যাসিক। তার সংসার জ্ঞানের অভাব, এইজন্য ন্যায়রত্নও দেবু ঘোষের সঙ্গে তার যোগাযোগে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

দেবুচরিত্রে একজন গান্ধীবাদী কর্মীর সমস্ত দোষগুণ অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রিত। অহিংসা, সত্য, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তার জীবনাদর্শ—তাই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে জমিদার কাছারী থেকে রহম শেখকে ছুটিয়ে নিয়ে আসে, এবং মিথ্যে মামলা দায়ের করার প্রসঙ্গ উঠতেই সে নিষ্কৃতি চায়। এই অবস্থায় দেবুর সঙ্গে জমিদার বাড়ীর যোগাযোগ নিয়েও রটনা শোনা যায়, দেবু কোন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ১০।
২। " " পৃঃ ১২।
৩। " " পৃঃ ১৫।
৪। " " পৃঃ ১০।

প্রতিবাদ না করে তখন মহাগ্রামে আশ্রয় নেয় ন্যায়রত্নের কাছে এবং এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। দেবু, বিশ্বনাথ ও ন্যায়রত্ন দুজনকে দেখছে প্রতিনিয়ত—তাদের আদর্শ ভিন্নমুখী কিন্তু যে গান্ধীবাদী মানসিকতায় তারাশঙ্কর দেবুকে গড়েছেন, তাতে স্বভাবতই ন্যায়রত্নের প্রতি আকর্ষণ তার অধিকতর। ন্যায়রত্ন (এবং তারাশঙ্কর) স্বীকার করেন—এ যুগটা বণিকের এবং ধনিকের, কিন্তু সাম্যবাদকে তারা ধর্মহীন, ইহলোক-সর্বস্ব দর্শন মনে করেন এবং তাই এ আদর্শে তাদের কোন বিশ্বাস নেই। বিশ্বনাথ বলে, এ কালের সঙ্গেই তাদের লড়াই। একালকে শেষ করে আগামী কালকে নিয়ে আসার সাধনা তাদের, দেবু বিশুর মত কালটাকে শেষ করতে চায় না, দুঃখীর দুঃখে তার প্রাণ কাঁদে, গরীব প্রজাদের নির্যাতনে সে পীড়িত হয়, কিন্তু তার ধর্মীয় সংস্কার ছেড়ে বিশুর সাম্যবাদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। এখানে তার ধর্মবোধ পুরোপুরি গান্ধীজীর ভাবধারারই মতো। জমিদারের একটি খাজনা বৃদ্ধি প্রাপ্য হয়েছে বলে দেবুও মনে করে।

এই অকারণ ধর্মভীরু ভাব দেবু ঘোষের চরিত্রকে দুর্বল করে রেখেছে। তাই তার বক্তব্যও হয়েছে অস্পষ্ট। কৃষকদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বারংবার তার কাছে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব চেয়েছে, কিন্তু চরম সংকটকালেও ন্যায় অন্যায় পাপপুণ্য সম্পর্কে তার গান্ধীবাদী প্রত্যয় তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অথচ তার দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও আত্মত্যাগের তুলনা নেই। শোষণের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর যে মনোভাব —দেবুরও সম্ভবত একই মনোভাব।—"আমি জমিদারদের ধ্বংস করতে চাই না, তবে জমিদাররা যে অপরিহার্য এ আমার মনে হয় না। জমিদার ও পুঁজিপতিদের আমি অহিংসা পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাই এবং তাই আমার কাছে শ্রেণীসংঘর্ষ অপরিহার্য নয়। এখনকার প্রয়োজন হল জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিলুপ্তি নয়। তাদের সঙ্গে জনসাধারণের বর্তমান সম্বন্ধের পরিবর্তে এক সুস্থ ও পবিত্র

সম্পর্কের স্থাপনা।"[১] ধাত্রীদেবতায়ও শিবনাথ এই পবিত্র সম্পর্কই স্থাপন করতে আগ্রহী। পঞ্চগ্রামে দেবুর নেতৃত্বে কৃষকদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভটিও পঙ্গু হয়ে গেল। দেবু জমিদারকে খাজনা বৃদ্ধি না দেওয়ার পক্ষপাতী নয় কোনমতেই, তাই এই ধর্মঘটকেও সে সমর্থন করে না। "বিগত একশত বৎসরের মধ্যেই এ পঞ্চগ্রামে যত ধর্মঘট হইয়াছে তাহার কাহিনী শুনাইয়া জানাইয়াছে—কত চাষী জমিদারের সঙ্গে ধর্মঘটের দ্বন্দ্বে সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে, বারবার বলিয়াছে, আইন যেখানে জমিদারের পক্ষে, সেখানে বৃদ্ধি দিব না একথা বলা ভুল, আইন অনুসারে অন্যায়। প্রজা ও জমিদারের অর্থ শক্তির কথা এবং আইনানুযায়ী অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া সে প্রকারান্তরে নিষেধই করিয়াছিল। সকলে দমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশু সেখানে উপস্থিত ছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আইন পাল্টায় দেবু ভাই। আগে গভর্ণমেন্টের মতে জমির মালিক ছিল জমিদার, প্রজার অধিকার ছিল শুধু চাষ আবাদের। প্রজা কাউকে জমি বিক্রি করলে খারিজ দাখিল করে হুকুম নিতে হত। জমির উপর মূল্যবান গোছের অধিকারও প্রজার ছিল না। কিন্তু সে আইন পাল্টেছে। প্রজারা যদি বৃদ্ধি দেব না বলে--না দেবার দাবীটাকে জোরালো করতে পারে সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারে—তবে বৃদ্ধির আইনও পাল্টাবে।"[২] প্রজারা বিশুর কথায় উত্তেজিত হয়েছিল, দাবীটাকে জোরালো করতে চেয়েছিল, 'কিন্তু রাখে হরি মারে কে' এই দুর্বলতায় দেবুর নেতৃত্ব সংস্কারগ্রস্ত হয়ে গেল —বৃদ্ধি না দিলে সে এই জনতার পাশে আর থাকবে না এই

১। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী: আমার ধ্যানের ভারত, পৃঃ ২৬।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ১০।

সঙ্কল্প তখন তার মনে এবং অবশেষে দেবুর মতটাই প্রজারা মেনে নিল। বিশ্বনাথ যুক্তি দিয়ে কৃষক আন্দোলনকে যেভাবে এগিয়ে দিতে চাইছিল দেবু ঘোষের (তারাশঙ্করের) তা পছন্দ হল না তার ধর্মবোধের জন্য, অথচ বাস্তবক্ষেত্রে এই ধর্মের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের বা খাজনা বৃদ্ধির কোন সম্পর্কই নেই। প্রজাধর্মঘটের ব্যর্থতার কারণ দেবুর দুর্বল নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা। দেবু বাস্তবের মুখোমুখি হতে জানে না, যখনই চরম সংকট ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত উপস্থিত হয় সে বরং অতিরিক্ত উদাসীন হয়ে যায় অকারণে। সে সত্যযুগের স্বপ্ন দেখে, বিধ্বস্ত সমাজ ও তার অর্থনৈতিক সমস্যার আধ্যাত্মিক সমাধান খুঁজে,—ন্যায়রত্নের মত লোক তাই এযুগের এই বাস্তব সমস্যার সম্পর্কে তাকে পথ প্রদর্শন করেন। তাই সে হয় অদৃষ্টবাদী এবং সঙ্কট মুহূর্তে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ না করে বেদনাহত, অবসাদক্লিষ্ট হয়ে তীর্থযাত্রা করে। তার দেশপ্রেম, মাটির মায়া অবশ্য তাকে আবারও এই গ্রামেই ফিরিয়ে এনেছে, সে কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দিয়ে জেলও খেটেছে। কিন্তু দেশের মঙ্গল সাধনক্ষেত্রে তার চিন্তা বরাবরই বাস্তববিমুখ—তাই উপন্যাসের শেষে সে গ্রাম সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে স্বপ্নবিলাসী—ইউটোপীয়ান। গ্রাম থেকে উৎক্ষিপ্ত বাউরী মুচির দল কলকারখানায় খাটতে গেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বন্ধনমুক্ত মানুষেরা কলের শ্রমিক হয়েছে কিন্তু তাতেও তারাশঙ্কর কোন আশার আলো দেখেননি, কৃষকদের মধ্যে যে হতাশা দেখেছিলেন—মজুরের মধ্যে একই হতাশার চিত্রই এঁকেছেন। তাই তারাশঙ্কর তখন এক অলীক সংসারের—ধর্ম ও ন্যায়-সমৃদ্ধ সংসারের স্বপ্ন দেখছেন। "পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্নবস্ত্র, ঔষধপথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না আহার্যের শক্তিতে—ঔষধের আরোগ্যে

নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম ;"[১] দেবু স্বর্ণকে বলছিল "তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানো কথা। নূতন যুগের আমন্ত্রণ—নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভরা ধর্মের সংসার।"[২] কিন্তু এই নূতন পরিকল্পনা কোন পথে, কি উপায়ে সার্থক হবে তার কোন নির্দেশ নেই—দেবু তা জানেও না। পঞ্চগ্রামের যে কৃষকরা খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, কঙ্কনার বাবুদের কাছারি থেকে যারা রহমভাইকে ছিনিয়ে আনল, শ্রীহরি দৌলতের বিরুদ্ধে যারা লড়ল যেজন্য তাদের সেই লড়াই, দেবু ঘোষের ধর্মের সংসারের পরিকল্পনায় তা কতটুকু মর্যাদা পেয়েছে বা অর্থবহ হয়েছে, তা একেবারেই অস্পষ্ট এবং তার কোন উত্তরই নেই। বরং মনে হয় গান্ধীবাদে বিশ্বাসী যে দেবু ঘোষ বার বার কৃষকদের সংকটকালে উদাসীন হয়ে রয়েছে ছুটেছে ন্যায়রত্নের কাছে মীমাংসার জন্য এবং তার এত প্রিয় গ্রামের কৃষকদের সংগ্রামকালে তীর্থযাত্রায় চলেছে, তার কাছে এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাওয়া সম্ভবও নয়। শিবকালীপুর কেন শ্মশানে পরিণত হল, অনিরুদ্ধ পদ্মর সংসারে আগুন জ্বালল কারা, বাউরী মুচিদের কলে খাটতে যাবার প্রয়োজন হল কেন, তার মূল কারণ সে খুঁজতে চায়নি বা জেনেও নির্বিকার এবং কোন উপায়ে এই সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে গ্রাম্য সমাজের সাধারণ মানুষেরা পরিত্রাণ পাবে, তাও দেবু ঘোষের জানা নেই। তার অতিরিক্ত ধর্ম-ন্যায়-সততাবোধ ও সংস্কার তার আদর্শবাদকে বলিষ্ঠ না করে পঙ্গুই করেছে। যতীনের কাছ থেকে সে দেশপ্রেম পেয়েছিল, কিন্তু সে দেশপ্রেম বিশ্বনাথের সংস্কারহীন যুক্তিবাদকে গ্রহণ করতে পারেনি। বরং ন্যায়রত্নের কাছে প্রাপ্ত 'পরম সান্ত্বনাই নানাভাবে তাকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ৩৭৪।
২। " " পৃঃ ৩৭৩।

প্রতিকার খুঁজতে ব্যর্থ করেছে।' তাই—"ধর্মহীন ইহলোকসর্বস্ব সাম্যবাদের প্রতিভূ বিশ্বনাথের" সঙ্গে সাহায্য সমিতির কাজ করতেও সে রাজী নয়। এই সংস্কারগ্রস্ত নীতি বা আদর্শবাদ নিয়ে সে কি করে সংগ্রামী কৃষকদের পথ দেখাবে? সামন্তবাদ ও ধনিকতন্ত্রের পারস্পরিক নির্ভরতা ও শোষণের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রটি তারাশঙ্কর নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন কিন্তু শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রেণীর আবির্ভাবকে তিনি যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে ধরতে পারেননি এবং চাননি। গান্ধীবাদও তা চায় না—"শ্রেণী সংগ্রামের ভাবধারা আমার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। আমরা যদি অহিংসার বাণী অনুধাবন করি তাহলে ভারতবর্ষে শ্রেণীসংগ্রাম যে কেবল অপরিহার্য নয় তাই নয়, একে পরিহারও করা যেতে পারে। শ্রেণী-সংগ্রামকে যাঁরা অপরিহার্য বলেন তাঁরা হয় অহিংসার তাৎপর্য উপলব্ধি করেননি, আর নচেৎ তাঁদের বোধ অত্যন্ত পল্লবগ্রাহী"[১] তেমনি ধর্মঘটও গান্ধীর মতে 'বর্তমানের অস্থিরতার লক্ষণ' সর্বক্ষেত্রে এই ধর্মঘটকে অবলম্বন করা চলে না এবং উচিতও নয়। তাই গান্ধীবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত তারাশঙ্করও যে এই ধর্মঘট বা শ্রেণী-সংগ্রামকে তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দেননি, তা খুব স্বাভাবিক।

তারাশঙ্কর 'গণদেবতা'র দ্বিতীয় খণ্ড 'পঞ্চগ্রাম' লেখেন ১৯৪৩ সালে, তখন দেশব্যাপী অহিংসা আন্দোলনকেই তিনি বিশ্বাস করেন। "সেদিন শুধু অহিংস সংগ্রামে অভ্যুত্থিত ভারতবর্ষকে কল্পনা করতাম। এবং ১৯৪২ সালে এই মহাযুদ্ধেই এই মহাসংগ্রাম আরম্ভ হবে ও সার্থক হবে বলে সিদ্ধান্ত না হোক কামনা করতাম।"[২]

১। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী: আমার ধ্যানের ভারত, পৃঃ ২৬।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৪৮।

গান্ধীবাদ ও সাম্যবাদ ঃ

গণদেবতা প্রকাশের পরপরই তারাশঙ্কর কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের সংগে জড়িত হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, সংঘের উদ্যোক্তারা গণদেবতা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তিনি নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন। বিশ্বনাথ এবং তাঁর মতাদর্শ গণদেবতার জাগরণে ঔপন্যাসিকের সমর্থন লাভ করেনি—উপন্যাসের প্রাণপুরুষ দেবু ঘোষ দেখা যায় প্রতিটি সংকটমুহূর্তে চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করে বৃদ্ধ সমাজপতি ন্যায়রত্নের কাছে নির্দেশ চাইছে, কম্যুনিষ্ট কর্মী বিশ্বনাথের কাছে নয়। গণদেবতা পঞ্চগ্রামের পরিসমাপ্তিতেও রয়েছে তারাশঙ্করের ইউটোপীয়ান চিন্তাধারা। তাই কম্যুনিষ্টদের 'গণদেবতা' বা তারাশঙ্করকে নিয়ে রাজনীতিগতভাবে উচ্ছ্বসিত হবার কোন কারণ ছিল না। গণদেবতা 'ধাত্রীদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' ও 'মন্বন্তরে' অহিংসা ও গান্ধীবাদের প্রতি ক্রমাগত নৈষ্ঠিক আনুগত্য দেখাবার পরও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী স্বয়ং তারাশঙ্করকে লিখেছিলেন—In this critical juncture we keep our faith intact in the destiny of our country and her great future by thinking about persons and friends like you who continue to remain true to the great tradition of the past and struggle to do their best for the future.[1]

তারাশঙ্কর প্রত্যুত্তরে সবিনয়ে তার রাজনৈতিক দর্শনের কথা উল্লেখ করে লেখেন—My creed is Ahimsa and Truth. Not to accuse anybody and to love all, is my motto. I remain, I try always to remain true to my creed and motto of life.[2]

1. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন, পৃঃ ১৪৯-১৫০।
2. " " পৃঃ ১৫০।

আসলে তারাশঙ্করের প্রতি যে কম্যুনিষ্টরা আকর্ষণবোধ করেছিলেন তার সম্ভবত অন্য একটি কারণ ছিল। সুভাষ বসুর প্রতি বিরোধিতা করার ফলে ঐ সময় বাংলাদেশে কম্যুনিষ্টরা মানুষের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাঁরা তাঁদের সমর্থকও খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তাই তারাশঙ্করের উপন্যাসে কম্যুনিষ্ট চরিত্রের অবতারণা তাঁদের কাছে হয়ত অস্বাভাবিক গুরুত্বলাভ করেছিল। এই কম্যুনিষ্ট চরিত্রটি তারাশঙ্করের কতটুকু সহানুভূতি পেয়েছে কিংবা পায়নি তার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেননি তাঁরা। ফলে তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপটি অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সম্বর্ধনা জানাতে ইতস্ততঃ করেননি। 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ, 'গণদেবতা'য় দেবু ঘোষ, 'মন্বন্তরে' দেবপ্রসাদ—সকলেরই আদর্শে তারাশঙ্করের আদর্শেরই প্রভাব—'সৎকে অসৎপথে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বা অসৎপথে, ক্রোধের পথে, হিংসার পথে, কুটিল কৌশলের পথে যদি কোথাও প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে দেখা যাবে সেখানে পূর্ণ সৎ প্রতিষ্ঠিত হয়নি সত্যের উপাসক বলে দাবী জানিয়েও যাঁরা প্রতিষ্ঠার পথে অসৎ বা অসত্য, ক্রোধ বা হিংসাকে আশ্রয় করেছেন, সত্যের বদলে শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, নিজেদের আদর্শের বদলে সেখানে সেই একটি কর্মীগোষ্ঠীরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অসৎপথে সৎকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অসৎ নিজের দাবীতেই সত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে।...... অহিংসা অক্রোধ গান্ধীজীর আবিষ্কার নয়, এ মানুষের আবিষ্কার। তাকে কিভাবে জীবনায়ত্ত করতে হবে, তারই পথ তিনি নিজের জীবনসাধনায় প্রকাশ করেছেন। অহিংসা তত্ত্ব বা ধর্ম হিসাবে পৃথিবীর সর্বমানবীয় ধর্ম বা তত্ত্ব, যে গ্রহণ করবে তার, তেমনি অন্নে, বস্ত্রে, জলে, বায়ুতে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে, সামাজিক অধিকারে, মানবিক অধিকারে মানুষের সমান দাবী জানান বা সেই দাবী প্রতিষ্ঠার

অধিকার কোন দেশের বা কোন দলের বা একটি মাত্র শাস্ত্রের একান্তভাবে নিজস্ব নয়।"[১]

'মন্বন্তর' যখন লেখা হয় তারাশঙ্কর তখন কম্যুনিষ্টদের অনেক কাছাকাছি—মনের দিক থেকে না হোক অবস্থানগত কারণে "পীড়নহীন ভয়হীন দুঃখহীন এক জগতের কল্পনা যে সকল কালে সকল মানুষের"[২] তারাশঙ্কর সেইহেতু এই নীতিতে আকৃষ্ট হওয়া দোষণীয় মনে করেননি। ১৯১৮ সনে সোভিয়েট বিপ্লবের পর থেকেই ভারতের রাজনীতিতে কম্যুনিজম প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর প্রথম গণআন্দোলন হয়ে গেল। তারই মধ্যে স্বপ্ন জাগল গণবিপ্লবের, তারাশঙ্কর তখন রাজনৈতিক কর্মী, রাশিয়ার কথা তেমন কিছু জানেন না, কিন্তু তবু ভালো লাগে। তাঁর ধ্যানের স্বর্গরাজ্য, যে রাজ্যে অনাচার নেই, পীড়ন নেই, ভয় নেই, যে রাজ্য অভয়ের রাজ্য তেমন কিছু কল্পনা করে তৃপ্তি পান। "১৯৩০-৩১ সালে জেলের মধ্যে বন্দীদের আলোচনা আসরে কম্যুনিজম তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুনেও যা শিখলাম, যা জানলাম তাও এক স্বপ্ন রঙীন মোড়কে মোড়া আদর্শবাদ--তার ভেতরের আসল তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছু জানিনি। নিজেই নিজের আদর্শবোধ অনুযায়ী কম্যুনিজমের এক রূপকে তৈরী করে নিয়ে তাকেই তার স্বরূপ ধরে নিয়েছিলাম।"[৩]

নিজের ধ্যানধারণা আদর্শানুযায়ী কম্যুনিজমের সে রূপটি তবে কি? মেহনতী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা তারাশঙ্কর অবশ্যই দেখিয়েছেন। কৃষককুল জমিদার মহাজনদের শোষণে নির্যাতিত

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড) পৃঃ১৫১।
২। " : শিল্পীর স্বাধীনতা (দেশ), পৃঃ ৬০৫।
৩। " " পৃঃ ৬০৫-৬০৬।

হচ্ছে এর বস্তুনিষ্ঠ চিত্রাঙ্কন আছে 'চৈতালীঘূর্ণি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে' কিন্তু কম্যুনিজম শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই শোষণ মুক্তির যে নির্দেশ দেয় তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। ফলে তারাশঙ্করের বিপ্লবসম্বন্ধীয় চিন্তার সাথে সাম্যবাদী বিপ্লবের দুস্তর ব্যবধান। 'আমার বিপ্লবের স্বরূপ কল্পনা আমার নিজস্ব, তার মধ্যে ন্যায় প্রধান, নীতি প্রধান, সত্য প্রধান এবং ঈশ্বরনিষ্ঠা সুদৃঢ় অটল। যে ন্যায়, যে নীতি যে সত্যের জন্য বিপ্লবের কামনা, আবাহন তার উৎস ঈশ্বরবিশ্বাস তারই মধ্যে মৃত্যু অমৃত রাজ্যের সেতু।···ঈশ্বরকে, অমৃতকে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অস্বীকার করে যে তত্ত্ব সে তত্ত্বকে অন্নবস্ত্র সম্পদের প্রলোভনে বা মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে কোন কারণে গ্রহণ করতে পারি না।"[১] পরিবার পরিবেশজাত যে ঈশ্বর বিশ্বাস তারাশঙ্করের চিত্তে দৃঢ়মূল ছিল, তা তাকে অতি সহজে গান্ধীবাদে পৌঁছে দিয়েছে কম্যুনিজমের সামীপ্যসত্ত্বেও. সাম্যে বিশ্বাস সত্ত্বেও সেখানে ভিড়তে তার নীতিতে, বিশ্বাসে আঘাত লেগেছে— 'আস্তিক্যবাদ ও অহিংসার সঙ্গে বিরোধ না থাকলে এই মহান্ আদর্শ সম্পর্কে আমার আজো কোন বিরূপতা নেই।'[২]

অবশ্য 'মন্বন্তরে' পুত্রকন্যার উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে দেবপ্রসাদের কঠোর, নিষ্ঠুর বিরূপতা অত্যন্ত স্পষ্ট, প্রতি ছত্রে ছত্রে সাম্যবাদের তীব্র সমালোচনা দেখা যায়। "আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম জীবনের তরুণ শক্তির আবেগে তোমরা পৃথিবীর সকল জাতির মহত্ত্ব ও সত্যকে গ্রহণ করে আপনাদের জীবনাদর্শের সঙ্গে তা সমন্বয় করতে চাও। আমাদের জীবনে ধর্মের নীতির উপর নূতন আলোকসম্পাত করে তাকে নবরূপে প্রকাশিত করতে চাও···তোমাদের প্রতি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: শিল্পীর স্বাধীনতা (দেশ), পৃঃ ৬০৫-৬০৬।
২। " : আমার সাহিত্য জীবন (২য় পর্ব), পৃঃ ১০৫।

আমাদের কোন মোহ নাই, মমতা নাই। তোমাদের চিন্তার শুচিতা নাই, চিন্তার সততা নাই, নীতিধর্মকে বর্জন করে কুট-কৌশলকে তোমরা জীবনধর্ম করে তুলেছ। ধর্মনীতি, চরিত্রনীতি, হৃদয়নীতি সকল নীতিকেই অস্বীকার করে, কুলধর্ম জাতীয় ঐতিহ্যকে সংস্কৃতিকে বর্জন করে, মানুষের সমাজে চণ্ডালত্বের মাথা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছ তোমরা। উদর তোমাদের সর্বস্ব, দেহই তোমাদের মুখ্য বিশ্বাস এবং ধ্যানানুভূতি বিবর্জিত তোমরা যুক্তিবাদের শাণিত অস্ত্রে আত্মাকে হনন করেছ। যারা দুর্বল, যারা অধঃপতিত, মানুষের এই মহাসাধনক্ষেত্র পৃথিবীর বুকে যাদের নিজেদের পৃথক জাতি হিসেবে বাঁচবার মত সাধনার সামর্থ্য নেই—অধিকার নেই—তারাই এইভাবে মানবজাতি বা মহামানব নামক এক আত্মপ্রতারণাময় কল্পনাকে আশ্রয় করে পৃথিবীর অপর জাতির প্রসাদ ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে চায়—তোমাদের এ নীতিও ঠিক তেমনি, তেমনি হীন, তেমনি ঘৃণার্হ, কোনও পার্থক্য নাই। তোমাদের আমি ত্যাগ করলাম, দুষ্ট অঙ্গের মত ত্যাগ করলাম।"[১] 'পঞ্চগ্রামে'ও একইভাবে ন্যায়রত্ন তাঁর কম্যুনিষ্ট পৌত্রকে ত্যাগ করেছিলেন।

'মন্বন্তরে' দেখি, নীলাকে গুণদাবাবুর স্ত্রী ব্যঙ্গ করেছেন—"যারা পৃথিবীতে সবাইকে সমান করতে চায় তাদের দলের বুঝি?"[২] গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কর্মীর সহধর্মিণী তিনি—অসুস্থ পুত্রের পরমায়ু কামনা না করে তিনি ঈশ্বরের নিকট গান্ধীজীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছেন—প্রার্থনা জানাচ্ছেন গান্ধীজীকে রক্ষা করার জন্য। এমনকি অকসফোর্ডের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে সৈনিক জেমস্ এবং হেরল্ডও মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তারা ভাবে—"আমাদের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ মন্বন্তর, পৃঃ ২৯৪-২৯৫।
২। " " পৃঃ ৩১৭।

বিজ্ঞান বুদ্ধির অতীত এক শক্তিকে যেন তিনি প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছেন।"[১] পৃথিবীর সর্বকালের সর্বোত্তম মানুষের মধ্যে তিনি একজন—এই তাদের অভিমত।

'মন্বন্তর' ১৯৪৩ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও কালোবাজারী। দেশের এই অবস্থার পটভূমিকাতে বাঙালীর এ যুগের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বই লেখার প্রচেষ্টাতেই মন্বন্তরের সূচনা। যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে যে সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা জেগে উঠেছে এবং অন্যদিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায়ভাবে যে আত্মবিক্রয় করছে, সেই মর্মান্তিক পরিবেশের পটভূমিতে পড়ন্ত ধনীর ঘরের বিকৃতরূপ যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে একদিকে, অন্যদিকে বাঁচবার চেষ্টায় একাংশ প্রাণপণ চেষ্টা করছে। দুভিক্ষে দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য কম্যুনিষ্ট কর্মীদের কর্মতৎপরতা দেখে তারাশঙ্কর মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে নায়ক হিসেবে একজন কম্যুনিষ্ট কর্মীকে বেছে নিতে তিনি উৎসাহবোধ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময় তারাশঙ্কর ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘের খুবই নিকটজন। আনন্দবাজারে 'মন্বন্তর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে সেদিন রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। 'মন্বন্তরে'র যারা নিন্দা করেছিলেন সেদিন তাঁরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তারাশঙ্কর কম্যুনিষ্টদের প্রচ্ছন্নভাবে প্রশংসা করেছেন বলে। তারাশঙ্কর-এর কৈফিয়ং দিয়েছেন পরবর্তী কালে, এই কম্যুনিষ্ট কর্মীদের প্রসঙ্গে বলেছেন: "তখন সঠিক বুঝতে পারিনি যে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বা রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যের খাতিরে দেশের সংগ্রামের বিরোধিতা করার অপরাধ এই একমাত্র আবরণ দিয়ে আবৃত করা ছাড়া এঁদের উপায় ছিল না। মন্বন্তরে নায়িকা.

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: মন্বন্তর, পৃঃ ৩২৮

এই দলের হলেও বিরোধী মতাবলম্বী গুণদাদাদা এবং তার পরিবারের যে চিত্র আছে তারা প্রধানতম না হলেও কম উজ্জ্বল কম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ফোটেননি।……এখন মন্বন্তরে আমি কম্যুনিষ্টদের ভাল বলেছি বলে যে অভিযোগ, তার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। আমার নায়ক নায়িকা কম্যুনিষ্ট, বিজয়দাদা কম্যুনিষ্ট নায়ক, তারা পরস্পরকে কমরেড বলেছে একথা সত্য, কিন্তু তারা কি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কম্যুনিষ্টদের সগোত্র, একদলের এক বিশ্বাসে বিশ্বাসী? সেদিন কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মনোভাব হেতু অনেকেই ক্রোধ এবং ক্ষোভবশত ভাল করে বিচারও করেননি। আমার কম্যুনিষ্ট নেতা অহিংসার গুণগানে উদ্বেলিত চিত্ত। কম্যুনিষ্ট যিনি তিনি অহিংসাবাদের গুণগান করবেন?"[১] এখানে কম্যুনিষ্ট বলে উল্লেখিত হলেও চরিত্রগুলি তাদের প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শ থেকে দূরে সরে এসেছে—ভারতীয় কেন, কম্যুনিষ্টদের সাথেই সাদৃশ্য নেই। আর কম্যুনিষ্টদের আদর্শ,—কমবেশি সর্বত্রই অন্তত মূল নীতিগুলি এক। তারাশঙ্করের কল্পিত কম্যুনিষ্টরা হয়তো তাঁর অজ্ঞতাবশতঃ কম্যুনিজমের প্রত্যয়ভূমি থেকে নির্বাসিত কিংবা তিনি নিজেই নিজের আদর্শবাদ অনুযায়ী কম্যুনিজমের এক ভিন্ন রূপ কল্পনা করে একেই কম্যুনিজম বলেছেন—তা না হলে একজন কম্যুনিষ্ট কর্মী, যে কি না দলীয় ক্ষমতায় আস্থাশীল সে গান্ধীজীকে নিয়ে ১৯৪৩ সালে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত না। প্রবীণ কম্যুনিষ্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গান্ধী শতবার্ষিকীতে অকপট স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন: "স্বীকার করতে বাধা নেই যে, একটা সময় ছিল যখন গান্ধীজী আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, সেই আচ্ছন্নভাব এখনো পুরোপুরি কাটেনি বলে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃ: ১৫৫-১৫৬।

নিজেকে কিছু পরিমাণে অন্তেবাসী অনুভব করেছি বলতেও আমার দ্বিধা নেই। অন্তেবাসী কথাটার একটা অর্থ হল ছাত্র। আজও কম্যুনিজমের ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়া খুব একটা বিভ্রম বা অপকর্ম বলে পরিগণিত হবে না ভরসা করি।······একেবারে পুরোপুরি গান্ধীবাদী অবশ্য ঠিক হতে পারিনি কখনো সেটা মানসিক জাড্যের জন্য কিংবা মনের কোণে ভিন্ন মতের অঙ্কুর ছিল বলে কিনা, তাই নিয়ে গবেষণায় শুধু সময় নষ্ট হবে।······গান্ধীপথে চলতে গিয়ে কোথায় যেন ভাবের ঘরে চুরি ঘটে যাচ্ছে, এই আশঙ্কাও তখন থেকে থেকে জেগেছে। সন্ত্রাসবাদের পুনরাবির্ভাবও মনের দরজায় নূতনভাবে দেখা দিচ্ছিল। কাটুনি সংঘ আর গ্রামোদ্যোগ নিয়ে গান্ধীজীর ব্যস্ততা একটু কষ্ট লাগতে আরম্ভ তখন করেছে ক্রমেই মনে প্রশ্ন উঠতে লাগল গান্ধীপন্থায় কোথায় যেন গভীর একটা গলদ আছে,··· ···অকসফোর্ডে সোস্যালিষ্ট কম্যুনিষ্ট ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে, অথচ গান্ধীজী তখনও আমাদের মনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছেন।··আমরা অনেকেই তখন গান্ধীপন্থা থেকে বহুদূরে সরতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু কেমন যেন একটা অদৃশ্য বাঁধন কাটানো সম্ভব হয়নি, ১৯৩২ সালের শরৎকালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ রোধ করার জন্য অনশন করলেন গান্ধীজী, সুদূর ইংলণ্ডেও আমরা দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা, মানসিক-যন্ত্রণা এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন চিত্তপ্রসাদও অনুভব করলাম। এভাবে মানুষকে অজানা মানুষকে টানতে পারে, দেশদেশান্তরে আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারে যে ব্যক্তি তাঁকে সম্মান না জানিয়ে উপায় নেই। গান্ধীজী কিংবা তাঁর সর্বোদয় পন্থী শিষ্যরা সমাজের বিবিধ সমস্যার প্রকৃত উত্তর দিতে যে অসমর্থ, এ বোধ আমার মত বহু ব্যক্তির মনে অনেকদিন থেকেই জেগে উঠেছে।······গান্ধীপন্থার প্রয়োগ যেমন দেশকে দিয়েছে বহু গৌরব-মণ্ডিত মুহূর্ত, তেমনি সে এনেছে ব্যর্থতার বিড়ম্বনা। এর মূলসূত্র সন্ধান প্রচেষ্টা আমার মত ব্যক্তিকে মার্কসবাদের জ্ঞানাঞ্জন

শলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলন প্রয়াসে প্রবুদ্ধ করেছে।”[১] হীরেনবাবু কম্যুনিষ্ট হয়ে নিজের আদর্শকে যথাযথস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখেও গান্ধীজীর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

‘মন্বন্তরে’র বিজয়বাবু কিন্তু কম্যুনিষ্ট হয়ে ঠিক এভাবে গান্ধীর প্রশস্তি রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার যে গান্ধীভক্তি প্রকাশ পেয়েছে বক্তব্যের মধ্যে, তাতে কম্যুনিজমের আদর্শ রক্ষিত হয়নি কোনমতেই। “পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে, বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নাই, অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মির মত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন বর্ণশোভার মহা সমারোহ ঘটে গেল। সত্য হল জয়যুক্ত। আত্মদহনের হোমশিখা তাকে দাহন করে নাই। সে শিখা তার দীপ্তিতে জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে। সেই দীপ্তি-প্রভায় কৌটিল্য-ছলনা তাতে অবশ্য লজ্জিত নয়। ভয় মিথ্যা, মিথ্যার বিলুপ্তিতেই সত্যের প্রকাশ, ভয়কে সে জয় করেছে চিরদিনের মত। তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা,—তুমি চিরায়ু লাভ কর। ভারতের সত্যধর্মের প্রতীক তুমি।”[২] এ যুদ্ধ শেষে হয়ত নববিধান প্রারম্ভে বিশ্বের নানা জন নানা বার্তা আনবে। “ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের চিরন্তন বাণী—হে মহাত্মা যা মূর্ত হয়েছে তোমার মধ্যে, সেই চিরন্তনরূপে নবকালের পটভূমিকায়, যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কল্পসঙ্গীতের সুর মাধুর্যে। অন্তরলোকের বিজ্ঞান, জীবনের প্রতি প্রেম, জীবকে শ্রদ্ধা, সত্যের প্রতি আগ্রহ, মোহমুক্ত কল্যাণদৃষ্টি, মিথ্যার প্রতিরোধে অহিংস অনমনীয় দৃঢ়তা। চিরন্তন ভারতের

১। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: গান্ধীজী (কম্পাস, শারদীয়া সংখ্যা—১৩৭৬), ৯-১৬।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: মন্বন্তর, পৃঃ ৩৫৫।

বাণী বিশ্বশাস্ত্রের সঙ্গে সমন্বিত হবে। অমৃতময় মানবসমাজ রচনা সার্থক হবে।"[১]

চিরন্তন সাধনা, বশিষ্ঠের পুণ্যফল, আত্মা, আত্মদহন, অহিংস দৃঢ়তা, অমৃতময় মানবসমাজ ইত্যাদির সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কোন সম্পর্ক নেই—এর বাস্তবতাও অস্পষ্ট। পৃথিবীর নবযুগে ভারত, বিজয়দার আশা,—সত্য, অহিংসা, প্রেম, ইত্যাদি সবই নিয়ে যাবে, গান্ধীজী সেই চিরন্তন ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, কিন্তু কম্যুনিষ্ট হওয়াসত্বেও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার উল্লেখমাত্র নেই যা কম্যুনিষ্টদের অন্যতম একটি লক্ষ্য। বিজয়দার এই চরিত্রচিত্রণ এবং কানাই-লীলার গান্ধীবাদী তত্ত্বের প্রতি কখনো কখনো যে প্রশ্রয়—তাতে কম্যুনিষ্ট আদর্শের কোন নামগন্ধ নেই। এই ধরনের বিশ্বাস যাদের তিনি বা তারা যত বড় কর্মী জ্ঞানী গুণী হন, কম্যুনিষ্ট পার্টি তাকে বা তাদের অবিলম্বে প্রতিক্রিয়াশীল ও অবিশ্বাসী বলেই ভাববেন। হীরেন মুখোপাধ্যায়ের মত কম্যুনিষ্টরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর প্রতি আকর্ষণবোধ করেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, কিন্তু গান্ধবাদী তত্বকে তাঁরা কোনদিনই স্বীকার করেননি। তারাশঙ্করের ধারণা "রক্তাক্ত বিপ্লব আজ অনতিক্রম্য। এ কল্পনা বা ধারণা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন আর হবে না। মার্কসবাদের সমাজ পরিকল্পনার আদর্শ জগতে গৃহীত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে।"[২] রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়াই অহিংসার পথে নূতন এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এমন ধারণাই তাকে নূতন ভাবধারা গঠিত এক কম্যুনিষ্ট কর্মীর চরিত্র সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করেছে সম্ভবত,—তারাশঙ্করও লিখেছেন 'মন্বন্তর' রচনার নানা কারণ—

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: মন্বন্তর, পৃঃ ৩৫৭।

২। " : আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৬১

"আর একটা দিকও আছে। সেটা হল এই যে, সেদিন আমি ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক শিল্পী সংঘের সমাদরে সমারোহে নিশ্চয়ই অনেকটা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম বইকি, তাঁদের সাহিত্য বিচার বুদ্ধি-পদ্ধতি থেকে বেশ কিছু শিক্ষা এবং জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলাম। তঁদের মধ্যে অনেক বড় পণ্ডিত আছেন, এবং তাঁদের তত্ত্ব ও জীবনবাদের মধ্যে অনেককিছু সত্য আছে।

মার্কসবাদসম্মত সমাজ পরিকল্পনা পৃথিবীর শাস্ত্রে একটি মহত্তম আবিষ্কার। সে সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান তাঁদের কাছে পেয়েছি ·· এই কল্পনা রূপায়ণের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আমার সঙ্গে মতবিরোধ। ····· যাই হোক, সেদিন তাঁদের কাছে পেয়েছি অনেক এবং এই পাওয়ার জন্যই প্রীতিবশতঃ সেদিন আমার কল্পনার সাম্যবাদী কর্মীকে তাঁদের দলের কর্মী হিসাবে কল্পনা করে ছিলাম, আমার কল্পনা ও প্রীতি আরোপ করে আমার নায়ক-নায়িকাকে সাধারণ পাঠকসমাজে প্রীতিভাজন করার চেষ্টার মধ্যে তারাই সে প্রীতির অধিকারী হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে, এই কারণে বুদ্ধিমান সাহিত্যিক পণ্ডিত মন্বন্তরের উপর বিরূপ হয়েছিলেন। মন্বন্তর থেকে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উপকার হয়েছিল কি হয়নি—একথা আমি বলব না, শুধু বলব, গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা এবং ভারতীয় সত্য ও অহিংসার প্রতি বিশ্বাস সত্ত্বেও, 'মন্বন্তরে'র নায়ক-নায়িকা ও কর্মী বিজয়বাবুদের তাঁদের দলের লোক বলে মেনে নিতে এতটুকু প্রকাশ্য মৌখিক আপত্তি করতে দেখিনি বা শুনিনি।"[১]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৬০—১৬২।

সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মানুগত্য :

'ধাত্রীদেবতা'র মা, 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে'র ন্যায়রত্ন, 'মন্বন্তরে'র দেবপ্রসাদ গুণদা এদের কেউই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নয়, কিন্তু এঁদের প্রত্যেককেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের প্রয়োজনে এঁদের চরিত্রের মূল্য যতখানি ছিল, তার অধিক প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যায়। সাম্যের আদর্শ সম্পর্কে এরা নীরব হলেও বা ক্ষোভ প্রকাশ না করলেও সাম্য প্রতিষ্ঠায় রক্তাক্ত বিপ্লব প্রয়োজন একথা এঁরা কেউ মনে করেন না এবং হিংসাকেও এঁরা ঘৃণা করেছেন। কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে বেশিদিন চলা যে তারাশঙ্করের সম্ভব হয়নি তার কারণ অহিংসা ও সত্যের সঙ্গে এদের দলগত প্রভেদ, তারাশঙ্কর একথা খুবই স্পষ্ট করে বলেছেন বার বার—"আমার অহিংসা ও সত্যের উপর বিশ্বাস ধাত্রীদেবতা থেকে মন্বন্তর পর্যন্ত সর্বত্র সুস্পষ্ট। মন্বন্তরের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয় পঞ্চগ্রাম। পঞ্চগ্রামের মধ্যে আমার ধ্যান কল্পনা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট······শেষে নায়ক দেবু, ভারতের চিরন্তন কল্পনার কাল সত্যযুগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে,······পঞ্চগ্রামের ন্যায়রত্ন নায়ক নন, কিন্তু ওই চরিত্রটিই বিরাটতম চরিত্র। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পরমৈশ্বর্য যদি যুক্ত করতে পারতেন এই পণ্ডিতেরা, রাজনৈতিক দার্শনিকেরা, তবে পৃথিবীর জীবনদর্শনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজিত হত।······পাপীকে উচ্ছেদ করে পাপকে উচ্ছেদ করা যায় না, পাপকে বিগলিত করতে হবে। Elemination নয় Sublimation, আড়াই হাজার বছর ধরে এই সাধনা চলেছে ভারতবর্ষে। বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মাজী জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন ভারতের এই সাধনার অব্যাহত প্রবহমানতা। ···এইজন্যই আমার পথ তাদের পথ থেকে ভিন্ন এবং এইজন্যই মনে হয় রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের সাধারণ মানুষের সৌহার্দ্য-

প্রীতি অনেক গাঢ়তর হত, যদি মাঝখানে নিজের দেশের ধর্মদর্শনে অবিশ্বাসী এঁরা তাদের সন্দিগ্ধ না করে তুলতেন।"[১]

রাজনীতি-চিন্তায় তারাশঙ্কর যে কম্যুনিষ্ট ছিলেন না এবং কাল্পনিক স্তরে সাম্যবাদের কতকগুলি মূল মানবিক আবেদনের সঙ্গে সহমর্মিতা উপলব্ধি করা ছাড়া, তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, তাঁর এ সব উক্তি বিচার করলে আর কোন বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে না। তাই কম্যুনিষ্ট নেতা হীরেন মুখোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "এটা জানি, একেবারে অবধারিত জানি, যে নাগিনীরা চারদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস যখন ফেলছিল, তখন মানবিকতার টানে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন অকুণ্ঠে কিন্তু কম্যুনিষ্ট কোনদিনই হননি। আমরাও কোনদিন তা ভাবিনি। সৌহার্দ্যের প্রাবল্যে আমাদের একজনকে তিনি গ্রন্থ উপহার ব্যপদেশে কমরেড বলে সম্বোধন করা সত্ত্বেও ভাবিনি। নানা ব্যাপারে, নানা পরিস্থিতিতে তাঁর এবং কম্যুনিষ্টদের মনোভঙ্গী ও বিচারধারায় প্রবল পার্থক্য থাকতো। শুভবুদ্ধি থাকলে দুঃশীল না হলে আলাদা ধরনের মানুষের পক্ষে এক হয়ে শুভকর্মপথে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, সঙ্গত ও সমুচিত, একথা তারাশঙ্কর জানতেন এবং সেজন্যই কম্যুনিষ্টদেরও কোল দেওয়ার মত চিত্তপ্রসার ও হৃদয় ঔদার্যের তাঁর কখনও অভাব হয়নি।"[২]

তারাশঙ্করের রাজনীতি-চিন্তার স্বরূপ এরপরও অন্যান্য উপন্যাসে একইভাবে প্রতিভাত হয়েছে—তাতে অনেকসময় আদর্শপ্রীতির

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৭৬-১৭৭।

২। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: কীর্তির্যস্য স জীবতি (কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮), পৃঃ ৫৫৫-৫৫৬।

আতিশয্যহেতুই অনেক চরিত্র প্রচারধর্মী বা বাস্তববিমুখ হয়েছে এবং ভাবপ্রবণ লেখক এই প্রবণতাকে বর্জন করতেও সমর্থ হননি। সমারসেট মম হয়ত এইজন্যই বলেছেন : "The novelist is at the mercy of his bias. The subject he chooses, the character he invents and his attitude towards them are conditioned by it. Whatever he writes is the expression of his personality and it is the manifestation of his innate instincts, his feelings and his experience. However hard he tries to be objective he remains the slave of his idiosyncrasis. However hard he tries to be impartial, he cannot help taking sides."[১]

এরই ফলে অনেক চরিত্রই নিরপেক্ষভাবে অঙ্কন করতে সমর্থ হননি তারাশঙ্কর।

'মহানগরী', 'গুরু দক্ষিণা', উপন্যাসে দেশপ্রেম বর্ণনার সূত্রে বিপ্লবীদের প্রসঙ্গ এসেছে, গান্ধীবাদেরও মহিমা ব্যাখ্যাত হয়েছে। মহানগরীতে গোপেন মুখার্জী বিপ্লবী নেতা, সাহিত্যিক বিমল তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আবার শিল্পী পিনাকী গান্ধীজীর দর্শন দিনটিকেই জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন বলেছে,—'সে দিনটির মত দিন বোধ হয় আর আসবে না। আমার বয়স তখন চৌদ্দ পনের বছর। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে ভলান্টিয়ার হয়েছিলাম। গান্ধীজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একদিন বিপ্লববাদীরা দেখা করলে।··· মহাত্মাজী বলেছিলেন অহিংসার কথা। বলতে গিয়ে, বুঝাতে গিয়ে, বললেন—"···আমার অহিংসা দুর্বলের নয়। আমার অহিংসা আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি দেবে। মৃত্যু আমার

১। Ten Novels and their authors : Somerset Maugham, P. 7-8.

সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি স্থির হয়ে তাঁর দিকে তাকাব।”[১] ‘বিচারকে’, ‘উত্তরায়ণে’ গান্ধীবাদের অহিংসা ও সত্য ধর্মেরই জয়-জয়কার, ঈশ্বরবিশ্বাসেরই মহিমা স্বীকৃত। ‘কালান্তরে’র নানা মতবাদের দ্বন্দ্বেও গান্ধীবাদেই উপন্যাসিকের আদর্শ স্থিতিলাভ করেছে শেষ পর্যন্ত। ‘হীরাপান্না’ উপন্যাসের সুবিখ্যাত দেশসেবক ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী অরুণা দেবী গান্ধীজীর শিষ্য—তাঁদের আদর্শ জীবনের মহৎ সুন্দর রূপটিকে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী লেখক সযত্নে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে অহিংসা ও সত্যই তাঁর উপন্যাসে সর্বোচ্চ আসনে আসীন। খাঁটি গান্ধীবাদী বলেই হয়ত পরবর্তীকালে কংগ্রেসীদের নীতিহীনতা, অসৎ প্রবৃত্তি, অনাচার তাকে পীড়িত করতো এবং তাদের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা ছিল। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “একালেও কংগ্রেসী দেখছি। আমি তাদের সকলের আচরণ কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। আমি নিজে কংগ্রেসী সত্য তাই বলে বর্তমানকালে কংগ্রেসের যে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ দেখছি, তার প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা রয়েছে।”[২] যুক্তফ্রন্টের আমলে দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির উন্মাদনায় মানুষের মধ্যে যে অহিংস তাণ্ডব শুরু হয়েছিল, অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, তারাশঙ্করকে এইজন্য অত্যন্ত আশঙ্কাগ্রস্ত ও আতঙ্কিত দেখা গিয়েছিল। ‘সুতপার তপস্যা’ উপন্যাসে ঐ রাজনীতির বাস্তব চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করেছেন তারাশঙ্কর, পরিণামে এই রাজনীতির কুটিল পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষা করেছে সুতপা গৃহত্যাগ করে—এখানে তারাশঙ্কর সকল দলীয় স্বার্থের প্রতি, দলীয় রাজনীতির প্রতি তার বিরূপ মনোভাব

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : মহানগরী, পৃঃ ৬৫-৬৬।

২। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—১৯৭০, মে।

ব্যক্ত করেছেন, হিংসাকে, উন্মাদনাকে এখানেও তারাশঙ্কর কোন দলীয় রাজনীতির পক্ষ থেকেই সমর্থন জানাননি। সম্ভবত এই বিভীষিকার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তখন ঈশ্বর-নির্ভর হয়ে গিয়েছেন লেখক এবং তাই তাঁর নায়িকা গৃহত্যাগ করে এই নিষ্ঠুরতার স্পর্শ থেকে তার বংশধরকে রক্ষা করতে চেয়েছে। উপন্যাসের দিক থেকে তা অবাস্তব হলেও আদর্শের প্রশ্নে এখানেও স্বভূমিচ্যুত হননি তারাশঙ্কর। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস ১৯৭১-এও পূর্বপাকিস্তানের অত্যাচারিতা মেয়েটির প্রতি তাঁর সহৃদয় সহানুভূতির মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতি ঘৃণাই ব্যক্ত করেছেন। যারা হিংসাকে, অত্যাচারকে, অনাচারকে, অন্যায়কে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল, তাদের নীতিহীনতার কাহিনীতে তারাশঙ্কর ঐ পাশবিক হিংস্র স্বভাবকে রূপদান করে গিয়েছেন, মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত। তবে খাঁটি গান্ধীবাদী সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের এই সশস্ত্র প্রতিবাদ বা সংগ্রামকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা স্পষ্ট হয়নি উপন্যাসে।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, তারাশঙ্করের রাজনীতির মূল ভিত্তিতে যে সত্য ও অহিংসা সমাজ-চিন্তাও তদনুরূপ। তিনি তাঁর 'পঞ্চ-গ্রামে'ই সেই কল্পিত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। মোটকথা তাঁর সমাজ-চিন্তা 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে' সুস্পষ্টভাবে সাম্য, ন্যায়, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সত্য, অহিংসাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাঁর কাম্য নয় সত্যি কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজেও তিনি একই অর্থসংকট দেখেছেন,—তাই ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র কোন সমাজব্যবস্থাই তাঁর সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করেনি। যন্ত্র-সভ্যতা যে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করছিল, সেদিকেও তারাশঙ্কর অনেকটা উদাসীন—তাই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেনি মনে হয়, তিনি ঐতিহ্যচালিত কৃষিনির্ভর সমাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিলাপমুখর। এযুগে সমাজের, অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে

গেলে যে বিজ্ঞাননির্ভরতার প্রয়োজন সেটা জেনেও, তিনি ইহলোক সর্বস্ব, বস্তুবাদসর্বস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করেননি। অথচ সামাজিক সাম্য তিনি কামনা করেছেন বারবার। পুরাতন সমাজব্যবস্থায় শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে তিনি গান্ধীজীর মতই আগ্রহী। গান্ধীবাদী সমাজ-চিন্তায়েই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। পুরাতন সামাজিক অনুশাসনের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আস্থা দেখা যায় —"আমি ঘর চাই, বাহিরও চাই। তাই বলে প্রান্তরে ঘর বাঁধা চলে না, চারদিকে দেয়াল দিতে হয়, সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, যাঁরা তা মানেন না, তাঁরা জীবনটাকে তছনছ করে দেন, আত্মরক্ষার উপায়টা পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন না। এরকম একটা প্রবণতা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল তিরিশের যুগে—কল্লোল-কালি-কলমের সময়ে। কেউ কেউ লিখেছিলেন প্রাচীর ও প্রান্তর জাতীয় সব উপন্যাস। আমার এই বোহেমিয়ান চিন্তাধারা ভালো লাগেনি। সমাজের সঙ্গে যার যোগ নেই, তাকে মানিই বা কি করে? একটু আড়াল না থাকলে সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়।"[১] তাঁর মতে সমাজকে পাল্টাবার জন্য "নিয়মকানুন শৃঙ্খলাকে না ভাঙলেও চলে—পাল্টাবার জন্য একটা ঘর ভেঙ্গে আর একটা ঘর তৈরী করতে হয়; বনবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। একটা নিয়ম ভেঙে আর একটা নিয়ম গড়ে তুলতে হয়। অর্থাৎ সমাজ থাকলে নিয়ম থাকবে শৃঙ্খলা থাকবে—উচ্ছৃঙ্খল হওয়া চলে না। আমি সেই উচ্ছৃঙ্খলতারই বিরোধী।"[২] তারাশঙ্করের পরিবার পরিবেশ ও গান্ধীবাদী আদর্শ স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে এইজাতীয় রক্ষণশীল কল্যাণকামী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত করেছিল—তাই দ্বিতীয়

১। গৌরাঙ্গ ভৌমিক: কয়েকপ্রহরের স্মৃতি (কালি ও কলম, ১৩৭৮ অগ্রহায়ণ), পৃঃ ৭২৪।

২। " " "

মহাযুদ্ধের পর সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম দেখেছিলেন তা তাঁকে পীড়ন করেছে প্রতিনিয়ত—'যেসব বিদেশী সৈনিক আমাদের দেশে এসেছিল, তারা যুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের দিনে ঘরের বৌকে টেনে এনেছিল, বহু জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। আজ তারা চলে গেছে কিন্তু মেয়ে শিকারীরা যায়নি, চোরাকারবারীরা যায়নি, সেদিনের সেই অভিশাপ আমাদের বয়ে চলতে হচ্ছে। আমি 'কালরাত্রি' উপন্যাসে সেই যুদ্ধোত্তর জীবনের ছবিটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।"[১] তারাশঙ্করের উপন্যাসে উচ্ছৃঙ্খলতা অশান্তির, অকল্যাণের, বিনষ্টির কারণ হয়েছে। 'কালরাত্রি'র অংশুমানের মতো 'একটি চড়ুই পাখী ও কালোমেঘের' 'আনন্দ' চরিত্রে বর্তমান সমাজের প্রমত্ত মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতারই চিত্র। শ্যামলী এখানে সৎ-সুন্দর-শুদ্ধতার প্রতীক—তার পবিত্রতা শুচিতা দিয়ে সে সকল উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশমিত ও প্রশান্ত করল। রীণা ব্রাউনও তেমনি উন্মত্ততার মধ্যে শান্তি পায়নি—বিবাহের বন্ধন, শৃঙ্খল তার সকল অস্থিরতাকে সংযত করেছে। 'যতিভঙ্গে'র আধুনিকা রৌশনও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অশান্তি সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে শেষ পর্যন্ত। যে নীতিবোধ, শৃঙ্খলা সংযম বোধে তারাশঙ্করের বিশ্বাস ছিল এর অভাব যে মানুষের অশান্তির মূল, এসব চরিত্র চিত্রণের মূলে এই জাতীয় ভাবধারাই রূপায়িত হয়েছে। "আজ যদি সমাজে এবং জীবনে কামার্ততা এবং রাক্ষসী ক্ষুধা এবং চতুর পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি ছাড়া কিছু নেই এমনটাই সত্য হয়ে উঠে থাকে তবে সে সমাজ এবং সে জীবনের ধ্বংস অনিবার্য। তাকে মরতেই হবে।"[২] এ বিশ্বাস থেকেই আধুনিক :

১। গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কয়েক প্রহরের স্মৃতি (কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮), পৃঃ ৭৭৪।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কথা (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪), পৃঃ ১১৯।

জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি তারাশঙ্কর বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে এই কামার্ত, ক্ষুধার্ত, উচ্ছৃঙ্খল মানুষের জন্য সহানুভূতির অশ্রুমোচন করেছেন তারাশঙ্কর— কোথাও বিদ্বেষবিষ নিক্ষিপ্ত হয়নি। এ সংসারে, এ সমাজে যে সৎ অসৎ সুন্দর অসুন্দরের লীলা চলেছে তা বাস্তব ও স্বাভাবিক— এই সত্যকে স্বীকার করেই এ সব মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন মানবিক উদারতা নিয়ে। তাই শিল্পসম্মত উপায়ে জীবনেরই রূপ অঙ্কিত হয়েছে এখানেও।

———

পঞ্চম অধ্যায়

আঞ্চলিকতা—রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি

কোন শিল্পীর ব্যক্তিমানস ও অভিজ্ঞতাই তার সাহিত্যে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক-সৃষ্টিতে শিল্পীর সার্থকতা লাভের অধিক সম্ভাবনা থাকে। কারণ শিল্পীর পক্ষে তখন সৃষ্ট ব্যক্তিজীবনকে তার পটভূমির সমগ্রতায় উপলব্ধি করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। উপন্যাস-সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের সামাজিক পটভূমিকায়,—প্রকৃতি ও পরিবেশে সংস্থাপিত করলে তা নিজ নিজ স্থানে থেকে পূর্ণবিকাশেরও সুযোগ পায়। "টলষ্টয় সার্থক হয়েছিলেন তার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর দেশের কালের সমাজের জনজীবনের সমুদ্রে তিনি সর্বতোভাবে অবগাহন করতে পেরেছিলেন, শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা বৃহত্তর সমাজ অথবা জনসভায় মিলিত হয়ে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তার আকুতিতে প্রেরণায় সমগ্রের হৃদয়বেদনা বেজেছিল। অখণ্ডের মধ্যেই তাঁর খণ্ড জীবন পূর্ণ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। সেইজন্যই উপন্যাসে তিনি যখন তাঁর কালকে দেশকে, দেশের পরিব্যাপ্ত জীবনপ্রবাহকে রূপায়িত করতে গেছেন তখন যেন নিজেকেই রূপ দিয়েছেন।"[১]

তারাশঙ্করের উপন্যাসের আঞ্চলিকতা আলোচনাকালে স্বভাবতই এসব প্রশ্ন ওঠে। কারণ তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু যখনই তাঁর অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেছে, তখনই তাঁর ব্যক্তিসত্তা দেশ, কাল ও সমাজের সামগ্রিক প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। আপন পরিমণ্ডলের পরিচিত মানুষের সুখদুঃখ বিরহ মিলনের মধ্যে

১। অরবিন্দ পোদ্দার: আধুনিক উপন্যাসে মানব প্রত্যয়, পৃঃ ১৯।

শিল্পীমানস অবলীলাক্রমে বিচরণ করেছে, ফলে তাঁর সৃষ্টিতে তখন তাদের হৃদয়বেদনা, সমস্যা-যন্ত্রণা ও হাসি-কান্না সুললিত স্বরে ধ্বনিত হয়েছে, তাঁর দেশ-কাল ও প্রিয় মানুষেরা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে এই অভিজ্ঞতা-জাত উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

টমাস হার্ডির উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে লর্ড ডেভিড সেসিল বলেছেন—"A novel is a work of art in so far as it introduces us into a living world in some respects resembling the world we live in, but with an individuality of its own. Now the world owes its character to the fact that it is begotten by the artist's creative faculty on his experience. His imagination apprehends reality in such a way as to present us with a new vision of it. But in any one artist, only some aspects of his experience fertilize his imagination, strike sufficiently deep down into the fundamentals of his work which deals with these aspects of his experience."[1]

শিল্পীকে যতদূর সম্ভব অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে অবস্থান করাই Robert Liddell-এর মতে সঙ্গত। Lord David Cecil-মনে করেন, "The artist must stick to his range…"[2] Robert Liddell-এ সম্পর্কে বলেছেন —"The range of the novelist, that is, those parts of his experience which he is able to use creatively, is probably a matter over which he possesses little control. It has generally been dictated to him by his nature or his early environment. The importance of early environment in determining a writer's range could be provided over and over

1. Treatise on the Novel—Robert Lidell, P. 38.
2. " " P. 48.

again"[1] ..."The novelist generally wants to write about his own country, mental, social or geographical, and no other is equally interesting to him."[2]

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা :

তারাশঙ্কর তাঁর পরিবেশ, পরিচিত মানুষ ও ভূ-প্রকৃতিকে অভিজ্ঞতালব্ধ অনুপ্রেরণা থেকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যতক্ষণ তিনি তাঁর পরিচিত জগতে বিচরণ করেছেন, ততক্ষণই তাঁর লেখনী স্বতঃস্ফূর্ত, জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত। অপরিচিত জগতে অনুপ্রবেশ মাত্রই তাঁর রচনা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। নিজ অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণ ও কৌতূহল দুইই ছিল প্রবল—এই অঞ্চলের সমাজ মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ছিল সুগভীর অন্তরঙ্গতা, তাই সাহিত্যে তাঁর প্রিয় মানুষ, প্রিয় প্রকৃতি পরিবেশকে যখনই তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাস্তবজীবনে যাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, সাহিত্যে তারা তাঁর অন্তরসিঞ্চিত আবেগটুকু নিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। এরই ফলে অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত নগরজীবনকে তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, যেহেতু নগরজীবনের সঙ্গে তিনি একাত্ম বোধ করতে পারেননি তেমন করে। যে জগৎ, যে জীবন, যে চরিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রভাব-পুষ্ট ছিল না—তাঁর ভাবধারার পরিস্ফুটনও সেখানে স্বাভাবিকভাবে হয়নি—তা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও জড়তাগ্রস্ত হয়েছে। যে পারিবারিক জীবন, গ্রামীণ জীবন, সমাজজীবনের নানা মানুষের মহিমা দুর্বলতায় তিনি কখনও গর্বিত, কখনও ব্যথিত,

1. Treatise on the Novel—Robert Liddell, P. 43.
2. " " P. 43.

কখনও উল্লসিত—সে জগৎ এবং জীবনই তাঁর সাহিত্যে সার্থক হয়ে উঠেছে।

গ্রামীণ জীবনই তাই তাঁর সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু। এই জনজীবন থেকে তিনি তিলে তিলে তাঁর সাহিত্যরস আহরণ করেছিলেন এবং এই অঞ্চলের সঙ্গে সুদীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে সাহিত্য সৃষ্টিকালেও এত প্রাণ সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইজন্য তাঁর সাহিত্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছোট বড় জমিদার, জমিদার বাড়ীর আশ্রিত, জমিদার বাড়ীর বধূ, ধনীকুলীন বংশীয় কন্যা, গৃহজামাতা, জমিদারের লাঠিয়াল, গোমস্তা, গ্রামের চৌকিদার, টহলদার, মন্দিরের পুরোহিত, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, তান্ত্রিকসাধক, ফুল্লরাপীঠের সেবায়েৎ, মূর্তিনির্মাতা কুমোর, ডাইনী, মেলায় আগত দেহোপজীবিনী, মেলার জুয়াড়ী, শ্মশানের ঘাটিদার, শ্মশান পাটনী, নিম্নজাতীয়া মজুরণী, ডোমবংশীয় চোর, চোরের মা, বাউড়ীঘরের চোর মেয়ে, পটুয়া মুসলমান বেদে, ভ্রাম্যমাণ যাদুকর, যাত্রাদলের অধিকারী, পাঠশালার পণ্ডিত, রাজমিস্ত্রি, রেলষ্টেশনের গায়ক, ভিক্ষুক, সাপুড়ে, বেদে ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এরা গ্রাম্য সমাজের মানুষ—তারাশঙ্করের কালের পল্লীসমাজের সংস্কার-বিশ্বাস ধ্যান-ধারণা নিয়েই এরা ঐ সমাজে বাস করত, বিংশ শতাব্দীর নগরজীবনের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

এই সকল বিচিত্র চরিত্র যে দৈনন্দিন জীবনে তাঁকে সান্নিধ্য দিয়েছে এবং তিনি প্রাণভরে তাদের জীবন পর্যবেক্ষণ করেছেন তা তিনি নিজেই নানাভাবে নানাস্থানে বলেছেন। ব্যক্তিজীবনে এদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ ছিল বলেই তাঁর পক্ষে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছিল। আত্মজীবনীতে তিনি এই জনগণের বিচিত্র জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন এবং এই চরিত্রগুলির বাস্তব-অস্তিত্বের সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

"বেদিয়ারা আসত, দেশী বেদিয়া, সাপুড়ে, এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়। মাঠে আলকেউটে ধরত, গ্রামে সাপ দেখিয়ে, গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদর নাচাত আর চলত। ওরা যেত মেদিনীপুর পর্যন্ত···ওদের গানের দু একটা মনে আছে—

"ও কালী লাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে—
বেউলা কাঁদে পতির শোকে পড়ে ধূলাতে"[১]—ইত্যাদি

পটুয়াদের বেদেদের কথা বলতে গিয়ে তিনি দ্বিজপদ ও রাধিকাবেদেনীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার কথাও বলেছেন। "আর একদল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়, পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে।···এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত, বেশভূষায় এমন বিলাসিনী যে, দেখবামাত্র মনে হয় ওরা নৃত্য ব্যবসায়িনী নটী। গায়ে গিল্টির গয়না, পাছাপাড় সৌখীন শাড়ী—দেহের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে পরে, নাকের নথ দুলিয়ে, সুরটেনে, হেলে দুলে সুর করে কথা বলে"[২]···"ইরাণীরা আসত, তাদের অস্তিত্ব শহরের লোকের কাছে সুপরিচিত। ছুরি কাঁচি বিক্রি করে, মাথায় ডবল বেণীর উপর রুমাল বাঁধে, ঘাঘরা পাঞ্জাবী পরে।"[৩]

তারাশঙ্কর বাল্যে তাঁর গ্রামে তেমনি স্বর্ণ ডাইনীকেও দেখেছিলেন, 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটিতে তার প্রভাব পড়েছে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৭৩।
২। " " : পৃঃ ৭৫-৭৬।
৩। " " : পৃঃ ৭৫।

প্রথম সাক্ষাৎকালে ডাইনী সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লেগেছিল, অনেকের কাছে এই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন। একজন বলেছিলেন, এই গল্পটি নিশ্চয়ই বিদেশী গল্পের অনুকরণে লেখা। তারাশঙ্কর শুনে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন—"না, ও আমার দেখা. আর আমি তো ভাল ইংরাজী জানি না, আমার গ্রামে ইংরাজী বই পড়ারও সুযোগ নেই। স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ীর পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেন. আমিও তাদের তাই বলেছি। এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে। পড়তে পড়তে আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি স্বর্ণ ত্বপুরবেলা বসে আছে আর সামনের তালগাছটার মাথায় চিলটা ডাকছে। আমাদের দেশের এঁরা ইউরোপের উইচক্রাফটের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন, গ্রামের ডাইনী দেখেননি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হলেই মনে করেন বিদেশ থেকে না বলে ধার করেছে।"[১] তাঁর 'রসকলি' গল্প সেই অতিচেনা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কাহিনী--"জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস, কিন্তু সেতো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্ম খুঁজে পেয়েছে"[২]— 'রসকলি' ও 'রাইকমলে'র মাধ্যমেই লেখক তাঁর এ অনুভূতিকে রূপদান করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই এই নায়ক-নায়িকাকে সৃষ্টি করেছে—"আমাদেরই মহলে যেখানে বাসা হল, তার সামনে একটি ছায়া নিবিড় আখড়া। বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রসিকজনে রসান দিয়ে বলে, কমলিনীর কুঞ্জ। বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু বৈষ্ণবী, আমি পৌঁছিবার কিছু পরেই ক্ষারে ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটি করে পরে শ্যামবর্ণ মেয়েটি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৯০।

২। ,, ,, : আমার সাহিত্যজীবন, (১ম খণ্ড), পৃঃ ২০।

হাস্যমুখে সামনে এসে দাঁড়াল, হাতে একখানি ঝকঝকে রেকাবিতে দুখিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো দুয়েক দারুচিনি, একটি ছোট এলাচ, নামিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে, বললে প্রভুর জয় হোক, উঠবার সময় মাথার ঘোমটা একটু সরে গেল। রাখালচূড়া বাঁধা কেশ প্রসাধন চোখে পড়ল। আবার ঘোমটাটি তুলে দিয়ে সে আমার বাড়ীর কুশল বার্তা নিলে। সে যেন পরমাত্মীয়, কি একটা কাজে উঠে ঘরের মধ্যে গিয়েছি কানে এল আমাদের গোমস্তা বলছে পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসি মিষ্ট। মনে হল বৈষ্ণবীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে, উঁকি মারলাম—দেখলাম না তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আর একটু হেসে বললে—বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু। এই তো সেই জীবনের জয়।

কথার হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল। তাতে তো ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিলে না, সে ঢেউয়ের উপরে নাচতে লাগল পদ্মফুলের মত।"

এরপরই এল পাগলা বৈরাগী পুলিন দাস। লোকে বলে ক্ষ্যাপা, সঙ্গে তার বলাই মোড়ল। ক্ষ্যাপা ফাঁক পাবামাত্র গিয়ে উঠল কমলিনীর আখড়ায়, পুলিন ওখানেই চব্বিশঘণ্টা থাকে। সেদিন রাত্রে শুনলাম কমলিনী বলছে পুলিনকে—যাও বাড়ি যাও।

—কেন?

—কেন আবার, রাগ করবে যে।

—কে?

—কে আবার? তোমার বষ্টুমী[১]—সুতরাং তারাশঙ্করের কমলিনী, রসিক দাস সৃষ্টি হল—এই বৈষ্ণব জীবনকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ২০-২১।

হল 'রাধা'। এছাড়া তাঁর রচনায় বারবারই ঘুরে ফিরে এল এই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর নানা চরিত্র।

'পাষাণপুরী'র কালী কর্মকারকেও সৃষ্টি করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে—"পাষাণপুরীর অন্যতম নায়ক কালী কর্মকার আমার চোখে দেখা মানুষ। আমি যেদিন সিউড়ি আদালতে সমন অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করতে যাই, সেইদিনই হত্যাপরাধে কালী কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছিল, আঘাতে প্রহারে জর্জরিত ধূলিধূসর দেহ, চোখে অসুস্থ অস্থির দৃষ্টি, পরণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন একখানা কাপড়, কপালে দগদগে একটা ক্ষতচিহ্ন, কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আমেদপুরে বসেছিল। লোকটির দেহবর্ণ গৌর, চুলগুলি পিঙ্গলাভ, চোখের তারা দুটিও পিঙ্গল বিড়ালের চোখের তারার মত। সেইখানেই শুনলাম কালীর কাহিনী। নিজের বন্ধুর মাথা হাতুড়ি মেরে ডিমের খোলার মত ভেঙে দিয়েছে। গোটা গাঁ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কালী অস্থির দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে দেখছিল এবং তারই মধ্যে শুনছিল তার কাহিনী বর্ণনা। মধ্যে মধ্যে সে প্রশ্ন করে উঠছিল।

—বাসিনীকে বেটা বামনা দিনরাত জ্বালাত কেন?

—আমাকে পতিত করতে গেল কেন?

--আমার ঘর আগে পুড়িয়ে দিল কেন? কখনো বা ভুল সংশোধন করে দিচ্ছিল—না, না, গাঁ পুড়িয়ে দিতে চাইনি আমি, ওই বেটা কৃপণ বামুনের ঘরে আগুন দিয়ে ওকেই পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কি করব। আগুন ছড়িয়ে পড়ল কি করব?

কালীর কাহিনী, কালীর মূর্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল"।[১] ফলে 'পাষাণপুরী'র কালী কর্মকার জীবন্ত হয়ে আছে

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ৮৭।

সাহিত্যে। 'কবি' উপন্যাসের নিতাইও তেমনি সাহিত্যে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। 'সতীশ ডোমে'র সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলেই নিতাইকে তিনি এমন জীবন্ত করে রাখতে পেরেছেন সাহিত্যে।—"সতীশ ডোম, সতীশের বংশ পরিচয় যা দিয়েছি তাতে এতটুকু অনুরঞ্জন নেই। তাদের নিয়েও অনেক গল্প লিখেছি আমি। সতীশ কবি যশঃপ্রার্থী ছিল—এই আকাঙ্ক্ষাতেই সে ওই পরিবার ও গোষ্ঠীগত চৌর্যবৃত্তির প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ষ্টেশনে এসে রাজা পয়েণ্টস্‌ম্যানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যেখানে কবি গান হোক, মাথায় চাদর জড়িয়ে জামা একটা গায়ে দিয়ে সতীশ যেতই এবং আসরে কবিয়ালের দোহারদের পাশে বসে সুরে সুর মিলিয়ে দোয়ারকি করত।"[১] তাছাড়া 'কবি'র বিপ্রপদ হল তারাশঙ্করের বাল্যবন্ধু দ্বিজপদ, "দ্বিজপদর বাল্যবয়সের বিবরণ 'আমার কালের কথা'র মধ্যে আছে। তার শেষজীবনের নিখুঁত বিবরণই দিয়েছি কবি বইয়ের মধ্যে। আমার জীবনে আমি প্রথম কবিতা 'আগমনী' লিখে ছাপিয়েছিলাম শারদীয়া পূজা উপলক্ষে, তখন আমার বয়স আট, দ্বিজপদ কয়েকমাসের ছোট আমার থেকে। সেই সময়েই কারুর শিক্ষায় হোক বা নিজের উদ্ভাবনী শক্তি গুণেই হোক 'কবি'কে কপি বলে সম্বোধন করে কয়েকটা কপিপাতা কাঁচাই কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে বলেছিল, খেয়ে নিলাম। পরিণত বয়সের দ্বিজপদ এই রসিকতাটি ভুলতে পারেনি বা নূতন রসিকতা আবিষ্কার করতে পারেনি—এইহেতু সতীশকেও সে বলত, কপিবর।

মধ্যে মধ্যে ঘুঁটে ছেঁদা করে একফালি দড়ি পরিয়ে সতীশকে উপহার দিত—নে, মেডেল।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃঃ ২০।

··এরই মধ্যে রাজা পয়েন্টসম্যান এসে দাঁড়ায়,···রাজার নাম রাজা মিয়া, সে জাতিতে মুসলমান এবং হিন্দীও সে বলে না, যুদ্ধেও যায়নি, মেজাজেও মিলিটারী নয়—ওটুকু আমার চড়ানো পোষাক বা রঙ যাই হোক না কেন। ঠাকুরঝি রাজার শ্যালিকা নয়, সতীশের সঙ্গে তার প্রেমও হয়নি। তবে ঠাকুরঝির অস্তিত্ব আছে। সে গ্রামান্তরের রুইদাস বংশের মেয়ে, ছোটখাটো চির-কিশোরীর মত গঠন, চোখে ভীরু চঞ্চল হরিণীর দৃষ্টি, তাঁতে বোনা খাটো কাপড়খানি আটসাঁট করে বেঁধে মাথায় দুধের ঘটি নিয়ে এ গ্রামের দুধের জোগান দিতে আসত। আসত ওই রেললাইন ধরে। সে দিত বেনেমামার দোকানে দুধের জোগান। সতীশও তার কাছে একপোয়া হিসেবে দুধ নিত।···এমনি সে মেয়েটি। মধ্যে মধ্যে সতীশ তার সঙ্গে রহস্যালাপ করত, সে আমি শুনেছি অন্তরাল থেকে। আমি ষ্টেশনে গিয়েছি দুপুরবেলা, চা খাব বেনেমামার দোকানে, কিন্তু দুধ নেই, ফুরিয়েছে। ঠাকুরঝি দুধ আনবে সেই অপেক্ষা। বেনেমামা ষ্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মের ওপর, সতীশ এগিয়ে গিয়ে শাণ্টিং পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি রোদ ঝক্‌ঝকে লাইনের ওপর, লাইনটা আধমাইলটাক গিয়ে একেবারে পূর্ব থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরে বেঁকে গেছে, যেখানটায় দুটো লাইন মিলে গিয়েছে একটি বিন্দুতে সেইখানে সকলের দৃষ্টি, হঠাৎ সেই বিন্দুর উপর থেকে রৌদ্র প্রতিফলিত দুধের ঘটির ছটা সকলের চোখে পড়ত। ছটাবিন্দুটি চঞ্চল চলমান, তার নীচে দেখা যেত ক্ষারে কাচা কাপড়ে আবৃত ক্ষীণতনুমহিমা। মনে হ'ত, স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল একটি, ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠত। শাণ্টিং পয়েণ্টের ধারেই একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছও আছে, তার গোঁড়াটি বাঁধানো, চারিপাশে তার জয়ন্তী কস্তুরী ফুলের জঙ্গল, আমি সেইখানে বসে কি শুয়ে থাকতাম, সেখানে থেকেই শুনতে পেতাম, সতীশ তার সঙ্গে রসিকতা করছে··এই ঠাকুরঝি। এই চরিত্র কটিকে নিয়ে

'কবি' 'গল্পের সৃষ্টি।"[১] 'কবি'র বসন চরিত্রও এমনি অভিজ্ঞতা-লব্ধ,—'আমাদের গ্রামে কোন মেলা ফেরত একদল ঝুমুর এসে নামল। বড় বটতলায় ঘর পাতলে, তাদেরই একটি মেয়ের হ'ল কলেরা। এই মেয়েটির নামই বসন। এককালে সুশ্রী ছিল, শীর্ণকায়া দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ রঙ, বড় বড় উগ্রদৃষ্টি দুটি চোখ মাথায় অপর্যাপ্ত চুল, দেহটা দেখে মনে হয় কোন সরীসৃপ নিঃশেষে ওর দেহের শুধু রক্তই নয়—সারাংশও টেনে নিয়েছে।"[২] তারাশঙ্কর তখন কলেরা ম্যালেরিয়া রোগীর সেবাব্রত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই রোগিনীও তার চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল। মেয়েটি অশেষ কৃতজ্ঞতায় বলেছিল তাঁকে, "আপনি না থাকলে মরে যেতাম বাবু, এরা হয়ত জ্যান্তই ফেলে পালাত, আমাকে শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে খেয়ে দিত।"[৩] বসন সুস্থ হওয়ামাত্র কিভাবে আবার কামান্ধ মানুষেরা তাকে ভোগ করতে ছুটে এসেছিল, সে দৃশ্যও লেখক দেখেছিলেন—পরবর্তীকালে এদের জীবন সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জেনে তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ বসন 'কবি' উপন্যাসে লেখকের পূর্ণ সহানুভূতি ও মমতা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

পারিবারিক জীবন থেকে মা, পিসিমা এমনি করে তাঁর শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিয়ে দেখা দিয়েছেন ধাত্রী দেবতায় এবং অন্যান্য উপন্যাসে। তারাশঙ্কর অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন—জীবনেও তাঁর মায়ের প্রভাব পড়েছে নানাভাবে—তাই এই মা উপন্যাসে অনেকের 'মা' হয়ে নানারূপে ধরা দিয়েছেন। লেখক তাঁর গ্রামের নানাশ্রেণীর

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (২য় খণ্ড), পৃঃ ২২-২৪।

২। " " (২য় খণ্ড) পৃঃ ২৬-২৭।

৩। " " পৃঃ ২৮।

লোকেদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন—তারা ছিল তাঁর আপনজনের মত —"এই জোরেই এই জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এঁদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি, নিজের কথা বলার মত করেই বলেছি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। বাড়ীতে যখত থাকতাম, এখনও যখন যাই লাভপুরে তখন সকাল বেলা উঠেই বাড়ী থেকে বের হই। আমার কবি উপন্যাসের বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই, তাদের সঙ্গে গল্প করি। যোগেশ বৈরাগী ওখানকার দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। তার সঙ্গে আমার খুব ভাব······পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুলবেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে হেই মাগো, কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে? ছেলেরা ভাল আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে? আমি হেসে বলি—তুই কেমন আছিস? —আমি? ঠোঁটে পিচ কেটে সে বলে—যম ভুলেছে, কানা হয়েছে, নইলে আর আমাকে থাকতে হয়? তোমাদিগে রেখে আমি যেতে পারলেই খালাস। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসাব দেয় কে কে চলে গেছে এর মধ্যে, তাদের জন্য কাঁদে। কান্নার পালা শেষ করে বলে --দেখ কেনে নেকনের ভোগ, পোড়া প্যাটের দায়, ওই গাঁয়ে বিয়ে ছিল, নাচতে যেয়েছিলাম। তা পুরানো কাপড় দিয়েছে দুখানা, আরও সব দিয়েছে। শ্যাষ--তারপরেই মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে শুরু করে। হাসতে হাসতেই বলে—শ্যাষ বলে কি—দাদা! বলে রাঙা শাঁখা পরতে হবে। মরণ। এই বয়সে আর শাঁখা পরতে হয়?"[১] এমনি করে "বসনের সঙ্গে দেখা হত, কুসুমের সঙ্গে দেখা হত, আজও বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে দেখা হয়, তারা পথেই ঘটি নামিয়ে প্রণাম করে প্রশ্ন করে—কবে এলেন? বউদিদি, ছেলেরা

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন, (১ম খণ্ড), পৃঃ ২৮।

ভালো আছে?"[১] তারাশঙ্কর সেইজন্যই এদের চরিত্রাঙ্কনে তাঁর অধিকার আছে বলে দাবী করেন—"এদের সঙ্গে আমার পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে···তাই আমি এদের কথা লিখি, এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।"[২] এই জানার সূত্রেই তিনি 'ডাকহরকরার' দীনুডোমকে গল্পের নায়ক করেন। দীনু সত্যিসত্যিই রাণারের কাজ করেছে সারাজীবন। কিছু জাত বেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার ফলে এইসব বেদে-বেদেনীরা সশরীরে তাঁর রচনায় উপস্থিত হয়েছে। পরবর্তীকালের রচনা 'সপ্তপদী' কিংবা 'মঞ্জুরী অপেরা' প্রভৃতিতেও তাঁর পরিচিত কিছু চরিত্রাঙ্কন দেখা যায়। 'মঞ্জুরী অপেরা'র রীতুবাবুর সঙ্গে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, আসল নামটি প্রকাশে তার আপত্তি ছিল তাই তারাশঙ্কর তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেননি। তারাশঙ্কর তার চমকপ্রদ জীবনকাহিনী শুনেছিলেন এবং তার অনুমতি নিয়ে 'মঞ্জুরী অপেরা'য় রীতুবাবু চরিত্রটি অবতারণা করেন। 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা প্রথম ১৯১৬ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেই সময় অতিদৃপ্ত প্রচুর উল্লাসে ভরা কলেজ মাতানো একটি লম্বা ছেলেকে দেখেছিলাম···হঠাৎ গুজব শুনলাম ওই ছেলেটি ক্রীশ্চান হচ্ছে।···ক্রীশ্চান ধর্ম সে গ্রহণ করবে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করবে বলে। ···এরপর সে কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজের পটভূমি থেকে মুছে গেল। ·····"

"এর চল্লিশ বৎসর পর, ১৯৫৬ সাল, বিশেষ কারণে স্থান এবং পাত্রের নাম গোপন রেখেই বলছি—সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে—ভারতবর্ষের প্রায় এক প্রান্তসীমায় গিয়েছিলাম সভাসমিতির নিমন্ত্রণে"।[৩]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন, (১ম খণ্ড), পৃঃ ২৯।
২। " " "
৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: সপ্তপদী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৵—।০।

সেখানে তাকে এক সহপাঠীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে এই খৃষ্টধর্মান্তরিত ছেলেটির কথা ওঠে। তারাশঙ্কর জানতে পারলেন—সেই মানুষটিই এখানে চার্চের পাদরী হয়েছেন—আদিবাসীদের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করছেন। কারণ যে মেয়েটির জন্য তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন ধর্ম ও ঈশ্বরকে ত্যাগ করার অপরাধে সেই তাকে উপেক্ষা করে চলে যায়। তারাশঙ্কর মুগ্ধ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ঈশ্বর পেয়েছেন? শুনেছিলাম—পেয়েছি বৈকি। নইলে এত আনন্দ পাই কোথা থেকে। ফিরে এলাম। আমার মনের স্মৃতির ঘরে একটি অতি সাধারণ মানুষের অসাধারণ জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম।...... আমার কাছে যিনি অবিস্মরণীয়—তিনি আমার লেখার মধ্যে তো দেখা না দিয়ে পারেন না। সপ্তপদীতে তিনি কৃষ্ণেন্দু হয়ে দেখা দিলেন।"[১] তেমনি রীনা ব্রাউনের চরিত্রাঙ্কনেও আংশিক সত্য আছে—পুরীতে, কোলকাতায় এবং শিলং-য়ে পর পর একটি উচ্ছৃঙ্খল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে দেখে লেখক বেদনা অনুভব করেন। 'সপ্তপদী'তে সেই মেয়েটি রীনা ব্রাউন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।... "আমি তার কয়েকটা প্রমত্ত কথার মধ্যে একটা ব্যথা বেদনার আভাস পেয়েছিলাম। কেবলমাত্র ওইটুকুর জন্যই সে আমার মনে স্মরণীয় হয়ে আছে, তাই ওইভাবেই সমবেদনার তর্পণের জল তাকে অর্পণ করে তাকে এঁকেছি আর বলেছি—আমি লেখক তুমি আমার কাছে এই তর্পণের তর্পণীয়া। তুমি আমার অনাত্মীয় অবান্ধব হয়তো বা অপঘাতেই তোমার নিয়তি, তোমাকে তবু দিতে হবে আমার শ্রদ্ধার নির্মল জল।"[২] গ্রাম্য সমাজে দৈনন্দিন জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটত, ছোটখাট বিষয়কে কেন্দ্র করে তা অনেক সময় জটিল হয়ে উঠত।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: সপ্তপদী, পরিশিষ্ট, পৃঃ।৶০।

২। " " পৃঃ ॥৵০।

গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সমাজসেবক হিসাবে তারাশঙ্কর সে সব ঘটনার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়তেন—তাঁর এই অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের ফলে গ্রাম্য সমাজের নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে—যেমন গণদেবতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। "গণদেবতায় যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা আছে; সেই দাঙ্গা আমাদের দেশে বেঁধে ওঠবার উপক্রম হল। শুরু ওই একটা তালগাছ নিয়েই। মুসলমানটির নামও ওই রহম শেখ।······একটি তালগাছ কাটার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের ও অঞ্চলে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধবার উপক্রম হল তার এক পক্ষে রহম শেখ, অন্যপক্ষে আমাদের গ্রামের প্রধান ধনী যষ্ঠীকিঙ্কর-বাবু। এ ঘটনাটি পঞ্চগ্রামের মধ্যে জুড়ে দিয়েছি—আমিও এর মধ্যে প্রায় স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। জড়িয়ে পড়েছিলাম হিন্দুদের পক্ষেই, পঞ্চগ্রামের দেবু ঘোষের মতোই।"[১]

'ধাত্রী দেবতা'র রামজী সাধুও তারাশঙ্করের বিশেষ প্রিয় মানুষ যিনি তাঁকে বাল্যে গল্প শোনাতেন। 'আমার কালের কথা'য় তারাশঙ্কর তাঁর পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরেছেন—"তিনি আমাদের গ্রামের ফুল্লরা মহাপীঠে তীর্থ ভ্রমণে এসে আমার বাবার আধ্যাত্মিক চর্চার পরিচয়ে আকৃষ্ট হয়ে বাবার পরম বন্ধুতে পরিণত হন, গ্রাম প্রান্তে একটি প্রান্তরে বাবা তখন একটি বাগান তৈরী করাচ্ছিলেন। সেই বাগানটির মধ্যে সন্ন্যাসী বন্ধুর জন্য একটি আশ্রম তৈরী করে দেন এবং সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি মন্দির তৈরী করে সেখানে শারদ শুক্লাচতুর্দশীতে তারাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন, যে বৎসর তারাপূজার প্রবর্তন হয় সেই বৎসরেই ঠিক দশমাসে আমার জন্ম হয়। সেইকারণেই আমার নাম হয় তারাশঙ্কর। এই কারণেই এই

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৫৪।

সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুর ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজের হাতে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরী করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পাণ্ডে। সন্ন্যাসীজীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী সাধু।"[১] তারাশঙ্করের মতে এই রামজী প্রথমশ্রেণীর গল্পকথক ছিলেন। এই সাধু ছাড়াও 'বিচিত্র' বইতে তারাশঙ্কর অন্য এক পশ্চিমদেশীয় সাধুর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ইনি লাভপুরের ফুল্লরাপীঠে বাস করতে এসেছিলেন দূর দেশ থেকে। তাঁকে দেখে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে দীক্ষাদানের অনুরোধ জানালে তিনি প্রথমে অসম্মত হন।—কারণ "সুধা রাখতে হলে স্বর্ণপাত্র চাই বাবা, মৃৎপাত্রে হয় না।"[২] এই ছিল তাঁর অভিমত, এই সন্ন্যাসী লাভপুরে বহুদিন ধরে যাতায়াত করেন। একবার অসুস্থ অবস্থায় তিনি গোপালদাসী নামে একটি ভক্তিমতী মেয়ের সেবা লাভ করেন এবং তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন। গ্রামের কুটিল সঙ্কীর্ণ লোকেরা এই নিয়ে সন্ন্যাসী ও গোপালদাসীকে জড়িয়ে নানা কুৎসা রটাতে থাকে, এমনকি এই ব্যাপারটা আরো গড়িয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীকে অপমান করার ব্যবস্থা করা হয়, তারাশঙ্কর সে সময় এই লোক-গুলিকে শান্ত সংযত করার চেষ্টা করেন, নিজে রাত্রি জেগে গোপাল-দাসী ও তার গুরুকে পাহারা দিয়েছিলেন। এই সন্ন্যাসীই শেষে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন পূর্বোক্ত মন্তব্যের জন্য অপরাধ স্বীকার করে। এই ঘটনাটি 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে—প্রায় অপরিবর্তিত রূপে। 'তামসতপস্যা'তেও এই সাধু চরিত্রের ছায়াপাত হয়েছে নমোনারায়ণায় বাবার চরিত্রে। রামজী সাধু ও

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা, পৃঃ ৯৩-৯৪।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিচিত্র, পৃঃ ৩৮।

ঠেঙো গোঁসাই-এর মধ্যেও এই সব মানুষ জীবন্ত হয়ে আছেন।

শুধু মানুষই নয়, যে অঞ্চলে তাঁর জন্ম—যে জলবায়ুতে তিনি লালিত-পালিত, যে ভূপ্রকৃতিকে তিনি আবাল্য দেখেছেন—সেই অঞ্চলের উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদিও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বীরভূমের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত নানা মেলার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর—"মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমীর পরদিন শীতলা ষষ্ঠীতে আমাদের ওখান থেকে পনের মাইল দূরে দৈধা বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব তিথিতে মেলা। সেই মেলায় চলে গেলাম। দুরন্ত তখন শীত। আশ্রয় নিলাম এক গাছতলায়। সেইখানেই ইট দিয়ে উনুন তৈরী করে একবেলা খিচুড়ি রান্না করে দুবেলা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম তিন দিন।

বিরাট মেলা। দৈনিক লক্ষ লোকের সমাগম। চারিদিকে অন্নসত্র। দশবিশ মাইল দূর-দূরান্তর থেকে ভক্তেরা চালডাল কাঠ বয়ে এনে এখানে খোলে অন্নসত্র। দৈনিক তিন হাজার মণ চাল রান্না হয়, অবিরাম হরিধ্বনি ওঠে। দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার কেনাবেচা।

পল্লীজীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস আসে ভারে ভারে। দুমকা থেকে আসে কাঠের কারবারীরা, বিস্তীর্ণ আমবাগানে কারখানা খুলে বসে, দরজা, জানালা, তক্তপোশ, পিলসুজ, চৌকি, জলচৌকি, গাড়ির চাকা, চাষের সরঞ্জাম সব তৈরী করে বিক্রী করে। ওদিকে বাবলা কাঠ ফেলে রেখেছে স্তূপীকৃত করে; লাঙ্গলের মাথা তৈরী হবে। এরা এসেছে গঙ্গাতীর থেকে। বাবুই সাবুই বিক্রি হচ্ছে, শন পাট বিক্রি হচ্ছে, লোহার সামগ্রী তৈরী করছে কর্মকার, বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে আছে মনোহারী, মিষ্টি। মধ্যে-মধ্যে হঠাৎ দুটো দোকানের ফাঁক থেকে কেউ হেঁকে ওঠে—ও দাদা।

একটি পাথর বসানো গিলটির আংটি নিয়ে যান। শুনছেন? ও দাদা! সন্ধ্যার সময় থেকে মেলার আর এক রূপ।

হরিধ্বনি থেমে যায়। অন্নসত্রগুলি স্তব্ধ। সেখানে জ্বলে শুধু টিমটিমে কেরাসিনের ডিবে। কিন্তু দোকানে দোকানে জ্বলে ওঠে আড়াই শো বাতির ষ্টোভ ল্যাম্প, ব্র্যাসেটিলেন গ্যাস বাতি, সারি সারি সুদৃশ্য চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোশের উপর পড়ে জুয়ার আসর। পাঞ্জাবী, পাঠান, বাঙালী জুয়াড়ীরা আসে দেশদেশান্তর থেকে। তার পাশেই তাঁবুতে তাঁবুতে বাজী, ম্যাজিক, গোলকধাম সার্কাসের খেলা শুরু হয়। বাজনা বাজে। একেবারে একপ্রান্তে বেশ্যাপল্লী, সেখানে জ্বলে ওঠে আলো। রাত্রি বাড়ে তাণ্ডব শুরু হয়।

দেখে শুনে ওই গাছতলায় বসেই আকাঙ্ক্ষা হল এই মেলার রূপটি ধরব। সেখানেই বসলাম লিখতে···”[১] রাঢ় অঞ্চলের মেলায় পরিভ্রমণ করার ফলে নানা শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কেও তিনি নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। “বাংলাদেশের বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের মেলায় ঘুরে ঘুরে নিম্নস্তরের দেহপণ্যাদের নিদারুণ দুর্দশা আমি দেখেছি।···মেলার পর মেলা ঘুরেছি, তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেখেছি।···ঝুমুর দেখে আসছি বাল্যবয়স থেকে।··ঝুমুর না হলে মেলা হয় না। কবিও হয় না সে ওই দোয়ারকির জন্য। ঝুমুরদলের মেয়েরা কবিগানে দোয়ারকি করত এবং নাচত।”[২] তারাশঙ্কর আত্মজীবনীতে তাদের প্রতিবেশী বাকুলগ্রামের নাগপঞ্চমীর মেলার কথাও লিখেছেন। গ্রামবাংলায় নানা উৎসবকে কেন্দ্র করেই মেলা বসত সে আমলে—তারাশঙ্কর সে সব মেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সাহিত্যসৃষ্টিকালে কাজে লাগিয়েছেন। এছাড়া গ্রাম্য সমাজের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ৯৩-৯৪।

২। „ „ (২য় খণ্ড), পৃঃ ২৫-২৬।

দৈনন্দিন জীবনের বিবাদ-বিসংবাদ, হিংসা-দ্বেষ, আনন্দ-আহ্লাদ প্রভৃতি যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত সে সব ঘটনাও বাস্তবজগৎ থেকে সাহিত্যজগতে যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। এইসকল বিষয়ের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অতি উৎসাহে তারাশঙ্করকে প্রশ্ন করেছিলেন,—"তুমি দেখেছ অনেক, এত দেখলে কি করে?

—কিছুদিন সমাজ সেবার কাজ করেছি, আর কিছুদিন বিষয়কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারী আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি, কারবারও করেছি।

—সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিকঠিক লিখেছ। আর বড় কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।"[১] স্বয়ং কবিগুরুর কাছে তারাশঙ্কর এই প্রশংসা পেয়েছেন এবং সে প্রশংসা প্রধানত তাঁর এই গ্রাম্যজীবন, গ্রাম্যমানুষ, গ্রাম্যসমাজ ও গ্রাম্য ভূপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রক্ষার জন্য, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং এইজন্য তাঁর দুঃখও ছিল।

তারাশঙ্কর এই অভিজ্ঞতা-নিষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টিতে পরবর্তীকালে সার্থকতা লাভ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য-রচনা তাঁকে অন্য দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জনেও সহায়তা করেছে। প্রথমত, তাঁর রচনায় আঞ্চলিকতার ছায়াপাত হয়েছে, দ্বিতীয়ত তাঁর সৃষ্টি রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ করে বীরভূমের লোকসংস্কৃতি ও ভৌগোলিক ইতিহাসকে সাহিত্যরসস্নিগ্ধ করে চিরস্থায়িত্ব দান করেছে।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্যজীবন (১ম খণ্ড), পৃঃ ১২১।

আঞ্চলিক উপন্যাস :

তারাশঙ্করের সাহিত্য অভিজ্ঞতা-লব্ধ হওয়াতেই তাতে বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চল বিশেষ করে বীরভূম অঞ্চলের সর্বপ্রকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তারাশঙ্করের বাসভূমি যেহেতু বীরভূম অঞ্চলে সুতরাং তাঁর সাহিত্য উপাদান বিশেষ করে এই অঞ্চল থেকেই অধিক সংগৃহীত। তাছাড়া তারাশঙ্কর এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন এবং পারিবারিক সূত্রে, রাজনীতি সূত্রে, সমাজসেবা সূত্রে তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রক্ষা করতে সমর্থও হয়েছিলেন, তদুপরি তারাশঙ্করের সম্ভবত এই দেখার, জানার ও অনুভব করার একটি সহজাত ক্ষমতাও ছিল, যে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য প্রতিভাও বিকাশ লাভ করেছে। সাধারণ মানুষ প্রতিদিন কত ঘটনা দেখে, কত মানুষকে জানে কিন্তু তাতে তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে বা ভাবজগতে কোন আলোড়নই সৃষ্টি হয় না। শিল্পীর মানসজগতে কিন্তু এই সকল দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাই এক রসাপ্লুত আবেদন নিয়ে আসে, এবং তখনই তা শিল্পসম্মত ব্যঞ্জনা লাভ করে। তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতাও তাঁর মনোভূমিতে সেই আন্দোলন সৃষ্টি করে সাহিত্য-কীর্তিকে রসোত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিল বলা চলে।

বীরভূম বা লাভপুরের প্রতি তারাশঙ্করের একটি সহজাত অনুরাগ ছিল। এই বিচিত্র অঞ্চলের বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনই তাঁকে অধিক আকর্ষণ করেছে। তাঁর স্নেহের ভালবাসার মানুষগুলি তাদের খাঁটি দেশজ স্বভাবটি নিয়ে সাহিত্যে নূতন রসসৃষ্টি করতে তাঁকে সাহায্য করেছে। একটি বিশেষ অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের বাংলা সাহিত্যে এমনি করে কমই পাওয়া যায়,—অঞ্চল-বিশেষের চিত্র তাঁর রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে বলেই তাঁর রচনাকে আঞ্চলিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

"তারাশঙ্করের রচনা আঞ্চলিক। অবশ্য যে কোন শিল্পীর উপরেই তাঁর নিজস্ব অঞ্চলের কমবেশি প্রভাব থাকে।·· নিজের পরিচিত আঞ্চলিক সীমানাকে পারতপক্ষে তিনি অতিক্রম করতে চাননি। যেখানে করেছেন সেখানেই তাঁর কল্পনা আড়ষ্ট ও সংকুচিত হয়ে গেছে তাঁর লেখার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়, তাঁর প্রমাণ 'ঝড় ও ঝরাপাতা' কিংবা 'মন্বন্তর'। উচ্চস্তরের সাহিত্যকীর্তি হিসাবে বই দুটির মূল্য খুব বেশি নয়, গ্রামীণ তারাশঙ্কর তাঁর সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর নাগরিক উপন্যাসে। কলকাতার পরিবেশে আরব্ধ এই রচনাটি পূর্বাশাপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে হতে অর্ধপথেই থেমে গেছে।·· সাহিত্যে আঞ্চলিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করে—তাকে অলংকরণের অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না, কখনো কখনো কোন বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে, এইগুলির ভিত্তিতেও কোন লেখককে আঞ্চলিক বলা যায় না, ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনই কোন শিল্পীর উপর আরোপ করা সম্ভব, যখন বিশেষভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে—তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তি ক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। এরস্কিন কলডওয়েলের God's little Acre, Tragic Ground, Tobbaco Road—মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অনগ্রসর দুর্গত ও অভিশপ্ত অঞ্চলের কায়িক ও আত্মিক ইতিহাস। ষ্টেইনবেকের The Long Valley—তাঁর প্রধান সাহিত্য ভূমি। জেমস জয়েসের Ulysses একান্তভাবেই Dubliner-আর টমাস হার্ডির ওয়েসেকস্ নভেলস্ তো স্বনামধন্য।

আসলকথা হল, এঁদের সাহিত্যসৃষ্টি এই সমস্ত পরিবেশ থেকেই

সঞ্জাত এবং এই পটভূমিকে ভুলে গেলে এদের শিল্পীসত্তা বা শিল্পীরূপ কোনোটিকেই যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। স্রষ্টার ব্যক্তি-চরিত্র যেহেতু এই বিশিষ্ট পরিবেশে গড়ে ওঠে, সেই কারণেই তাঁর বিশ্বাস সংস্কার, শুভাশুভবোধ এবং জীবন সম্বন্ধে ধারণা প্রতিবেশী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে তাঁর প্রতীতি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারাশঙ্করকে জানবার জন্যেও তাই তার ভৌগোলিক এবং মানবিক জগৎটি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার।

হার্ডির পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের মতো, সেই রহস্যময় মহিমময় Egdon Heath-এর মতো এই জগৎটি রাঢ় অঞ্চল—প্রধানত বীরভূম জেলা।

এর এক প্রান্তে, শালপলাশের বন আর এক প্রান্ত গিয়ে সীমা টেনেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাটে, মাঝখানে কোথাও কোথাও ফসলে ভরা ক্ষেত—কোথাও বা মহাকাশের কঙ্করবিকীর্ণ বিশাল ব্রহ্মডাঙা—যার নাম হয়তো ছাতিমফাটার মাঠ।

এই মাটি হার্ডির মৃত্তিকার মতোই জীবন্ত—

'Like men, slighted and enduring and withal singularly colossal and mysterious in its swarthy monotony. It had a lonely face, suggesting tragical possibilities.'

তারাশঙ্করের ভূগোল ক্ষেত্রও অনুরূপ tragical possibilities সংকেতিত করে।"[১] এসব আলোচনা থেকে বলা চলে, তাবাশঙ্করের উপন্যাসের আঞ্চলিকতা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত. এবং গুণিজন এই আঞ্চলিকতাকে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বলেই মন্তব্য করেছেন। এবারে এই আঞ্চলিকতা শব্দটির কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আঞ্চলিকতা বা Regionalism-এর সূত্র হিসাবে সুধী সমালোচকেরা বলেছেন—

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: বাংলা গল্পবিচিত্রা, পৃঃ ১১১-১১৪

"The representation in a body of literature, created either by a single writer or by a group of a particular locale. In regional literature, this locale is conceived of as a subject of interest in itself and much attention is devoted to its description. It may, in fact, become so important as to play a role in the story and influcnce the lives of the character. Regional literature is likely to concern itself with life in rural areas or small towns rather than urban centres. The Five Town novels of Arnold Bennett are examples of regional literature as are those novels of Thomas Hardy, such as Return of the Native and Mayor of Casterbridge, which are set in the country side he called Wessex"[১].

সাহিত্যে আঞ্চলিকতা যখন এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, তখনই সে সাহিত্যকে 'আঞ্চলিক' বলা চলে। আঞ্চলিক উপন্যাসেও এই বিশিষ্টতা উপস্থাপিত হয়। অঞ্চলিক উপন্যাসে, অতএব, প্রথমতঃ, ভৌগোলিক সীমা সংহতির বিশেষ প্রয়োজন। কোন অঞ্চলবিশেষ হবে এ জাতীয় উপন্যাসের পটভূমিকা—সমগ্র দেশ নয়। দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চরিত্রে এই ভৌগোলিক সীমিত পটভূমি সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে এবং এই প্রভাবের ফলে চরিত্রগুলিও এই প্রকৃতি পরিবেশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তৃতীয়তঃ, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে, অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রক্ষিত হবে—এই মাটির সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র স্থাপিত হবে। প্রকৃতি হবে পাত্রপাত্রীর জীবনের অনুভূতির, চিন্তাধারার নিয়ন্তাশক্তি। এইজন্য প্রকৃতি ও পরিবেশ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আঞ্চলিক উপন্যাসে আবির্ভূত হবে এবং চরিত্রগুলিকে পূর্ণতা দান করবে।

১. Karl Backson & Arther Ganz—A Reader's Guide to Literary Terms, P. 172.

আঞ্চলিক উপন্যাসের এই বিশিষ্টতাগুলি মানতে গেলে তাতে বাস্তবতাবোধ আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারণ সমগ্র দেশ ছেড়ে যখন বিশেষ অঞ্চলকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করা হয়—তখন সে অঞ্চলকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ ও অনুধাবন করার সুযোগ আসে। প্রতিটি ব্যক্তি, আচার আচরণ, নিয়ম নিষ্ঠা, তাদের জীবনের, তাদের সমাজের খুঁটিনাটি তথ্য তখন দৃষ্টিগোচর হয়,—এমনকি এই অঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশ, বৃক্ষলতা, মাঠঘাট, সবকিছুকে একেবারে জীবন্ত অবস্থায় তুলে ধরার অবকাশ থাকে। তাই এই বিশেষ অঞ্চলের মানুষ, সমাজ, পরিবেশ ও প্রকৃতির পূর্ণ বিশ্লেষণ আঞ্চলিক উপন্যাসে সম্ভব হয়ে ওঠে—বাস্তবকে পুরোপুরিভাবে উপন্যাসে তার বিশিষ্টতা নিয়ে চিত্রিত করা সহজ হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আঞ্চলিক উপন্যাসের বাস্তব ভিত্তি আরও অধিক বলা চলে।

এইজন্যই আঞ্চলিক উপন্যাস সৃষ্টিকালে ঔপন্যাসিককে অধিকতর নিষ্ঠাসহকারে বাস্তবসত্যকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে তাঁর নিগূঢ় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তা না হলে স্থানিক পরিবেশসৃষ্টির কারুকুশলতা গভীরভাবে ফুটে ওঠে না ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে অঞ্চলটির পরিপূর্ণ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। ঔপন্যাসিককে এমন কি, এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ উপভাষা, আচার, আচরণ সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হয়। এই সামগ্রিক পরিচিতির ফলে বাস্তবসত্যকে তিনি শিল্পসম্মত উপায়ে সাহিত্যে অঙ্কন করতে পারেন এবং তা অনুভূতির গভীরতম প্রদেশে অনুরণন সৃষ্টি করে যথার্থ সাহিত্যিক ব্যঞ্জনায় পরিপুষ্ট হয়, রসোত্তীর্ণ হয়।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য কতটুকু পবিস্ফুট হয়েছে, এর বিচার করলেই তাঁর উপন্যাসের আঞ্চলিকতা প্রমাণিত হবে।

রাঢ় অঞ্চলের মানুষ, প্রকৃতি সম্পর্কে তারাশঙ্করের বিপুল অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। এই ভূপ্রকৃতি, পরিবেশকে তারাশঙ্কর পরম মমতাভরে নিরীক্ষা করেছেন—এঅঞ্চলের উপভাষার কথা বলেছেন। এই অঞ্চলের যে মানুষেরা তাঁর অন্তর্লোকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল —তাঁর দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুভূতিকে আন্দোলিত করেছিল— তাদের কথাই তিনি সাগ্রহে লিখেছেন উপন্যাসে। তাই মাটি আর মানুষ—প্রকৃতি পরিবেশ আর চরিত্র একাকার হয়ে গিয়েছে রচনায় —তাদের মধ্যে নিগূঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এই মানুষের কথা মনে পড়লেই এই মাটিকে বিস্মৃত হওয়া চলে না কোনমতেই। তারাশঙ্করের সুগভীর সহানুভূতি এই অঞ্চলবিশেষের জন্য, এই বিশেষ মানুষগুলির জন্য। তাই এই বিশেষ অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের নির্বিশেষ করে তুলেছেন—অনুভূতির গভীরে পৌছে এক অখণ্ড জীবন ও জগতের সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই আঞ্চলিক চরিত্রগুলিও এমন সুন্দর, সজীব ও মহিমময় হয়ে উঠেছে লেখকের সৃষ্টি নৈপুণ্যে। কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তার অধিকাংশ উপন্যাসে থাকলেও তাঁর শ্রেষ্ঠতম আঞ্চলিক ফসল 'কবি', 'রাইকমল', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'—এই কটি উপন্যাসে তারাশঙ্কর উন্মুখ-আকুল হয়ে জীবনে রসের সন্ধান করেছেন এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে। তাতে তাঁর শিল্পীসত্তা ভাবের গভীরতম স্তরে প্রবেশ করে জীবনের স্পন্দন অনুভব করেছে। রাঢ়ের বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতিতে, বিশিষ্ট জীবনধারায় তিনি ঐ চরিত্রগুলি স্থাপন করে তাদের পরিপূর্ণ পরিচয় প্রদানে সার্থক হয়েছেন। 'কবি'র নিতাই, ঠাকুরঝি, বসন; 'রাইকমলে'র কমলিনী, রসিকদাস; 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে'র বিচিত্র জনতা ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সুচাঁদ, নসুবালা, বনওয়ারী তাঁর সৃষ্টিতে অমর হয়ে থাকবে। তবুও আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'হাঁসুলী বাঁকের

উপকথা' অতুলনীয় এবং বিশেষভাবে এই উপন্যাস রচনার জন্যই তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা চলে। এই উপন্যাসে প্রকৃতি কেবল পটভূমিকা হয়ে থাকেনি—পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের রূপ নিয়ে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীকে পরিচালিত করেছে এবং তাদের ভাগ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। সবকিছু মিলিয়ে এক অভিনব জীবনরস অঞ্চলবিশেষকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন বিস্তৃতি লাভ করেছে।

"এ যাবৎ আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কারণ তাঁর উপন্যাসে মানবচরিত্র ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটেছে। ভৌগোলিক সত্তা এখানে পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।' এই উপন্যাসের প্রকৃতি কাহিনীর দিগন্তকে ঘিরে আছে, সেই সঙ্গে তা কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। এখানে পটভূমির অতিব্যাপ্তি নেই, নূতনত্বের উত্তেজনা সঞ্চারের চাতুরি নেই, স্বল্প অভিজ্ঞতার চমক নেই। কোপাইদহের বেড় দিয়ে ঘেরা কাহারদের গ্রামের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। প্রকৃতির পরিবেশে বদ্ধমূল অপ্রাকৃত সংস্কার, যুগ যুগ প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোক-কল্পনা উপন্যাসটিকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। শিমূল বেলবন, শ্যাওড়াবন, চন্দ্রবোড়া সাপ,—সবকিছুতে দেবত্বের আরোপ হয়েছে। অন্ত্যজ নরগোষ্ঠীর লৌকিক ও অপ্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বীরভূমের উদাসীন প্রকৃতিই এখানে প্রতীক রূপ পেয়েছে কর্তাবাবা ও কালারুদ্দ্রের চরিত্রে। একে কাহারদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কাহারদের সমাজ-ব্যবস্থাও এই প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গোত্রপতির নেতৃত্বের দায়িত্ব, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা ও প্রবল হৃদয়াবেগের অনিবার্যলীলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্তঃ সঙ্গতি নিবিড় আঞ্চলিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্র রচনা করেছে। এই সমাজে যূথপতি বনোয়ারী-লালের কথাই শেষ কথা। এখানে পাখী ও করালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

নিয়ন্ত্রিত। বাবা কালারুদ্দুর এই গোষ্ঠীর নিয়ন্তা—তিনিই এই সমাজকে চালনা করেন। তাঁর ক্রোধে বিনষ্টি, কৃপায় জীবন রক্ষা। কোপাইদহের দহ, বাঁধ, বেলগাছ, বাঁশঝাড়, শিমূল ও শ্যাওড়াবন, অতীতের বন্যা, বর্তমানের যুদ্ধ - সবকিছুই কাহারগোষ্ঠীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তারাশঙ্কর এই সবের মধ্য দিয়ে আদিম জীবনের বোধ উপস্থিত করেছেন, অপরকে নূতনকালের অনিবার্য পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে বাস্তববোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সবটা মিলিয়ে এক অখণ্ড বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যা আঞ্চলিক উপন্যাসের যথার্থ পটভূমি।"[১] শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'কে বিবেচনা করার পক্ষে এই সমালোচনা গ্রহণীয় এবং এই বিশিষ্ট গুণগুলির দাবীতেই এ উপন্যাস কেবলমাত্র তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস নয়—বাংলা সাহিত্য জগতেও শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত হতে কোন বাধা নেই।

আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্য একটি সর্ত হলো, তা নগর-কেন্দ্রিক হবে না এবং গ্রাম অথবা ছোট শহর বা নূতন গড়ে উঠছে এমন শহরের পটভূমিকায় গল্পটি বর্ণিত হবে। তারাশঙ্করের উপন্যাস সে শর্তটিকেও যথাযথ পূরণ করেছে। 'কবি', 'রাইকমল', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' বা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় পটভূমিকাটি অবশ্য গ্রাম। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় চন্দনপুর নামক যে অঞ্চলটির প্রসঙ্গ আছে সে অঞ্চল নতুন গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চলই। চন্দনপুর নগর নয়, নতুন করে এখানে কারখানা ইত্যাদিকে ঘিরে ছোট শহর জন্ম নিচ্ছে। করালী এ কারখানায়ই কাজ করতো—হাঁসুলী বাঁকের কাহাররা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করতে ওখানেই ছুটেছিল, 'শুকশারীর কথা'র পটভূমিকায়ও আছে

১। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : সাহিত্যসন্ধান, পৃঃ ১২৩-১২৪

এই চন্দনপুর, ছোট্ট চন্দনপুরে ক্রমশ কালের পরিবর্তনের হাওয়া এল —গ্রাম ক্রমশ শহরে পরিণত হতে চলল। তারই সঙ্গে চন্দনপুরের মানুষের মধ্যেও দেখা দিল বিরাট পরিবর্তন—একালের আধুনিক চিন্তাধারার স্পর্শ। তেমনি 'ভুবনপুরের হাট'কেও একালের পরিবর্তনশীলতা স্পর্শ করেছে। এই গ্রাম্য হাট তাই ক্রমশ জমজমাট হয়ে উঠছে. এমনি পরিবেশ অন্য আরোকিছু উপন্যাসেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাই অজ পাড়াগাঁ, ছোট শহর, নতুন গড়েওঠা শিল্পাঞ্চল তাঁর আঞ্চলিক উপন্যাসের যথার্থ পটভূমিকা সৃষ্টিতে প্রাধান্য লাভ করেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা লেখকের সার্থকতালাভে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কারণ লেখক কোন অঞ্চলবিশেষের মানুষকে সেই অঞ্চলের বিশেষ সংস্কার বিশ্বাস বা ভাবধারা নিয়ে অঙ্কন করলেও, তাতে বিশ্বজনীন মানবহৃদয়ের প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট করারই প্রচেষ্টা থাকে। এসকল মানুষের ভাষা বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সাদৃশ্য না থাকলেও, কিংবা এদের ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে সমগ্র দেশের আপামর জনসাধারণের ধর্ম-সংস্কৃতির সংযোগ না থাকলেও মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না—সাহিত্য হিসাবে তা রসোত্তীর্ণ হলেই যথার্থ মর্যাদালাভ করে। কারণ বহির্জগতে যে কোন পরিবেশকেই উপস্থাপিত করা হোক না কেন অন্তর্জীবনে নানা সুখদুঃখ হাসিকান্নার ঢেউ তো অন্তর সম্পদ হয়ে আছেই এবং তা সকল কালের সকল অঞ্চলের, সকল মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। সুতরাং সেই অন্তরজগতের ভাবরাশিকে মানবিক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তাকে যদি আলোড়িত ও আন্দোলিত করা যায় তবেই তাতে রসসৃষ্টি হবে—বিশেষ এক জগৎ বা জীবন বা মানুষ নির্বিশেষ হয়ে বিশ্বজগতে স্থাপিত হবে এবং বিশ্বজনীনতা লাভ করবে। সুতরাং আঞ্চলিকতা সাহিত্যে থাকলেও তার সর্বজনীন আবেদন ক্ষুণ্ণ হবে না। তারাশঙ্করের

সাহিত্যে আঞ্চলিক জীবন রূপায়িত হলেও তাতে চিরন্তন মানব জীবনই প্রতিফলিত হয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত বিশ্বাস সংস্কারের মধ্য দিয়েও সামগ্রিক জীবনের রূপটি প্রকাশমান। তাতে সর্বজনীন মানবহৃদয়ের কামনা বাসনা বেদনা প্রার্থনার সুরটি স্বতোৎসারিত হয়ে বিশ্বজনীন মানবিক বৃত্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করে গেছে।

প্রমথনাথ বিশী বলেন—"শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মূলতঃ আঞ্চলিক ফসল। বিশেষ অঞ্চলকেই অবলম্বন করে তার কলমের গুণে আর সেই কারণেই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। অঞ্চল বিশেষে সাহিত্যের যে ফসল জন্মে আর অঞ্চল বিশেষের মধ্যেই যার গুণাগুণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তার হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা চলে না। যদিচ এই জাতীয় রচনাই সাহিত্যে বারো আনা। কিন্তু যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলি তাকে একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও সর্বজনীন হতে হবে।"[১] তারাশঙ্করের অঞ্চলপ্রধান সাহিত্য সৃষ্টিতে সে সর্বজনীন রসাবেদন বর্তমান রয়েছে। তাই তাঁর আঞ্চলিকতা তাঁর রচনার বিশ্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ করেনি।

উচ্চাঙ্গের আঞ্চলিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যও এই অভিমতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন: "এক হিসাবে বহির্মুখী জীবনমাত্রই আঞ্চলিক, তবে কোন কোন ঔপন্যাসিক তাঁর দৃষ্টির গভীরতা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুণে জীবনের আঞ্চলিক রূপকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, অনেকে তা পারেন না, তাঁদের দৃষ্টি জীবনের চরম সত্যের দিকে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু আঞ্চলিক জীবনের নিবিড়তার অনুভূতির মধ্যে জীবনের যে রস প্রকাশ পায়, তাকে যিনি উপেক্ষা করেন, তাঁর মধ্যে কদাচ প্রকাশ পেতে পারে না। তারাশঙ্কর জীবনের রসিক ছিলেন, তাঁর সৃষ্টিতে

১। প্রমথনাথ বিশী: তারাশঙ্কর রচনাবলীর (১ম খণ্ড) ভূমিকা, পৃঃ ৺৵০।

তাই আঞ্চলিক জীবন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও চিরন্তন জীবন উপেক্ষিত হয়নি।"[১]

এই আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা তারাশঙ্করের সাহিত্যে অন্য একটি বিশিষ্টতাও এনেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাস যদি তাঁর শিল্পগুণের বা সাহিত্যিক রসোত্তীর্ণতার জন্য সমাদৃত নাও হত, তবু রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস হিসাবে এর অন্য মর্যাদাটি অক্ষুণ্ণ থাকত হয়ত। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ঐ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির বর্ণনা, অধিবাসীদের আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা, ধর্মীয় সংস্কার ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবরণ দিয়েছেন তারাশঙ্কর, সুতরাং তাঁর সাহিত্য, সাহিত্য হিসাবে তো বটেই, উপরন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থানলাভ করার যোগ্য। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সব জাতি উপজাতির প্রাচীন জীবনধারা জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই পরিবর্তিত হতে চলেছে, তারই প্রামাণ্য তথ্য ভবিষ্যতে কোনদিন তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে সংগৃহীত হতে পারবে।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপাদান:

প্রাচীন রাঢ়দেশের যথার্থ ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে মতভেদ থাকলেও বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীকে মোটামুটিভাবে রাঢ়দেশ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। "রাঢ়দেশ যে বাংলার আদিবাসী-প্রধান দেশ এইটাই আসল কথা, দ্বিতীয় কথা

১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য: কালি-কলম (তারাশঙ্কর স্মৃতিসংখ্যা), পৃঃ ৫৪৩।

হল, এই রাঢ়দেশে আর্যসভ্যতার প্রসার হয়েছে অনেক পরে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চল আর্যীকরণের (উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ইত্যাদি) অনেক পরে। একথা বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক পটভূমিরূপে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, কারণ বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া প্রাচীন সুহ্ম ও রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত।"[১]

"বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্যজীবী, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখনও বেশি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ়দেশে। সাম্প্রতিক লোক গণনাতেও দেখা গেছে যে, এইসব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর অঞ্চলে (অর্থাৎ রাঢ়দেশে) প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে।"[২] আদিম জাতির মধ্যে বাংলাদেশে সাঁওতালরাই প্রধান। বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায়ও যথেষ্ট সাঁওতাল বাস করে। এই সকল বিভিন্ন জাতি-উপজাতির বাঙালী সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান যথেষ্ট। "বাংলার লোকশিল্প, বাঙালীর বলবীর্য-বীরত্ব, বাংলার লোকোৎসব, নানাদিক থেকে এই সব জাতির কাছে ঋণী। কেন ও কি জন্য বাঙালীর সংস্কৃতিতে এত লৌকিক উপকরণের প্রাচুর্য, তার কারণ অনেকাংশে রাঢ়দেশের ইতিহাস থেকেই (উত্তরবঙ্গ ছাড়া) পাওয়া যায়। রাঢ়দেশে বিভিন্ন জাতির আনুপাতিক প্রাধান্য, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির সঙ্গে তাদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থেকে বাঙালীর সংস্কৃতির লৌকিক উৎসের আভাস পাওয়া যায়।"[৩] তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির ইতিহাস কিছুটা রূপায়িত হয়েছে এবং সেই-

১। বিনয় ঘোষ . পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৬৮।
২। " " পৃঃ ৭০।
৩। " " পৃঃ ৭২।

জন্য লৌকিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসাবে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

কোন দেশের ইতিহাসে সে দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিহাস যুক্ত না হলে তা সম্পূর্ণ হয় না। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "…যেখানেই হউক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।…
> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম…রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্পর্কে আমাদের কত-বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত-বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।…সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বনগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে"[১]…রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি স্মরণে রেখে বলা যায়, তারাশঙ্কর বিশেষ উদ্দেশ্যে এই সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা না করেও সাহিত্য সৃষ্টিকালে অজান্তেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকে নির্ভরযোগ্য

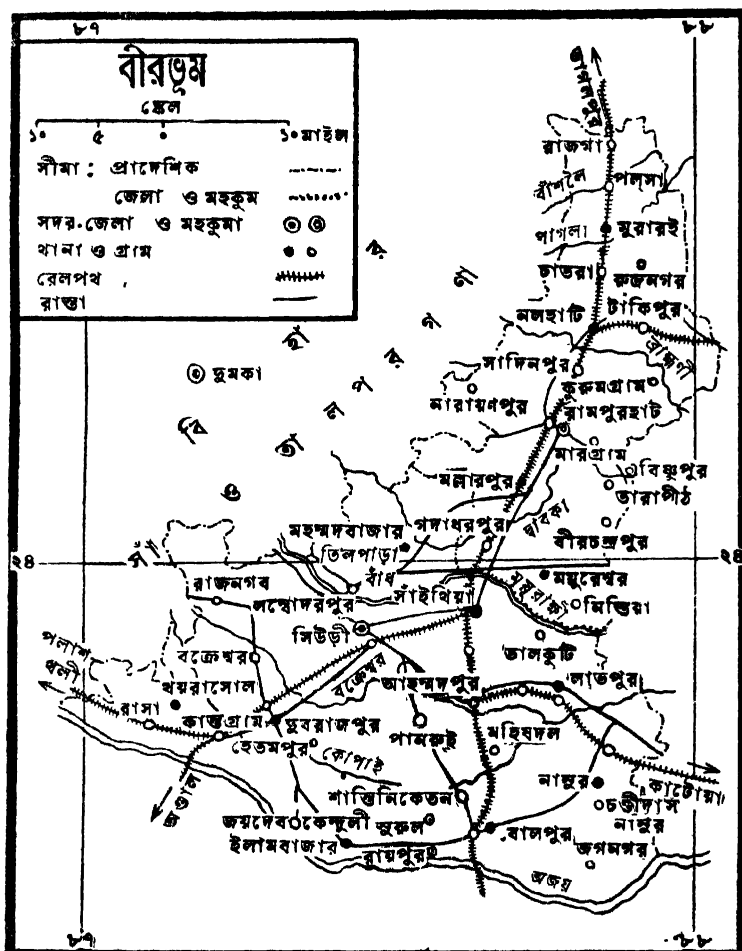
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৩১২ পৃ: ৫৮। (শিক্ষা গ্রন্থে সংকলিত), রবীন্দ্র রচনাবলী (৩য় খণ্ড)

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে রেখেছেন। তাতে কেবল নীরস ইতিহাসের তথ্য নয়, জীবনের ছন্দে দোলায়িত হয়ে তা রস সৃষ্টি করেছে—সামগ্রিক জীবন-ধর্মকে প্রকাশ করেছে। তাই এ সকল উপন্যাসে ইতিহাস ও সাহিত্যের স্বাদ একই সঙ্গে আস্বাদন করা যায়। যাঁরা সামাজিক ইতিহাস রচনা করেন, তাঁদের ছোট ছোট অঞ্চলের জনজীবনের সঙ্গেও পরিচয় থাকা প্রয়োজন হয়।—ইতিহাস রচনার এই রীতিকে আধুনিক কালে বলা হয়েছে "—the process of writing history 'from the bottom up' through the use of local materials and a local focus"[১] তারাশঙ্করের রচনায় এই 'local materials' ও 'local focus'-এর সার্থক রূপায়ণ রয়েছে, সুতরাং সেদিক থেকে তাঁর উপন্যাসের আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

প্রধানত বীরভূম জেলা তারাশঙ্করের সেই পরিচিত অঞ্চল। এই বীরভূম জেলার একপাশে সাঁওতাল পরগণা—"সাঁওতাল পরগণার, পর্বতমালার পরে ভূপ্রকৃতির তরঙ্গ বিক্ষোভ ও উত্থান-পতন যেন সিউড়ি পর্যন্ত এসে তারপর বাংলার সমতল ভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে। প্রকৃতির এই তরঙ্গায়িত রূপের সঙ্গে বীরভূমের তথা রাঢ়ের সংস্কৃতির ক্রমায়াত ধারার একটি অপূর্ব সাদৃশ্য আছে। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী সংস্কৃতি অর্থাৎ আদি অস্ট্রিক বা নিষাদ সংস্কৃতির ধারা যেন উত্থান-পতনের বন্ধুরপথে প্রবাহিত হয়ে বাংলার সুসমন্বিত সংস্কৃতি গঙ্গায় মিলিত হয়েছে এইখানে। সিউড়ি ও তার আশে-পাশে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে যা প্রত্যেক সংস্কৃতি বিজ্ঞানের (Cultural

1. The Cultural Approach to History—Edited for the American History Association, by Caroline F Ware. বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৩।

Anthropology) ছাত্রের কৌতূহল ও অনুসন্ধানের খোরাক যোগাতে পারে।···সিউড়ির অলিগলিতে ও আশে-পাশে প্রত্যেক পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরলে শুধু সিউড়ির নয়, বীরভূমের এক বিচিত্র রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধবৃত্তাকারে ধাঙড়পাড়া,



বাউরীপাড়া, হাড়িপাড়া, মালপাড়া, কেওটপাড়া ইত্যাদির অবস্থান। শুধু যে শহরের প্রান্তসীমায় এদের বসবাস, তা নয়, শহরের মধ্যেও

ইতস্তত হাড়ি বাউরী ডোম প্রভৃতি জাতির বাস আছে। এছাড়া বারুইপাড়া, চর্মকারপাড়া ইত্যাদিও আছে। পাড়ায়-পাড়ায় প্রচুর দেব-দেবী ও অসংখ্য মন্দির আছে। দেব-দেবী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী, কালী ও ধর্মঠাকুর শতকরা নিরানব্বই জন। এমন কোন পাড়া নেই, যেখানে মনসা, কালী ও ধর্মঠাকুর নেই। বীরভূমের অন্যতম সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব যেন সিউড়ির পাড়ায় পাড়ায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাউরীপাড়ায় আছে 'সাঁউডালি পূজা'র স্থান। ···পাশে যে নিমগাছটি আছে, তাতেও একজন থাকেন, তাঁকে, দেখা যায় না, তাঁর নাম 'ঝেঁটেনি বুড়ি'। 'বাঁদরিভূত'ও ঐ গাছে বিরাজ করেন, উৎসবের সময় 'ঝেঁটেনি বুড়ি' যার স্কন্ধে ভর করেন, তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান গলগল করে বলে দিতে পারেন। বাঁদরিভূত যার স্কন্ধে বিরাজ করেন, তার হুপ হুপ করে বাঁদরের মতন লম্প-ঝম্ফ দ্রষ্টব্য ব্যাপার।"[১] এছাড়া বীরভূমে শক্তিপূজার প্রচলনও খুব বেশি—"বীরভূমের কীর্ণাহার লাভপুর অঞ্চলে একাধিক গ্রামে হাড়িডোম পূজিত বিখ্যাত সব 'কালী' আছেন।···কীর্ণাহারের গ্রামদেবতা ভদ্রকালী। লাভপুর তো ফুল্লরাদেবীর তান্ত্রিক পীঠস্থান বলে খ্যাত।"[২] বীরভূম জেলায় একাধিক তন্ত্রোক্ত পীঠস্থান আছে, বক্রেশ্বর বীরভূমের বা বাংলাদেশের বিশিষ্ট শৈবতীর্থ—বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকরা এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে 'অঘোরীবাবা'র নাম অনেকেরই পরিচিত। তাছাড়া 'তারাপীঠ'ও বিখ্যাত তীর্থস্থান, তান্ত্রিকসাধক বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেন এখানে। এতো গেল তন্ত্রপীঠের কথা। বীরভূমের অন্যদিকে প্রবাহিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্মের ফল্গুধারা। তাই একাধিক বৈষ্ণবতীর্থও এখানে অবস্থিত। প্রথমেই

১। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পৃঃ ১২৪-১২৭

২। " " পৃঃ ৪৯।

জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলীর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে অজয় নদীর তীরে এই গ্রাম। বহুকাল থেকে এখানে পোষ সংক্রান্তিতে জয়দেব-স্মারক মেলা বসে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব মিশ্রের স্মৃতি-বিজড়িত এই মেলা। তাই বহুলোকের—আউলবাউলের সমাগম হয় এই মেলাকে উপলক্ষ করে।

আর আছে প্রেমিক চণ্ডীদাসের বাসস্থান নান্নুর। নান্নুরে ধ্বংসস্তূপপ্রায় বাশুলীদেবীর মন্দির আছে, বিনয় ঘোষ বলেছেন—"বর্ধমান ও বীরভূমের এই অঞ্চল ঘেঁষেই খ্যাতনামা পদকর্তাদের বিকাশ হয়েছে যখন দেখি, গীতগোবিন্দ রচয়িতার কেন্দুবিল্ব থেকে নান্নুর এবং নান্নুর থেকে কেন্দুবিল্ব পর্যন্ত যখন পায়ে হেঁটে শত শত ভক্তযাত্রী আজও যাতায়াত করছেন দেখতে পাই, তখন মনে হয়, পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুরে যেন স্বাভাবিক ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।" [১]

বীরভূমের পাইকোড় হল সাঁওতাল পরগণার পাশে। এখানকার বাণব্রত উৎসব বিখ্যাত। এ উৎসবে শৈব তান্ত্রিক ও সাঁওতালী সংস্কৃতির সমন্বিত রূপটি লক্ষণীয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে মনসাপূজার প্রচলন অত্যন্ত বেশি দেখা যায় এবং মনসাদেবীর প্রতিপত্তিও প্রচণ্ড। "নরমুণ্ডনৃত্যও অন্যতম আদিম ধর্মানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান পরে ধর্মঠাকুরের ও শিবের গাজনোৎসবের অঙ্গ হয়েছে। ধর্মঠাকুর রাঢ়ের অন্যতম গ্রামদেবতা এবং গাজন (গা=গ্রাম, জন=জনসাধারণ) গ্রামের জনসাধারণের উৎসব।...ক্রমে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন।" [২]

১। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পৃঃ ১৫৩।
২। " " " পৃঃ ৪৮-৪৯

ভাদু এই অঞ্চলের অন্য একটি উৎসব। "মানভূম-পুরুলিয়া-পঞ্চকোট থেকে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের সিউড়ি পর্যন্ত ভাদু উৎসবের প্রধান কেন্দ্র।...ভাদু উৎসব এক সময় মানভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলের বাউরী ও সমশ্রেণীর অন্যান্য জাতির প্রধান উৎসব ছিল...পরবর্তীকালে ভাদুপূজা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর বীরভূম অঞ্চলে প্রায় সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে।[১] নৃত্যগীতই এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ, ছড়া রচনা করে এ উৎসবে একসঙ্গে গান ও নৃত্য করে।

বীরভূমে অবশ্য বৈষ্ণব শাক্তধারার সঙ্গে ধর্মঠাকুরও অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করে আছেন। "ধর্মপূজা অব্রাহ্মণদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত, উৎসবটা প্রধানত তাদেরই। হাঁড়ি, ডোম, বাউরী, ধীবর প্রভৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তন্তুবায়, বণিক কর্মকারদের মধ্যেও কম নয়। ক্রমে ব্রাহ্মণরা যে পূজারী হয়েছেন পরে, তাও অত্যন্ত স্পষ্ট।—কোথাও বলিদান ও হরির লুট একই সঙ্গে হচ্ছে কোথাও বলিদান বন্ধ হয়েছে।...দ্বিতীয় লক্ষণীয় হল—চড়ক গাজন, বাণফোঁড়া ও সং ধর্মপূজানুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ভর' নামার ব্যাপারও উপেক্ষণীয় নয়।... ধর্মরাজ সাধারণত মনসা, চণ্ডী বা কালী-সহ বিরাজ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় সাধারণত পূজা হয়, প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শ্রাবণ পূর্ণিমা পর্যন্ত উৎসব বিস্তৃত হয়েছে। বীরভূমে প্রস্তরখণ্ডই ধর্মরাজ, মনসা, চণ্ডী ও কালী বলে পূজিত হন, কোন মূর্তি বিশেষ নেই।"[২]

বীরভূমে হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের বাসভূমির ঐ নামে কোন অস্তিত্ব না থাকলেও ঐ জাতি ও তাদের অঞ্চলের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় তারাশঙ্করের বর্ণনা থেকে। "হাঁসুলীবাঁকের

১। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পৃঃ ৭১৭-৭১৮।

২। " " " পৃঃ ১৮৮।

উপকথার অঞ্চল একটি আছে, নদীর বাঁক সেখানে হাঁসুলীর মতই বটে। তাতে বাঁশবেড়ের অস্তিত্বও ছিল। একটি পরিত্যক্ত নীলকুঠিও আছে, পতিত-রুক্ষ-প্রান্তর এবং বেনোজলাভূমিরও সমাবেশ সেখানে আজও রয়েছে। ···হাঁসুলীবাঁকে কাহাররা আছে, তাদের জীবনযাত্রায় বা সামাজিক বাস্তবতায় আমি অতিরঞ্জন করিনি, ···কাহার বলে কোন নির্দিষ্ট জাতি বাংলাদেশে নেই, হরিজন যাদের বলি আমরা এদের মধ্যে যারা পাল্কী বয়ে থাকে তারাই বাংলাদেশে কাহার। ধরা যাক বাগ্দী সম্প্রদায়। বাগ্দীদের মধ্যে যারা পাল্কী বয় তারা বাগ্দী কাহার। যারা বয় না তারা শুধুই বাগ্দী।"[১]

বীরভূম বেদে সমাজের স্থায়ী বাসস্থান না হলেও এখানে নানা ধরনের বেদেরা আসত। তারাশঙ্করের আত্মজীবনীতে এদের বাজীকর, যাযাবর, আসল বেদে, অপেক্ষাকৃত সভ্য বেদে ইত্যাদি নাম ও এদের ধ্যান-ধারণা, আচার-নিষ্ঠা ইত্যাদির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। রাঢ়ভূমির বিস্তৃত ভূখণ্ডে এবং নানা অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকে এসব মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তাদের পালপার্বন ও ভাষা ইত্যাদির পূর্ণ পরিচয় উদ্ধার করলেই এই সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ইতিহাসের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ়ের ভু-প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি:

"বাংলাদেশ বলতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তিন প্রদেশ একসঙ্গে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি, অগ্র. ১৩৭১) পৃঃ ৮৭-৮৮।

পশ্চিমে তিন পাহাড় রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগণা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা—রাজমহল থেকে সমস্ত দক্ষিণ এলাকা নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত নবাবী আমলে এ সমস্তটাই ছিল বসতিবিহীন অরণ্যভূমি। ইংরাজের দেওয়ানীর পর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে চাষের ক্ষেত তৈরী হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালরা সমতলে নেমে এসে গ্রামে বসতি তৈরী করে চেহারাটা পাল্টে দিয়েছে।"[১]

"অঞ্চলটাই পাথর, কাঁকর আর লালমাটির অঞ্চল, শক্ত কঠিন রুক্ষমাটি, লাল ধূলোয় ভরা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে শালবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে পড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সে প্রান্তর ধূসর রুক্ষ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই মাথা ঠেলে বেরিয়ে যেন থাবা গেড়ে বসে আছে। এরই মধ্যে আপনার চোখে পড়বে দুচারটে পঁচিশ থেকে তিরিশ চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরের ঢিবি, তাকে ঘিরে জন্মেছে শালগাছ—ক্বচিৎ কোথাও একটা বড় বটগাছও আপনার চোখে পড়বে তারপরই আবার পড়বে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শালজঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাঁঠালগাছ দেখতে পাবেন। হঠাৎ চোখে পড়বে কাঁচা সোনার বর্ণের শিমূল ফুলের মত বড় বড় ফুল ছেয়ে রয়েছে খানিকটা বনভূমি। গাছের শাখাপ্রশাখা পাতা নেই, আঁকাবাঁকা কাণ্ড শাখা, ওই ফুলে শাখা প্রান্তগুলি ছেয়ে আছে। বসন্তকালে শীতের শেষে পলাশ গাছে পলাশফুলও পাবেন।"[২] ১৮৫৪ সালের সাঁওতাল অরণ্য অঞ্চলে নেকড়ে, হেঁড়োল, হায়েনা ও 'ঝিঙেফুলি' চিতার হিংস্রতা বর্তমান

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: অরণ্যবহ্নি, পৃঃ ১-২।
২। " " পৃঃ ২-৩।

ছিল—সাঁওতালরা বাঁশের বল্লম, ধনুক তীর নিয়ে এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত। এই হল সাঁওতালদের বাসভূমির বর্ণনা। তারপর "এরা অরণ্যমানুষ—কালোরঙ, পরণে মাত্র একফালি কাপড়, মাথায় বাবরি চুল, তাতে ফুল গোঁজে, কানে ফুল গোঁজা, পুঁতির মালা গলায় পরে। ···মেয়েরা কষ্টিপাথরে খোদাই করা সুঠাম গঠন নারী মূর্তি, ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। সিঁথি সমান করে উজিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা বাঁধে।"[১] এই সাঁওতালরা দেবতাকে বলে 'বোঙ্গা', দেবতার স্থানকে বলে 'জহরসর্না'। তাদের নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আছে নানাবিষয়ে, তাই নানাধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এরা তাদের 'বোঙ্গার' ইশারা পায়। হিন্দুদের দেবদেবীও ওরা বিশ্বাস করে। নানা উৎসবে পার্বণে হাঁড়িয়া খেয়ে মত্ত হয়ে নৃত্য করে এরা। আমি জানি, বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি বিজয়া দশমীর দিন সাঁওতালদের মহোৎসব। হাঁড়িয়া খেয়ে আপন আপন সব থেকে উজ্জ্বল পোষাক পরে মাথায় ময়ূরের পালক পরে যুদ্ধনৃত্যের প্রমত্ততা।"[২] এদের সমাজে মোড়লকে বলা হয় 'মাঝি'। সাঁওতালী উপভাষায় তারাশঙ্করের যে জ্ঞান ছিল তারও দৃষ্টান্ত আছে, 'অরণ্য-বহ্নিতে'। যেমন, "বাবারে কারীদাং বিমীল বাকাপকানা (ভীষণ কালো মেঘ উঠল হে)।

—বিজলী মালকাও কানা (বিদ্যুত চমকাচ্ছে হে)।

—দা গায় (জল হবে)।

—মারংহায়েদা গায় (ঝড় হবেক হে)।[৩]

'অরণ্যবহ্নি'র মত 'কালিন্দী' উপন্যাসেও তারাশঙ্কর সাঁওতালদের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ অরণ্যবহ্নি পৃঃ ৪-৫।

২। " " পৃঃ ১২।

৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ অরণ্যবহ্নি, পৃঃ ১২।

জীবন অঙ্কন করেছেন, সাঁওতালদের ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সাঁওতাল-বিদ্রোহ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।

এই সব জাতির বাসভূমিরও বর্ণনা দিয়েছেন—তাতে রাঢ়ের বিশেষ অঞ্চলের ছবিগুলো যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'সপ্তপদী' উপন্যাসের বর্ণনা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—"বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটা পুরীর পথ বলে খ্যাত—বিষ্ণুপুরের কোলঘেঁষে মেদিনীপুর হয়ে চলে গেছে সমুদ্রতট পর্যন্ত, যার সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে কয়েকটা রাস্তা মিলেছে…শালবন আর গেরুয়া মাটির দেশ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়িয়া নদী। বীরাবতী-শিলাবতী, দারুকেশ্বর, বিরাই-শিলাই, দারকা। মধ্যে মধ্যে লালচে পাথর, নুড়ি ছড়ানো অনুর্বর প্রান্তর খানিকটা। এই ধরনের ভূপ্রকৃতি একটা ঢল নামার মতো নেমে ছড়িয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আবার এরই দুধারে বাংলার কোমল ভূমির প্রসার, সেখানে জনসমৃদ্ধ গ্রাম শস্যক্ষেত্র। উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্যভূমির রেশ উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তভাগ থেকে বিচিত্র আঁকাবাঁকা ফালির মত ছড়িয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ক্রমশ। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল মহলগুলি ইতিহাস বিখ্যাত। পাথুরে কাঁকুরে এই আঁকাবাঁকা শাল জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে গ্রামগুলি, সেগুলিতে সেই প্রাচীন আমলের মানুষদের বংশধরেরা বাস করে। বাউড়ী, বাগ্দী, মেটে, মাল, খয়রা, সাঁওতাল। এদেরই মধ্যে সামন্তযুগে প্রধান হয়ে বসেছিল উত্তর ভারতের ছত্রীরা, সিংহ রায় প্রভৃতিরা,…সমতলভূমে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-নবশাক-প্রধান গ্রামগুলি এদের থেকে একটু দূরে ও ওসব গ্রামেও বাগ্দী, বাউড়ী, মেটে, মাল আছে।"[১]

যাযাবর বা ইরানীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা ছিল, এরা এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল না বটে, কিন্তু এরা

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: সপ্তপদী, পৃঃ ২-৪।

প্রায়ই এ অঞ্চলে আসত এবং বসবাস করত।

তারাশঙ্কর এদের নিকটতম সান্নিধ্য লাভের কথা বলেছেন। 'তামসতপস্যা' উপন্যাসে এই বেদেদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—"অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষ ইহারা, ইরানী বলিয়া পরিচিত, ইউরোপের জিপসীদের অন্যতম শাখার যাযাবর শ্রেণীকে বাদ দিয়াও এই দেশেই আরও যাযাবর শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত শ্রেণীর। দলে তাহারা প্রকাণ্ড, ঘোড়া-গাধা পর্যন্ত তাহাদের আছে। বেশভূষায় ইহাদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। হিন্দুর পল্লীতে গিয়া তাহারা মাথায় নামাবলী বাঁধে, ফোঁটাতিলক কাটে, বহির্বাস পরে, গলায় পরে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু নেয়, পুরাদস্তুর সন্ন্যাসী সাজিয়া, নমো নারায়ণায় হাঁকিয়া গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়, মুখ দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলে। মুসলমানদের পল্লীতে ফকির সাজিয়া মুসলমানী বোল হাঁকিয়া ভিক্ষা করে, দাবী করে, কাড়িয়া লয়, ছোট ছোট বাজার-হাট, সুবিধা পাইলে লুঠ করিয়া লয়। ধর্মের রীতিনীতি আচার পালন করে না; কিন্তু ধর্মের ছোঁয়াচ তাহাদের যাযাবর-জীবনে লাগিয়াছে। একই দলের মধ্যে ধর্মে হিন্দু এবং ধর্মে ইসলাম উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছে। অবশ্য সে নামেই; তাহাদের খাদ্য এক, পানীয় এক, ভাষা এক, আচার এক, দলের মধ্যে আইন এক, কোন পার্থক্য নাই। না থাক, তবুও মানুষের মনের মধ্যে সভ্যতার যতটা প্রভাব পড়িলে জীবনে ধর্ম আসে, ততখানি সভ্যতা তাহাদের মধ্যে আছে। ইহারা কিন্তু আজও পড়িয়া আছে মানবজীবনের অনেক নিম্নস্তরে। ভীমদর্শন বর্বর হিংস্র মুখের গঠন, কালোরঙের উপর পুরু ময়লার একটা স্তর জমিয়া আছে, গরম লাগিলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অঙ্গ মার্জনা জানে না, শীতে স্নানই করে না। গায়ের লোমকূপে উকুন হয়, পরনের একফালি কৌপীনের মত কাপড়ে সাদারঙের উকুন থিক থিক করে, উহারা বলে চিল্লড়। কামড়ে মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া আঙুল

চালাইয়া মারিয়া ফেলে, মটমট শব্দ উঠে। অখাদ্য বলিয়া কিছুই নাই, গরু ভেড়া মহিষ শিয়াল হইতে ব্যাঙ এমনকি সাপ পর্যন্ত খায়. অর্ধসিদ্ধ লবনাক্ত মাংস হইলেই হইল, মাংসের সঙ্গে খায় মদ ; এসমস্ত হজম করিবার শক্তি উহাদের দেহের কোষে কোষে পিতৃপুরুষক্রমে সঞ্চিত আছে।"[১]

তারাশঙ্করের নানাধরনের বেদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল। একদলকে তিনি 'সত্যকার বেদের দল' বলেছেন এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য বেদেসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন আত্মজীবনীতে। সেকালে বছরে তিনটে, চারটে বেদের দল তাঁদের অঞ্চলে আসত একেবারে বর্বর, অল্প সভ্য নানা দলকে দেখার সুযোগ তাই ঘটেছিল। এইরূপ এক নিম্নস্তরের যাযাবর বা বেদেই 'তামসতপস্যা'র নায়ক পান্নুকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে। পান্নু এই বেদেদের বিচিত্র সমাজে বাস করে ক্রমশ এদের অদ্ভুত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে থাকে, এদের প্রৌঢ় গুনীন পান্নুকে তখন নানা লোভ দেখায়—আশ্বাস দেয় "উহাদের কথাবার্তা পান্নু এখন অনেকটা বুঝিতে পারে, অল্প স্বল্প বলিতেও শিখিয়াছে। প্রৌঢ় গুনীন বলে,—আমার মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি সব তুকে শিখাইব। তামাম আদমী ডরকে মারে তুকে খাতির করবে। এই দলের মধ্যে সর্দার তুকে পালা বৈঠনে দিবে। প্রৌঢ়া বলে—নয়া কাপড়ার তাবু বানিয়ে দেগা। থালা দিব, লোটা দিব, হাড়ি দিব, বহুৎ রঙদার দড়ি দিয়ে শিকে বানিয়ে দিব। বহু আসবে তুঁহার, বিস্তারা দিব, তুঁহার তাঁবু পড়বে আমার তাঁবুর পাশে। প্রৌঢ় বলে—বহুত আচ্ছা তীরধনুক বানিয়ে দেব, আচ্ছা কুলাঢ় বানিয়ে দেব, শড়কী বানিয়ে দেব, ডাণ্ডা বানিয়ে দেব। একটো ভঁইসা দিব, যিসকা বেটিকে তু সাদী করবি উভি দেবে একটো ভঁইসা ; দুটো আচ্ছা কুত্তাভি দেব,

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : তামসতপস্যা পৃঃ ৩৬—৩৭।

শিকার খেলবি। প্রোঢ়া বলে—এ বুড়োয়া, তুহার সাঁপকা ভি দিস বাচ্চাকে।"[১] এদের জীবনের পরাক্রম এই ভঁইস, সাপ, তাঁবু, শিকে, মন্ত্রতন্ত্র ও জড়িবুটির গুণেই। তাই যখন সমৃদ্ধির বা উন্নতির স্বপ্ন দেখে যখন কোন উচ্চাশা জীবনে বাসা বাঁধে তখন এসব বস্তু লাভের জন্য ব্যগ্র হয়, অপরকেও লুব্ধ করে, স্বপ্ন দেখায়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—"নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরই তারাশঙ্করের দৃষ্টি আর একটি যে বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল তা বীরভূমের বেদে সমাজ। এই সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবন তারাশঙ্করকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল, তাদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'এই সম্প্রদায়টি আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল, তাদের জন্য মনে মনে বেদনা অনুভব করি, এই উক্তির মধ্যে তারাশঙ্করের হৃদয়টির সন্ধান পাওয়া যায়। বেদে সম্প্রদায় আজ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বেদনাবোধ করবার কারণ কি? হয়ত কেউ কেউ বলবেন, সমাজের মধ্যে এমনভাবে অধঃপতিত হয়ে বাস করার চাইতে লুপ্ত হয়ে যাওয়াও অনেক ভাল। কারণ, হয়ত তারা অন্য লাভজনক ব্যবসায় কিংবা বৃত্তি গ্রহণ করেছে বলে লুপ্ত হয়েছে। দেশে নানা কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে, তাতে শ্রমিক হয়ে প্রবেশ করে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় মর্যাদাই তাদের বেড়েছে বলে তারা বেদের মত হীনবৃত্তি পরিত্যাগ করেছে—সুতরাং বেদে সম্প্রদায় আজ যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবে তার পক্ষে ভালোই হয়েছে। যারা কেবলমাত্র নিজেদের একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্য বেদেদের সমাজের নিম্নতম স্তরে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তারা তাদের বিলুপ্তির জন্য দুঃখ করতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্কর বেদেদের এবং তাদের জীবিকা অর্জনের প্রণালীকেও রাঢ়ের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: তামসতপস্যা, পৃঃ ৩৫-৩৬।

সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মনসাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ, বীরভূমের বেদেরা বাঙ্গালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির এই বিশেষ অঙ্গটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—তাদের বাদ দিলে রাঢ়ের সর্পপূজা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সুতরাং যখন রাঢ় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্য থেকে বেদেদের অন্তর্ধান ঘটল, তখন তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনে যে ফাটল হল, তারই জন্য তারাশঙ্কর বেদনাবোধ করেছেন।

বেদেদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তারাশঙ্কর কতকগুলো শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন, তাছাড়া তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই তাদের বিচ্ছিন্ন নানা চিত্র এবং চরিত্র ছড়িয়ে আছে। তাঁর 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' রাঢ়ের লোকসংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ অধ্যায়।"[১]

বেদে সম্প্রদায়ের বিলুপ্তিতে যে কোন কারণেই তারাশঙ্কর বেদনাবোধ করুন না কেন, বেদেদের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের পরিচয় ও তথ্যান্বেষণ তাঁকে বেদে জীবনের মর্মমূল উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এমনকি এই অভিজ্ঞতার গুণে তাঁর কল্পনাশক্তিও সুদূরপ্রসারী হয়ে শিল্পসম্মত উপায়ে তাতে নূতন নানা তথ্যও সংযোজিত করেছিল। এর প্রমাণ 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী', এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর এক আদিম উপজাতির দৈহিক-মানসিক বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে অতি বাস্তবসম্মত রূপে উপস্থাপিত করেছেন। সাপুড়ে ও বেদেদের জীবনযাত্রা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, কামনা-বাসনা, হিংসা-কুটিলতা, সঙ্কীর্ণতা সম্পর্কে

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য: তারাশঙ্কর ও রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি (কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮) পৃঃ ৫৪১-৫৪২।

অবহিত থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থলে তিনি কল্পনাকে আশ্রয় করেছেন, রাঢ়দেশে 'হিজলবিল'-এর অস্তিত্ব থাকলেও তারাশঙ্কর এই উপন্যাস রচনার পূর্বে 'হিজলবিল'কে কেবলমাত্র মনশ্চক্ষেই দেখেছেন। বেদেদের যে নানা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে—এও তাঁর কল্পনাজাত। অবশ্য নাগিনীকন্যা শবলাকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন বলে আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন, তার হাতেও ছিল এমনি বিষাক্ত সর্প। বীরভূম সর্প-উপদ্রুত অঞ্চল। ফলে সাপুড়ে, বেদেদের সর্প সংগ্রহ ও জীবিকার্জনের আদর্শ স্থান। এই অঞ্চলের মানুষ তারাশঙ্করের স্বভাবতই সর্প সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ছিল, তারাশঙ্কর আত্ম-জীবনীতে তাঁর মায়ের সর্প সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার নানা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও নানা জাতীয় সাপের গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন, তারই ফলে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে সাপুড়েদের সাপ-ধরার কৌশল, বিষসংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদির খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনসা সম্পর্কে রাঢ়ের জনজীবনের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার। এই সকল বেদেরা বহু শতাব্দী ধরে জাতিগত বৃত্তিতে এক রহস্যময় আকর্ষণীশক্তিকে পোষণ করে রেখেছে —কি এক সম্মোহনী বিদ্যা দিয়ে তারা যেন মানুষকে প্রতারিত করেছে—ভুলিয়ে রেখে, আকৃষ্ট করেছে। তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণের মধ্যে, তাদের গোষ্ঠীগত জীবনের কামনা-বাসনার মধ্যে এক বিচিত্র রহস্যময়তার সহজাত অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্কর বাস্তব ও কল্পনার নানা উপাদান সংমিশ্রিত করে, রাঢ়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংযোজিত করে "নাগিনীকন্যার কাহিনী"তে অপূর্ব রসনির্যাস সৃষ্টি করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"সেক্সপীয়রের মতই তারাশঙ্কর তাঁর শিল্প সুষমাবোধে সাপুড়েদের সম্পর্কে জনপ্রিয় জনশ্রুতিজাত উপাদান, ওদের সমাজের অপরিচ্ছন্নতা ও দারিদ্র্য এবং তাদের ভীতিজনক জীবনযাত্রা ও জীর্ণ মলিন বেশবাসের মধ্য দিয়েও যে একপ্রকার অতীন্দ্রিয় গাম্ভীর্যের

প্রতিভাস পরিস্ফুট হয়—এ সমস্তই এক নিপুণ অনুপাতে মিশ্রিত করে নিয়েছেন। এদের বশীকরণ মন্ত্র সবসময়ে অব্যর্থ নয়, সর্পিল সরীসৃপগুলি প্রায়ই তার নিয়ন্ত্রকের হস্তদংশন করতে সক্ষম হয়। তারাশঙ্কর এক অদ্ভুত বর্ণসংশ্লেষণের দ্বারা এদের আলো ও ছায়ার বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অঙ্কিত করেছেন।"[১]

'আগুন' উপন্যাসে তারাশঙ্করের পরিচিত দেশী যাযাবর বা বাজীকরদেরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। "··প্রথমেই আসিল বাজীকরদের পাড়া। রহস্যময় যাযাবরদের-ভাঙাচোরা ঘরগুলির চালের বাতায় ঝুলে সাপের হাড়ি, দুয়ারে প্রহরা দেয় বড় বড় কুকুর, এই গাজন ওই বাজিকরদেরই উৎসব।"[২] "গাজনের ঢাক বাজিতেছে। ভক্তের দল আসিয়া হীরুর বাগানে প্রবেশ করিল। সিন্দূরলিপ্ত 'বাণ গোসাই' কাঁধে করিয়া বাজিকর জাতির ভক্তদল ধ্বনি দিয়া উঠিল—বলো শি-বো-হর-বোম-হর-হর-বোম! আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতে ছিলাম বাজিকরদের। এই জাতিটি আমার চিরদিনের বিস্ময়। যাযাবর জাতি, ভাঙাচোরা ঘরগুলি পিছনে ফেলিয়া বৈশাখেই দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইবে, বর্ষায় ভাঙাঘর ভূমিসাৎ হইবে, আবার ফিরিয়া নতুন ঘর তুলিবে। সে ঘরও আবার ভাঙে, আবার ইহারা আসিয়া নতুন গড়ে। এই শিব, এই গাজন ওই বাজিকরদেরই নিজস্ব।"[৩] এরাই সন্ধ্যায় উৎসব করে আতসবাজি পুড়িয়ে প্রমোদ বিলাসে প্রাণমন ঢেলে দেয়। "বর্ষশেষের রাত্রিতে গাজনের ভক্তের দল নাচিতেছিল। বোলার গান হইতেছে, বৃত্তাকারের নৃত্যরত ভক্তদলের মধ্যে নরকপালের স্তূপ, নাচিতে

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর (শনিবারের চিঠি, কার্তিক, ১৩০৮) পৃঃ ১৫।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৫৫।

৩। " " " পৃঃ ৫৭।

নাচিতে তাহারা নরকপাল লইয়া খেলিতে আরম্ভ করিল ··এইবার ফুলখেলা হইবে ভক্ত দল শিবের মাথায় ফুল চড়াইবে—”[১] কিন্তু এ ফুলখেলা বৃক্ষজাত পুষ্প নিয়ে নয়—বহ্নি পুষ্প নিয়ে। এই ধরনের গাজন উৎসব এই বাজীকর বা যাযাবর জাতির মধ্যেই প্রচলিত। এদের কথাও অত্যন্ত ভাঙা, ভাষাটি মিশ্রিত যেমন—'আগুনে'র যাযাবরী বলছে—“এত সোন্দর কি করে তুমি হল্যা বাবু? এত সোন্দর রঙ তোমার” কিংবা, “উ বাবুটিকে দেখ্যা আমার ভাল লাগছে, তাই তুমার হিংসে হচ্ছে নাকি গো।”[২] তারাশঙ্করের পরিচিত যাযাবরী এখানে তার ভাষা ভাবভঙ্গী নিয়ে এভাবেই পাঠক-সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা'য় আছে বাগ্দী, ভল্লাদের বর্ণনা—ডোমপাড়া, মুচিপাড়া, বাউরীপাড়া ও সদগোপ পল্লীর মানুষের কথা ও বীরভূমের ভূপ্রকৃতির ব্যাখ্যা। “বাংলাদেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বরভূমি—প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া' যেন ভৈরবী বেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন···বীরভূমের দক্ষিণাংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই—দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ুরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।”[৩] মুর্শিদাবাদের কালো নরম মাটির বর্ণনা 'অভিযান' উপন্যাসেও পাওয় যায়।

'কবি' উপন্যাসে ডোমদের বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর—“যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম ·সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে—ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায়, ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৫৯।

২। পৃঃ ৬১।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ধাত্রী দেবতা পৃঃ ১

প্রাচীন কাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস বিখ্যাত। ইহাদের উপাধিই হইল বীরবংশী। নবাব পল্টনে নাকি বীরত্বে বীরবংশীরা একদা বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিশের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত।"[১] এই ডোমবংশেই 'কবির' নায়ক নিতাইচরণের জন্ম। 'কবি' ছাড়াও অন্যান্য উপন্যাসে এই ডোমবংশীয় মানুষের চরিত্র চিত্রণ করেছেন তারাশঙ্কর।

'জঙ্গলগড়' উপন্যাসে তারাশঙ্কর রাঢ়ের অন্য এক সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিবৃত করেছেন—সঙ্গে ভূপ্রকৃতি ও প্রাচীন ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন—"এরই মধ্যে মেদিনীপুর অঞ্চলে মানুষ ব্যস্ত-ত্রস্ত বেশী। বিশেষ করে জমিদার রাজারা। এই অঞ্চলটিতে—বাঁকুড়া মেদিনীপুর অঞ্চলে জমিদার রাজার সংখ্যা অনেক। সে বহুকাল থেকে। কর্ণগড়, ঝাড়গ্রাম, মহিষাদল, নয়াগড়, হিজলী, ময়না, নয়াগ্রাম, কিয়ারচান্দ, বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুররাজ প্রভৃতি নিয়ে এ অঞ্চলটি জমিদার জায়গীরদারদেরই রাজত্ব। নবাবের শাসন এখানে ঠিক কোনকালেই কায়েম নয়। সেই পাঠান আমল থেকে মোগল পাঠানের আধিপত্যের যুদ্ধের লীলাভূমি এবং প্রাচীনকাল থেকে উড়িষ্যা এবং বাংলার সীমান্ত হিসাবে এই অঞ্চলটি সামন্তদের দ্বারাই শাসিত হয়ে আসছে,···বিরাট ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল এখানেই। সে জঙ্গল মেদিনীপুরের সমস্ত পশ্চিম অংশটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এবং বাংলার সীমান্ত পার হয়ে উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিম ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বের মধ্য দিয়ে মধ্যভারতের পৌরাণিক দণ্ডকারণ্য নৈমিষারণ্যের সঙ্গে মিশে গেছে।···ওদিকে বিহার অঞ্চল থেকে সড়ক

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কবি, পৃঃ ১।

এসে মিশেছে। আবার চলে গেছে মধ্যভারত অভিমুখে উত্তর-পশ্চিমে উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে। অন্যটি চলে গেছে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত—আধুনিক তমলুক অভিমুখে···দক্ষিণভাগে সমুদ্র। পূর্বভাগে সমুদ্র। পশ্চিমভাগে সব অরণ্যভূমি। চাষের জমি কম। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থেরা চাষ করে, গ্রামের আশে পাশে জমি। কতকাংশ লাল মাটি ও কাঁকরে ভরা রাঢ়ের মাটি, কতকাংশ কালো মাটি। চাষীরা চাষ করে কিন্তু খুব বেশি নয়। কারণ সামন্তে সামন্তে বিবাদ লেগেই আছে।

এছাড়া আছে পাইকদের উপদ্রব। পাইকরা এইসব সামন্তদের পাইক, এদেশের আদিম অধিবাসী। বাঁকুড়ায় আছে বাউরী বাগ্দী ডোম।···গুজরাটে শোলাঙ্কীদের বিপর্যয় ঘটল পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অগ্নিবংশীয় বীরেরা পরাধীন হয়ে গুজরাটে বাস করতে চাননি,···ভারতের নানানদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার জন্য। একদল এসেছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তভূমে মেদিনীপুর জেলায়।··· তখন এখানকার বাগ্‌দীরা ডাকাতের দল বেঁধে রাজার রাজ্যে উপদ্রব শুরু করেছিল।···কিন্তু মহারাজা বীরসিং তাদের পরাজিত করে সাতশো জন দুর্ধর্ষ ডাকাতের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।···এর ফলে বাকী বাগ্‌দীরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল।"[১]

শোলাঙ্কীরাই পরবর্তীকালে শুল্কী নামে অভিহিত হয়। এই সকল শুল্কী বাগ্‌দী ছাড়াও 'ছত্রিশ জাতীয়া' নামক অন্য এক সম্প্রদায়েরও বর্ণনা দিয়েছেন 'জঙ্গলগড়ে'। 'সন্দীপন পাঠশালা'য় তারাশঙ্কর মাহিষ্যদের (চাষী কৈবর্ত) নিয়ে লিখেছেন। 'পঞ্চগ্রামে', 'গণদেবতায়' ছুতোর, বাউড়ী, চাষী সদ্‌গোপ ডোম হাড়ি কামার নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছেন। 'পঞ্চগ্রামে' আছে ভল্লাদেরও বিবরণ, "ভল্লা অর্থাৎ বাগ্‌দীর দল :

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : জঙ্গলগড়, পৃঃ ৪-৭।

বাংলাদেশে ভল্লা বাগ্‌দীরা বহু বিখ্যাত শক্তিমান সম্প্রদায়। দৈহিক শক্তিতে লাঠিয়ালির সুনিপুণ কৌশলে বিশেষ করিয়া সড়কি চালনার নিপুণতায় ইহারা এককালে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। এখনও দৈহিক শক্তি ও লাঠিয়ালির কৌশলটা পুরুষ পরম্পরায় ইহাদের বজায় আছে। ডাকাতিটা এককালে ইহাদের গৌরবের পেশা ছিল। ইংরেজ আমলে—বাংলাদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের নবজাগরণের সময় নব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজনেতাদের সহযোগিতায় শাসক সম্প্রদায় বাংলার নিম্নজাতির দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ভল্লাদের সমূল পরিমাণে দমন করিয়াছেন। তবুও ইহারা একেবারে মরে নাই। আজ অবশ্য তাহাদের শক্তির ঐতিহ্য তাহারা অত্যন্ত গোপনে পোষে, মেয়েদের মত ঘাঘরী কাঁচুলী পরিয়া রায়বেশের দল গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়। ক্ষেত্রবিশেষে একটু বেশি পুরস্কার পাইলে দৈহিক শক্তি ও লাঠিখেলায় নিপুণতার কসরৎ দেখায়। সাধারণত এখনও ইহারা চাষী; বাহ্যত অত্যন্ত শান্তশিষ্ট; কিন্তু মধ্যে মধ্যে—বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে কঠিন অভাবের সময় তাহাদের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কয়েকদিন অভাব অভিযোগের দুঃখ ব্যথার কথা বলিতে বলিতে কখন যে ডাকাতির পরামর্শ আঁটিয়া বসে সেকথা নিজেরাও বুঝিতে পারে না। পরামর্শ পাকিয়া উঠিলে তাহারা একদা বাহির হইয়া পড়ে। ভল্লা বাগ্‌দী ছাড়াও অবশ্য এই ধারার সম্প্রদায় আছে; ডোম আছে, হাড়ি আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই শ্রেণীর দল আছে, আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক লইয়া মিশ্রিত দলও আছে।"[১] 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় তারাশঙ্কর কাহারদের পরিচয় দিয়েছেন। বীরভূমের কোপাই নদীর কাছে এদের বসতি। এইসব কাহাররা দৈবে বিশ্বাসী, যখন কোন বিপর্যয় আসে জীবনে, আসে কোন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ৫১-৫২

ব্যতিক্রম, বিচার বুদ্ধিহীন মন তখন দৈবলীলার মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পায়। তাই বেলগাছ, শ্যাওড়া ঝোপ, ব্রহ্মদৈত্যিতলা, কালারুদ্দুর থান—সব দৈবলীলা ক্ষেত্র, দৈব তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। সাঁওতাল পরগণার কোপাই নদীর বন্যায় এরা দুর্দশা ভোগে—অরণ্যের নানা জন্তু জানোয়ারের সাথে লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়, ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক সকল পীড়ন তাদের সহ্য করতে হয়। তবু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে তারা জানে না, কোন দুর্দশার কারণ নির্ণয় তাই তাদের পক্ষে অসম্ভব। এই অন্ত্যজ মানুষের একমাত্র ভরসা 'কর্তাবাবা'। বীরভূমের স্থানীয় কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্যও তারাশঙ্কর তাদের কথোপকথনে বর্ণনা করেছেন, যেমন—

—'ফিরব কেনে ?

—দাহ করতে হবে।

—সে তো আতে করব বলেছি।'[১] কিংবা "সুচাঁদ চমকে উঠেছিল—পাখীকে কথাটা তার বলা হল না, তার বদলে বিস্মিত হয়ে বললে—"ও মাগো থানাদার হাঁক দিচ্ছে ? ইয়ের মধ্যে ? বলি হা বসন ট্যান পুল পেরিয়ে গেল কখন ? -আজ অবিবার, হাঁ মনে পড়ল সুচাঁদের। পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে বললে—তা শ্যাল ডেকেছে পহরের ? শুনেছিস ?"[২] এমনি রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক উপভাষার বৈশিষ্ট্য তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়।

'গণদেবতা'য় লেখক ঐ অঞ্চলের পল্লী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং তাদের সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার বিশিষ্টতাও বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, বৈষ্ণব শাক্ত প্রভাবটি থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটিও

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ৫৬।
১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ৭৪-৭৫।

স্বকীয়তা রক্ষা করে আসছিল। তাই বাংলার সংস্কৃতি মূলতঃ বিভিন্ন সংস্কৃতির একটি মিশ্রিত রূপ—এতে আর্য, অ-আর্য, দুই ধারাই মিলিত হয়েছে, এমন কি হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্ম-সম্প্রদায় ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কতগুলি চিন্তাধারা বা আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উভয় সম্প্রদায়েই সমানভাবে গৃহীত হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। 'গণদেবতা'য় তারাশঙ্কর বীরভূমের গ্রাম, গ্রাম্য সমাজ ও নানা উৎসব-পার্বণমুখর গ্রাম্য সংস্কৃতির সংবাদ পরিবেশন করেছেন। "পাঁচখানা গ্রাম—মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা, এই লইয়া, এককালে হিন্দুসমাজের পঞ্চগ্রাম গঠিত ছিল। তারপর কবে কেমন করিয়া সমগ্র কুসুমপুর পুরাপুরি মুসলমানের গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর হিন্দু সামাজিক বন্ধন হইতে কুসুমপুর দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবুও একটা নিবিড় বন্ধন ছিল কুসুমপুরের সঙ্গে, এককালে কুসুমপুরের মিঞা সাহেবরাই এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। কুসুমপুরের মিঞাদের প্রদত্ত নাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তরের জমি এ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ এবং বহু দেবস্থান আজও ভোগ করিতেছে। আবার কুসুমপুরের প্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটির নিম্নাংশ যে এককালে কোন দেবমন্দির ছিল—সেকথা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। ধর্মকর্ম, পালপার্বণ এবং বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দুই সমাজের মধ্যে লৌকিকতার আদানপ্রদানও ছিল, বিশেষতঃ বিবাহাদি ব্যাপারে দুই পক্ষের সহযোগিতা ছিল নিবিড় ··হিন্দুদের পূজা অর্চনায় পূজার ব্যাপার চুকিয়া গেলে মুসলমানেরা প্রতিমা দেখিতে আসিত, বিসর্জনের মিছিলে যোগ দিত, এককালে মিঞা-সাহেবদের দলিজার সম্মুখ পর্যন্ত বিসর্জনের মিছিল যাইত, মিঞা-সাহেবরা প্রতিমা দেখিতেন, হিন্দুদের জন্য সেখানে তামাকের বন্দোবস্ত থাকিত। মুসলমানের মহরমের মিছিলও হিন্দুদের গ্রামে আসিত, তাজিয়া নামাইয়া তাহারা লাঠি খেলিত, তামাক খাইত।

সেকালের হিন্দুদের পূজা-পার্বণে বাদ্যকর, প্রতিমা বিসর্জনের বাহক, নাপিত প্রভৃতি পরিচালকদের পূজার পর মিঞাসাহেবদের সেরেস্তায় পার্বণী বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের কয়েকবাড়ীতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। পীরের দরগায় হিন্দু বাড়ীর মানসিক চিনিমিষ্টির নৈবেদ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য দেখুড়িয়া কালীবাড়িতে আজিও মুসলমান রোগী আসে।"[১] চাষী মুসলমানদের পাড়ায় কখনো গানবাজনারও বন্দেবস্ত হতো। পাড়ার গানের দলটিই গাইত। এইদল "শ্রমিক ও শ্রমিক চাষীদের গানবাজনার দল, পশ্চিমবাংলায় এই ধরণের দলকে বলে ছ্যাছড়ার দল। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে ধুয়া ধরিয়া গান গাহিতেছিল। মূল গায়েন ইট পাড়াইয়ের ঠিকাদার ওসমান---মূল গানটা গাহিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের বহু প্রাচীন কালের গান।"[২] এই গানের পদও দিয়েছেন ঔপন্যাসিক—

"কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নাহিক হিয়া
চরখার দৌলতে আমার সাতটি বেটার বিয়া।
কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নাহিক পাঁতি
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি।
কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নইক মোরা—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা ঘোড়া।

কিংবা, কালো বরণ মেঘরে পানি নিয়া আয়
আমার জান জুড়ায়ে দে,

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ৩০-৩১।
২। " " পৃঃ ৩৪।

অথবা, ব্যাঙের সাদীর গান,

বেঙীর সাদী দিবরে মেঘ
ব্যাঙের সাদী দিব,
হুড়াহুড়ায়ে দেরে জল
হুড় হুড়ায়ে দে।"[১]

বাংলার পল্লী অঞ্চলে মনসার পাঁচালী, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সুর করে গাওয়া হত "বাউরীপাড়ায় কলরব উঠিতেছে।···ঢোল বাজিতেছে, গান হইতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর পালাগানই বটে। বারমেসে গাহিতেছে—

"আষাঢ়ে পূরয়ে মহী, নবমেঘ জল
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল
সাহসে পসারি লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে
কিছু খুঁদ কুড়া মিলে উদর না পুরে।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গনি
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় পানী।"[২]

গ্রাম্য সংস্কৃতির নানা পরিচয় গ্রাম্য মানুষের উৎসব-অনুষ্ঠান-ধর্মাচরণ ইত্যাদির মধ্যে ছড়িয়ে আছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। কোন সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীর তথ্যকে মিলিয়ে দেখলে তারাশঙ্কর যে যথাযথ সংস্কৃতি চিত্রণ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'গণদেবতা'য় লিখেছেন—

"চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুলগাছটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা, একটি বাসুদেব মূর্তি সেখানে গাছের শিকড়ের বন্ধনে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া আছে, সেইটিই ষষ্ঠীদেবী বলিয়া

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ৩৭।
২। " " পৃঃ ৩১৯।

পূজিত হয়।'[১] 'হরিজন পল্লীর মজলিসের স্থান—ওই ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুলগাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুলগাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল, কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে, ইহা নাকি ধর্মরাজের আশ্চর্য মহিমা। এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া, মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়, বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন।"[২] রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করেই অন্ত্যজ শ্রেণীর নানা উৎসব উদযাপিত হয় এবং দেবতার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। চাষীর গ্রামে নবান্ন উৎসবটি সর্বজনীন উৎসব—"লঘু ধানের চাল হইতে উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গে ঘরে ঘরে হইবে ধানলক্ষ্মীর পূজা।"[৩] এর পর অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির ইতুপূজাও শুরু হয়ে যায়। "অন্যান্য প্রদেশে—বাংলাদেশে বিশেষ অঞ্চলে কার্তিক সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মিত্রব্রত আরম্ভ হয়, শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবিশস্যের কল্যাণ কামনা করিয়া সূর্যদেবতার উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব। দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া সূর্যদেবতার আরাধনার প্রচলন নাই। এদেশে রবিশস্যের চাষেরও বিশেষ প্রসার নাই। ধান চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকর্ম। ইতুপর্বকে এখানে ইতু লক্ষ্মী বা ইতু সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়। হৈমন্ত ধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ প্রারম্ভের পর্ব এটি। চাষীদের আপন খামারে ইহার অনুষ্ঠান হয়। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: গণদেবতা, পৃঃ ৩৯।
২। " : গণদেবতা, পৃঃ ৫৩।
৩। " : " পৃঃ ৬৬।

একটি বাঁশের খুটো পুঁতিয়া সেই খুঁটার তলায় আল্পনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মীর পূজা ভোগ হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় খুঁটিটির চারদিকেই ধানসুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু মহিষ-গুলি ওই খুঁটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে পোয়ালের উপরে পাক দিয়া ফিরিবে। তাহাদের পায়ের খুরে মাড়াইয়ে খড় হইতে ধান মাড়াই হইয়া যাইবে।

এ পর্বের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের সম্বন্ধ বিশেষ নাই, তবে মেয়েরা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করিয়া লক্ষ্মী পাতিবে না। পূর্বকালে আরও খানিকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।··পনেরো বৎসর পূর্বেও লক্ষ্মীপূজার শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা আসিয়া এইখানে সমবেত হইয়া সুপারী হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিত, গ্রামের প্রবীণা কেহ ব্রতকথা বলিতেন, অপর সকলে শুনিত।··এখন দুইতিন বাড়ীর মেয়েরা কোন এক বাড়ীতে একত্রিত হইয়া ব্রতকথা শুনিয়া লয়।"[১] এই অঞ্চলের মেয়েরা ইতুপূজাও করে, ইতুলক্ষ্মীর কাছে কামনা করে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ, তাদের ব্রতকথায়ই এর আভাস পাওয়া যায়।

গ্রাম্যজীবনে পৌষ পার্বণটিও সাড়া জাগায়—এটাও সর্বজনীন উৎসব। এদের একঘেয়ে জীবনে অনেক পরিশ্রমের ক্লান্তি হরণ করে এই উৎসবগুলি "ইতুলক্ষ্মীতে নিয়ম আছে, পালন আছে, পার্বণের সমারোহ নাই। পৌষ পার্বণে ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা পরব। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পাতিয়া চিড়া মুড়কী, মুড়ী, মুড়ীর নাড়ু, কলাইভাজা ইত্যাদিতে পূজা হইয়াছিল, পোষ সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধানকড়ি সাজাইয়া, সিংহাসনের দুইপাশে দুইটি কাঠের পেঁচা রাখিয়া লক্ষ্মীপূজা

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গণদেবতা, পৃঃ ৮৩

হইবে। এক অন্ন পঞ্চাশব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর সঙ্গে নানা দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে।"[১] পোষলক্ষ্মীর ব্রতকথা ও নানা নিয়মের—যেমন মেয়েদের আল্পনা দেওয়া, চণ্ডীমণ্ডপে তিলকুট সন্দেশ দিয়ে ভোগ দেওয়া ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। চৈত্রমাসে ঘেঁটুপূজার সমারোহ—তারাশঙ্কর বলেছেন, "এই ঘণ্টাকর্ণ—ঘেঁটু গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণু বিরোধী শিবভক্ত ঘণ্টাকর্ণ ছিল পিশাচ।... এই একাধারে ভক্ত ও পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার নিম্নজাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। চাল ডাল সিধা মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে।"[২] এই পূজায় গায়ক বাদকেরা গান গায়:

এক ঘেঁটু তার সাতবেটা
সাতবেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত।
মহান্ত ভাইরে
ফুল তুলতে নাইরে
আমার ঘেঁটুরে সাজাইরে।[৩]

এছাড়া বারোমাসে তেরো ষষ্ঠী আছে এই গ্রাম্য জীবনে, "বৈশাখ মাসে চন্দন ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী, আষাঢ়ে বাঁশ ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন বা লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রে চর্পটা বা চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে কালী ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে অখণ্ড ষষ্ঠী সংসারকে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যান। পৌষে মূলা ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোবিন্দ ষষ্ঠী, চৈত্রে অশোকতরু যখন ফুলভারে ভরিয়া উঠে তখন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: গণদেবতা, পৃঃ ১১৯।
২। " " পৃঃ ১৫২।
৩। " " " পৃঃ ১৫৩।

সুখদুঃখ মুছিতে আসেন মা অশোক ষষ্ঠী। তাঁরই কল্যাণস্পর্শে আনন্দে সুখে ওই ফুলভরা অশোক গাছের মতই সংসার হাসিয়া উঠে। অশোকের পর আছে নীল ষষ্ঠী। গাজন সংক্রান্তির পূর্বদিন।"[১]

অশোক ষষ্ঠীর পর গাজন উৎসব—"গাজনের ভক্তের দল বাণ গোঁসাই লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা সাধিতে যায়"···চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন নীল ষষ্ঠী। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও মেয়েদের যাহাদের নীলের মানত আছে, তাহারা ষষ্ঠীর উপবাস করিবে, পূজা করিবে, সন্তানের কপালে ফোঁটা দিবে। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ এদিনে নাকি লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লীলাবতীর কোল আলো করিয়া নীলমণির শোভা। নীল ষষ্ঠী করিলে, নীলমণির মত সন্তান হয়।" ·· চড়ক পাটা বাহির হইয়াছে, ঢাক বাজাইয়া ভক্তরা গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে। একটা লোহার কাঁটায় কণ্টকিত তক্তার উপর একজন ভক্ত শুইয়া থাকে।···গাজনের উপবাস প্রায় সর্বজনীন। বাউড়ীবায়েন হইতে উচ্চতমবর্ণ ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আজ প্রায় সকলেরই উপবাস।···সন্ধ্যায় গাজনের পূজা শেষ। চড়ক শেষ হইয়াছে। ভক্তদের আগুন লইয়া ফুল খেলাও হইয়া গিয়াছে। বলি হোমও হইয়া গিয়াছে।·· ঢাকীর দল প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকের বাজনার কেরামতি দেখাইতেছে। বড় বড় ঢাক, ঢাকের মাথায় দেড়হাত লম্বা পালকের ফুল। এ ঢাকের আওয়াজ প্রচণ্ড"[২]। তাছাড়া অম্বুবাচী, রথযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠান তো আছেই। "হিন্দুসমাজের সর্বত্র বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ আকারে রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগৃহে আজ জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গণদেবতা, পৃঃ ১৯৪।

২। " " " পৃঃ ২৪২—২৪৬।

বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হইবে। আমকাঁঠালের সময় আমকাঁঠাল, ভোগের একটি অপরিহার্য উপকরণ। ধনী জমিদারদের অনেকেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রথ আছে···এই রথে শালগ্রাম শিলা অথবা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরীর অনুকরণে রথ টানা হয়।··· বৈষ্ণবদের মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সংকীর্তন হয়···বাংলার চাষীদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী, তাহারা এই পর্বটি বিশেষ আগ্রহে পালন করে।"[১] অম্বুবাচী উৎসবটিও চাষীদের জীবনে বিশেষ অর্থবহ,- "অম্বুবাচীতে বর্ষণ হইয়া যদি কাড়ান লাগে, তবে সে অতি সুলক্ষণ—ঋতুমতী ধরিত্রীর মৃত্তিকা জলে ভিজিয়া অপরূপ অপূর্ব হইয়া উঠে। অম্বুবাচীর তিনদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল। অম্বুবাচীতে চাষীদের মধ্যে কুস্তী প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলতি ভাষায় ইহাকে বলে 'আমুতির লড়াই'। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সমারোহের বস্তু। চাষের পূর্বে চাষীরা বোধহয় শক্তি পরীক্ষা করে। এ অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া, বিভিন্ন স্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চাষীরা—যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত যোগ দেয়। ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়, সেই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তবে শক্তি চর্চায়, শক্তি প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশি।"[২] তারাশঙ্কর এইভাবে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে রাঢ়ের বিচিত্র জনগণের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। কাহারদের জীবনেও এমনি উৎসবের সাড়া জাগে নানা ঋতুতে—ছেলে-ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসের ভাঁচু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চগ্রাম, পৃঃ ১—২

২। " " : গণদেবতা, পৃঃ ২৬৫-২৬৬।

দশভুজার পূজোয় গায় পাঁচালী, কার্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত। তখন গান-বাজনা আসে ঢিমিয়ে, ধানকাটা, ফসল তোলার সময়। চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের বোলালের গানের পালা। চৈত্রসংক্রান্তির গাজন উৎসবে কাহারদের নিয়ম-নিষ্ঠার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। "বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বক পক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুল্কো ডাঁটির মাথায় চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁসি বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মৌ মৌ করে বাবা কালারুদ্দুর থান ; পাটাগণে অর্থাৎ পাট-অঙ্গনে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের দণ্ড, গলায় উতুরী অর্থাৎ উত্তরীয়, পরনে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'তিপুণ্ড'ক, রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেইধেই করে নাচে। হাড়ি-ডোম-বাউড়ী-কাহার যার ইচ্ছে বাবার ভক্ত হতে পারে।···গজাল পেটা চড়কপাটার উপর শুয়ে আছে, শিবভক্ত বনওয়ারী। ষোলজন ভক্তের কাঁধের 'সাঙ' অর্থাৎ বাঁশের ডাণ্ডার উপর চড়ক চলেছে—ঘুরছে বন্ বন্ বন্ বন্—বন্ বন্।"[১]—কাহারদের বিবাহ উৎসবেরও বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর এইসকল অন্যান্য লৌকিক উৎসবের সঙ্গে।

'কালান্তর' উপন্যাসে রাঢ়ের ধর্মপূজার বর্ণনা পাই—"যোগীপুরে ধর্মরাজের বৈশাখী পূর্ণিমা পর্বের শেষদিন। তিথিতে পূর্ণিমা। এই দিনের সমারোহ চরম। এ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রাম থেকে লোক ভেঙ্গে আসে···ঢাকীরা এখানে ধর্মরাজের কাছে মানত শোধের জন্য আসে। রাঢ়বঙ্গের ঢাক বাজনা বিখ্যাত, সে খ্যাতির মূল্য বোঝা যায় এখানে, এই সময়, যেমন বড় এবং পালকের ঝালর এবং রঙীন ছিটের সাজসজ্জা তেমনি ধ্বনি। এক একটা ঢাকে যেন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃঃ ১৮৩

বর্ষার মেঘগর্জনের প্রতিধ্বনি ওঠে।"[১] এখানে ধর্মপূজাকে উপলক্ষ করে লেখক রাঢ়বঙ্গের বিখ্যাত ঢাকীদের প্রসিদ্ধির কথা বলেছেন। রাঢ়-বাংলার পল্লী অঞ্চলে কবিগান, কবিয়াল, ঝুমুর ইত্যাদির কদর ছিল সেকালে। 'কবি' উপন্যাসে সেই সব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে—"বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি।"[২]

ঝুমুর দলের বর্ণনা দিয়েছেন বসনের পরিচয় দিতে গিয়ে—"ঝুমুর দলের মেয়ে সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালা গানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে।"[৩] এই ঝুমুর দলের আসরের বর্ণনাটিও নিখুঁত—"ঢোল, ডুগি, তবলা, হারমনিয়ম একটা বেহালা লইয়া ঝুমুর দলের পুরুষেরা আসর পাতিয়া বসিল। তাহাদের তেলচপচপে চুলে বাহারের টেরী, গায়ে রঙচঙে ছিটের ময়লা জামা, মেয়েদের গায়ে গিল্টির গহনা—কান, ঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ী, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাসানের বডিস, রঙিন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকর্ষ ভঙ্গি। ঠোঁটে, গালে, লাল রঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নোর প্রলেপ।"[৪] এরা খেমটা অনুকরণে নাচে ও গায়। মেয়েরা প্রথমে গায়—মেয়েদের পরে দোয়ারেরা সেই গান পুনরাবৃত্তি করে, মেয়েরা তখন নাচে, এরা "ভ্রাম্যমাণ নাচ-গানের দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কালান্তর, পৃঃ ২২৮
২। " " কবি, পৃঃ ১৮।
৩। " " " পৃঃ ৭৮।
৪। " " " পৃঃ ৮৪।

করিয়া বেড়ায়—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। কবে কোন্ পর্বে কোথায় কোন্ মেলা হয়, কোন্ পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হয়—সে সব ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ, পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে, ট্রেনে, নৌকায়, নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাড়ী ফেরে।"[১] এই ঝুমুর দলের প্রাচীন ইতিহাসও তিনি পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলেন। অন্যত্র বলেছেন—"ঝুমুরদল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লার-পুরের ঝুমুরদল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে এরা বংশানুক্রমিক ভাবে বাস করছে। ঝুমুরদলের মেয়ে, ঝুমুরদলে নাচে—তার মেয়ে, তার মেয়ে নেচে আসছে। গেয়ে আসছে। এরা পদাবলী জানে, খেউড় জানে। আবার আধুনিক খেমটা টপ্পাও জানে। মল্লারপুরে ঝুমুর দলের একটি পাড়াই আছে। আজকাল হয়তো লুপ্ত হয়ে গেল বা গেছে। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশি, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনীয়ার দল ছোটবড়—ভালমন্দ নির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন করে দেশে ফিরত। এই ছোটবড়দের মধ্যে ছোটরা প্রচার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদিরসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়। তারপর হিন্দুমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্মবাদ দিয়ে নিছক নাচগানের দলের পরিণতিতে পৌঁছল। ফোঁটা তিলক মালা ফেলে কেশবিন্যাস হল স্বৈরিনীর উপযোগী···তবুও আজও এরা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহাপ্রভুর বন্দনা না করে গান শুরু করে না।"[২]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: কবি পৃঃ ১৪০।
২। " " : আমার সাহিত্য জীবন (২য় খণ্ড) পৃঃ ২৯—৩০।

বৈষ্ণব সংস্কৃতি ঃ

নান্নুর ও কেন্দুবিল্ব বীরভূমের বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল। তারাশঙ্করের 'রাধা', 'রাইকমল' বৈষ্ণবসাধনসূত্রকে অবলম্বন করে রচিত। অন্যান্য উপন্যাসেও বিভিন্ন বৈষ্ণবভাব সম্বলিত ধ্যানধারণা চিত্রণে ঔপন্যাসিকের এই ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ণ পরিচিতি লক্ষ্য করা যায়। নিবিড় পল্লীগ্রামের শান্তসুশীতল ক্রোড়ে ছায়ানিবিড় আখড়াগুলির স্মৃতি, তাঁকে উপন্যাস রচনাকালে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'রাইকমল', 'রাধা' প্রভৃতি উপন্যাস রচনাকালে তারাশঙ্কর বৈষ্ণবীয় দর্শন এবং বৈষ্ণবসমাজের সাধনতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসসমৃদ্ধ বীরভূমের মহিমাকীর্তন করেছেন। বীরভূমের বৈষ্ণবীয় ভাবধারা এই দেশের ভূ-প্রকৃতিকে কিভাবে আপ্লুত করে রেখেছে তার পরিচয় আছে 'রাইকমলে'।

"পশ্চিমবাংলার রাঢ়দেশ। এদেশের মধ্যে অজয়নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত 'কানুবিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এমনকি যেদিন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু' হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিনেরও অনেককাল পূর্ব হইতে এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা ধীর সমীরে যমুনাতীরে যে বাঁশি বাজে তাহার ধ্বনি শুনিয়াছে। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন ফাঁদে শ্যামশুক-পাখী ধরিয়া হৃদয় পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে তখন হইতেই জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষেও জানিত, 'সুখদুঃখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পীরিত, দুখ যায় তার ঠাঁই'।

লোকে কপালে তিলক কাটিত, গলায় তুলসীকাঠের মালা ধারণ করিত। আজও সে তিলকমালা তাহাদের আছে, পুরুষেরা শিখা রাখিত। আজও রাখে, মেয়েরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধিত।...

আজও রাত্রে বাঁশীর স্বর শুনিলে এ অঞ্চলের একসন্তানের জননী যাহারা তাহারা আর জল গ্রহণ করে না। পুত্রবিরহবিধুরা যশোদার কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায়। হলুদমণি পাখী—বাংলাদেশের অন্যত্র তাহারা 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে, এখানে আসিয়া তাহারা সে ডাক ভুলিয়া যায়—'কৃষ্ণ কোথা গো' বলিয়া ডাকে।

অধিকাংশই চাষীর গ্রাম। দশবিশখানা গ্রামের পরে দুই একখানা ব্রাহ্মণ ও ভদ্র সম্প্রদায়ের গ্রাম পাওয়া যায়। চাষীর গ্রামে সদ্‌গোপ-রাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা তিলক ধারণ করে, হাতজোড় করিয়া কথা বলে, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা 'রাধেকৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়, বৈষ্ণবরা খোলকরতাল লইয়া আসে, বৈষ্ণববৈষ্ণবীরা একতারা খঞ্জনী লইয়া গান গায়—পুত্রশোকাতুরা যশোদার খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব আখড়ায় পদাবলী গান হয়। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্তন হয়, ঘরের খাড়া বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিক পাখি রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাধা, গোপীভজ বলিয়া ডাকে। লোকে শখ করিয়া মালতী মাধবী ফুলের চারা লাগায় প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে · এই অঞ্চলে চাষীদের ছোট একখানি গ্রাম। মাটির ঘর, মেটে পথ, পথের দুইধারে পতিত জায়গায় ভাঁটি ফুল ফোটে, কস্তুরী ফুল ফোটে, নয়নতারা অর্থাৎ লালসাদা ফুল চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকে, অজস্র 'বাবুরি' অর্থাৎ বনতুলসী গাছের জঙ্গল হইতে তুলসীর গন্ধ উঠে। ছোট ছোট ডোবায় মেয়েরা বাসন মাজে, কাপড় কাচে, পাড়ের উপরে বাঁশবনে সকরুণ শব্দ উঠে, কদম, শিরীষ, বকুল, অর্জুন, আম জাম, কাঁঠালবনে ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া পাখি ডাকে।"[১]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রাইকমল পৃঃ ১—৪

বলাবাহুল্য এই বৈষ্ণবভাবের লীলাক্ষেত্র গ্রামখানি বীরভূমেরই কোন একটি গ্রাম। তারাশঙ্করের এ বর্ণনা তুলনাহীন—'কানুরাই'র ভাবটি এই গ্রামের পশু পাখী বৃক্ষলতা পুষ্পপত্র ও মানুষকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে মনে হয়। সুতরাং এই গাঁয়েরই সাধারণ বৈষ্ণবকন্যা রাইকমলের প্রেমে রাধাভাবেরই দ্যুতি বিচ্ছুরিত হবে তাতে আশ্চর্য কি। তাই পার্থিব প্রেমে অর্থাৎ রঞ্জনের প্রেমে বঞ্চিত হয়ে রাইকমল চিরবিরহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। 'যে মালা শ্যামরায়ের গলায় শোভমান সেই মালা মোড়লপুত্রের গলায় পরাতে গিয়ে আপন ভাগ্যদেবতার হাত থেকে রাইকমল যে রূঢ় আঘাত পেল তাই রাইকমলকে ঘর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এল অপার্থিব প্রেমকে অমর্ত্যলোকে পৌঁছে দিতে।' এই অপার্থিব প্রেমসাধনায় রাইকমল অনেক বাধা পেলেও অবশেষে গৃহত্যাগে সমর্থ হল।

"কমল পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথ—অজয়ের কূলে কূলে পথ। ঘাট, মাঠ, মাঠের পর গ্রাম।··· বৈষ্ণবী পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলে।···হাটে বাজারে বৈষ্ণবী গান গায়। রসিক শ্রোতার দল নানা প্রশ্ন করে। বৈষ্ণবী মিষ্ট হাসি হাসিয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দেয়। শ্রোতারা হাসিয়া বলে, বোষ্টমীর গান যেমনি মিষ্টি হাসিও তেমনিই মিষ্টি। বৈষ্ণবী হাসিয়া উত্তর দেয়, বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু।"[২]

'রাধা' উপন্যাসেও বীরভূমের প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে— "কৃষ্ণদাসী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ ধরলে. চারিপাশে পাতলা শালবনের

১। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় : রাইকমলের ভূমিকা (তারাশঙ্কর রচনাবলী, ৩য় খণ্ড) পৃঃ ॥০।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রাইকমল পৃঃ ১৩৪।

ভিতর মাঝে মাঝে খানিকটা খানিকটা চাষের ক্ষেত। তারই আলের উপর দিয়ে, শালবনের ভিতর দিয়ে পায়ে চলার পথ গঞ্জ বাজারকে বেড় দিয়ে চলে গেছে। ঐ পথ ধরে কৃষ্ণদাসী মেয়েকে নিয়ে এক নির্জন ঘাটে গিয়ে নামবে। বাঁয়ে বোলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত শালবনের এলাকাটা পার হয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। বনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে ঐ গাড়ির রাস্তাটি। ঐ রাস্তায় সারিবন্দী গোরুর গাড়ি চলছেই। ধান আর চাল, চাল আর ধান উত্তর দিক থেকে আসে এই ইলামবাজর জনুবাজার গঞ্জে।"[১] এখানেও ইলামবাজারের সদরঘাট ও তার সন্নিহিত বনের কথা—অজয়ের দক্ষিণে সেই বন যে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে সাঁওতাল পরগণার অরণ্যভূমির সঙ্গে মিশেছে—তারই বর্ণনা। এই দক্ষিণ বাদশাহী সড়ক পেরিয়ে দামোদরের ধার পর্যন্ত চলেছে জঙ্গল। এরপর নদীর ওপারে জঙ্গল। একদিকে বাঁকুড়া জেলা অতিক্রম করে চলে গেছে মানভূম হাজারিবাগের দিকে -অন্যপথে মেদিনীপুর হয়ে উড়িষ্যা সীমান্ত ধরে নাগপুরের দিকে। এই ইলামবাজারের প্রান্তদেশে অবস্থিত অজয় এবং এর ক্রোশ তিনেক দূরে কেন্দুলী। অজয়তটে কেন্দুবিল্বের কদম-খণ্ডীর ঘাট ইতিহাস-বিখ্যাত। কারণ কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতী এখানে নিত্য স্নান করতেন, তাই স্থান মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হয়েছে এই কেন্দুলী। 'রাধা' উপন্যাসে স্বকীয়া, পরকীয়া সাধনতত্ত্ব, গীতগোবিন্দের শৃঙ্গার রসের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশিষ্ট দিক আলোচিত হয়েছে। 'রাধা'র স্থান যে কৃষ্ণ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয় একথা স্বীকার করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভগবৎসাধনায় রাধাভাবের গুরুত্বকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে রাধাহীন শ্যাম ও রাধাশ্যামের দ্বৈত রূপের উপাসনার দ্বন্দ্ব

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রাধা পৃঃ ৯।

উপস্থাপিত হয়েছে এবং পরিণামে রাধাকে নিয়েই শ্যাম মর্যাদালাভ করেছেন।

'স্বর্গমর্ত্য' উপন্যাসেও এই অঞ্চলেরই বর্ণনা। "অঞ্চলটাই অবশ্য বৈষ্ণবভাবের দেশ। অজয়ের কূল ধরিয়া পশ্চিমে জয়দেব কেঁদুলী হইতে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অঞ্চলটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণবদের দেশ।···শুধু তাই নয় বৈষ্ণবভাবের নব অভ্যুত্থানের পর এখানে মহাজন ভক্ত দলে দলে যেন মিছিল করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অজয়ের দশ-ক্রোশের মধ্যে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর উত্তরে একচক্র মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। কাছাকাছি বীর-চক্রপুরকে লোকে বলে গুপ্ত বৃন্দাবন। এ অঞ্চলে প্রতি পাঁচখানি গ্রামে একটি করিয়া বৈষ্ণবের আখড়া।"[১] ব্রজদাসীর চরিত্রেও যথার্থ বৈষ্ণবীয় ভাবের পরিস্ফুটন হয়েছে। সেই কৃষ্ণ ভজনের আনন্দে নির্লিপ্ত থাকায়ই সে পরের কলঙ্ক মাথায় তুলে নিয়েছে এবং বাৎসল্যরসে অন্তর পরিপ্লুত করে সেবা করেছে। বৈষ্ণবধর্ম বা বৈষ্ণবীয় আচরণে পরবর্তীকালে যে আচার ভ্রষ্টতা প্রবেশ করেছিল তারও ইঙ্গিত আছে। নরোত্তম দাস বাবাজী বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণবের ভাব তার মধ্যে বিকশিত হয়নি। কারণ সুন্দরী নারীর দেহ ভোগলিপ্সাকে দমন করার সংযম তার চরিত্রে নেই, তাই নিজের কামনা চরিতার্থ করে অন্যের উপর সেই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। বরং সেদিক থেকে ব্রজদাসীর চরিত্রে বৈষ্ণবধর্মসুলভ ত্যাগ, নম্রতা, বিনয় ও স্নেহকোমল বাৎসল্যরস বিকাশলাভ করেছে—সাধনপথে অগ্রসর হয়ে সে এই বিশুদ্ধতাটুকু লাভ করেছে। 'স্বর্গমর্ত্যে' বৈষ্ণব জীবনযাত্রা আখড়া ও ঠাকুরবাড়ির বর্ণনা ছাড়াও বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব সম্পর্কেও লেখক নানা আভাষ দিয়েছেন। অবশ্য অন্ত্যজবাসী বাগ্দী সমাজের জীবনযাত্রার চিত্রও বর্ণিত হয়েছে সুন্দরভাবে।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: স্বর্গমর্ত্য পৃঃ ১৫—১৬।

এদের একজন তন্ত্রসাধনা করতে গিয়ে কিভাবে চিন্তাশক্তির ভারসাম্য হারিয়ে অর্ধসাধকে পরিণত হয়েছিল, তারও বর্ণনাটি স্মরণযোগ্য। এই বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাবেই তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে বারবার আউল-বাউল-বৈষ্ণব-চরিত্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—নানা স্তরের, নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ঘুরে ফিরেই তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে। 'শুকসারী কথা'র ফটিক বৈরাগী 'চৈতালী ঘূর্ণি'র সুবল, 'আরোগ্য-নিকেতনে'র মরিবৈষ্ণবী, 'ভুবনপুরের হাটে'র বৈরাগী—বৈষ্ণবী চরিত্রগুলি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

শাক্ত ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব :

শাক্ত এবং তান্ত্রিক সংস্কৃতিও রাঢ়ের জনজীবনে অন্য একটি বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল। রাঢ়ে তন্ত্রপীঠের সীমাসংখ্যা নেই, তন্ত্রধর্মে, শাক্তধর্মে দীক্ষিত মানুষের সংখ্যাও অনেক। তারাশঙ্করের বাসভূমি বীরভূম জেলায় তন্ত্রপীঠ যেমন ছিল তেমনি ছিল নানা-সাধুসন্তের আনাগোনা। তারাশঙ্কর ব্যক্তিগত জীবনে এসব সাধুসন্তের যে সঙ্গলাভ করেছিলেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকথায় বলেছেন বিস্তৃতভাবে। নিজে শাক্তমতাবলম্বী হওয়াতে এই ধর্ম, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁরও আগ্রহ কিছু কম ছিল না। সাহিত্যে নানাসূত্রে তাই এই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ বা ধর্মপীঠের, ফুল্লরাপীঠের, তারাপীঠের বিবরণ তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন কারণে-অকারণে এই সকল বিচিত্র শাক্ত, তান্ত্রিক মানুষ ও সাধুসন্তকে।

'ধাত্রীদেবতা'র রামজী সাধু তেমনি এক সাধু যার সঙ্গলাভ ঘটেছিল ব্যক্তিগত জীবনে। এই রামজী সাধুর বর্ণনাকালে তিনি তাঁর আশ্রমের পরিবেশটিও বিস্মৃত হয়ে যাননি। "নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা আশ্রম—বহুকালের প্রাচীন তন্ত্রসাধনার স্থান। রামজী সাধু সদা

প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে বসিয়াছিলেন।"[১] 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ রামজী সাধুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই সাধুটি "পনেরো-ষোল বৎসর পূর্বে একদিন এই গ্রামের মহাতীর্থস্থল মহাপীঠ বলিয়া খ্যাত অট্টহাস দর্শনে আসিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। কৃষ্ণদাসবাবু তাঁহার ওই শখের দেবীবাগে সন্ন্যাসীর জন্য আশ্রম তৈয়ারী করিয়া দিয়া তাহাকে স্থাপন করেন। বাগানের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাও এই সন্ন্যাসী বন্ধুর প্রেরণায় ও প্রয়োজনে।"[২]

'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের তন্ত্র সাধনার উল্লেখ করে বলেছেন ইনি সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। শ্মশানে কালীপূজা করতেন এবং ঘন জঙ্গলের ভিতর বটগাছতলায় ছিল তাঁর আসন। 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে আছে ভৈরবী ও তার শক্তি-পূজার কাহিনী লোহার ত্রিশূল ও রক্ত রাঙা তন্ত্রচক্র নিয়ে তিনি যজ্ঞ করতেন। মাকালীর মতই কামনা, বর্বরতা, পশুত্বকে দমন করতে তার রণরঙ্গিনী রূপটি মূর্ত হয়েছিল—শক্তি সাধনা করতেন তিনি এই শক্তিলাভের জন্যই। "জঙ্গলগড়ে" আছে তান্ত্রিক দেবী মা শঙ্করীর মহিমার কথা—ইনি সাক্ষাৎ দুর্গাচণ্ডী চামুণ্ডা। তাই দুর্গোৎসবের সময় শাক্তমতে বলি হয়, পূজা হয়, এ অঞ্চলের বাগ্দী চুয়াড়রা এসে 'কারণ' করে—নাচ গানে উৎসবের সুরু হয়। এছাড়া আরো অনেক উপন্যাসেই দেবী অট্টহাসের মাহাত্ম্য, ফুল্লরা দেবীর শক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। 'কালান্তরে'ও স্বগ্রামের অট্টহাস দেবীমন্দিরের উল্লেখ করেছেন—"এককালে নাকি অট্টহাসই ছিল এখানকার আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ। দেশ দেশান্তর থেকে যাত্রী আসত। সেই থেকে সেকালে একটি

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: ধাত্রীদেবতা: পৃঃ ৮২
২। পৃঃ ১৯—২০

নতুন বসতির সৃষ্টি হয়েছিল।"[১] যোগভ্রষ্ট উপন্যাসে গ্রামের শক্তি-পীঠের প্রসঙ্গ এনেছেন—সীতারাম সাধুর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'তামস তপস্যা' উপন্যাসে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী-চরিত্র ও তন্ত্রসাধনার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে।

"নদী পার হইয়া ওপারে আরও ক্রোশ খানেক দক্ষিণে একটি বনজঙ্গলে ঘেরা কালীমন্দির আছে।·· বহুকাল থেকে ওই স্থানটি শ্মশানেশ্বরী আশ্রম নামে এ অঞ্চলে বিখ্যাত।···লোকে বলে—প্রাচীনকালে এখানে কোতল ঘোষের বিখ্যাত তান্ত্রিকেরা শব সাধনা করিতেন। কতজন এখানে সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। ক্রমে দেশ নাকি ধর্মহীন হইল, ম্লেচ্ছাচারের প্রভাবে তান্ত্রিকবংশের মতিগতি অন্যদিকে ফিরিল, শ্মশানেশ্বরীর আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল।··· শ্মশানেশ্বরী আপনমনে খেলা করিতেন, শেয়াল, শকুন, সাপ তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত ; নানাধরণের পাখী কলরব করিত ; ফুল ফুটিত, ফল ধরিত, বীজ ফাটিত, নূতন চারাগাছ পাতা মেলিত, রাত্রে নাকি মহাকালীর সঙ্গে নাচিত ভূত-প্রেত-প্রেতিনীর দল।"[২] এখানেই ঠেঙো গোঁসাই নামে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, ভণ্ড এক ভৈরব এবং নমো-নারায়ণ-বাবা একের পর এক আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সকল সাধু—সে শাক্ত হোক বা বৈষ্ণবই হোক, 'নিশিপদ্ম', 'বসন্তরাগ' প্রভৃতি উপন্যাসেও চিত্রিত হয়েছে। ধাত্রীদেবতায় তারাশঙ্কর বীরভূমের গ্রামের শাক্ত ও তন্ত্র পূজার অন্য একটি উদ্দেশ্যেরও উল্লেখ করেছেন। এখানে মহামারীতে মহাকালীর পূজা হয়, রাক্ষসী মহামারীকে দেবী বিতাড়িত করে দেন তার শক্তি বলে। "সকাল হইতে ঢাক বাজিতেছে দুপুর বেলায় আসিল সানাই ও ঢোল। মধ্যে মধ্যে সমবেত বাদ্যধ্বনিতে ভাবীপূজার বার্তা ঘোষণা করিতেছে। দিনের বেলায়

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কালান্তর পৃঃ ২৪।

২। " " তামস তপস্যা : পৃঃ ১৭৩

মহাপীঠে পূজা বলি হইয়া গেল। তান্ত্রিক অক্ষয় লাল কাপড় পরিয়াছে, কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ফোঁটা কাটিয়া লোকের বাড়ি বাড়ি আতপ সন্দেশ সুপারি পৈতা সিঁদুর পয়সা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে।··প্রত্যেক গৃহস্থের একজন নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিয়াছে, রাত্রে পূজা ও বলি হইয়া গেলে তবে তাহারা জলগ্রহণ করিবে।"[১] এই পূজায় পাঁঠা বলিরও ব্যবস্থা আছে। এসব দেখে সুশীল শিবনাথকে বলছে—"আপনাদের এখানে অনেক তান্ত্রিক আছেন না? তন্ত্রের মধ্যে একটা ভয়াল রোমান্টিসিজম আছে··· গাঢ় অন্ধকার, জনহীন মৃত্যুবিভীষিকাময়ী শ্মশান, শবাসনে বসে— উঃ আমার শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছে।

"আমাদের দেশটাই হল তান্ত্রিকের দেশ, এককালে তন্ত্রসাধনার মহা সমারোহ ছিল আমাদের দেশে।"—শিবনাথ গৌরবের হাসি হাসিল।"[২] শিবনাথের এই গৌরব তারাশঙ্করেরও গৌরব। তিনি তাঁর দেশের এই ধর্মসংস্কৃতির জন্য যথেষ্ট গৌরববোধ করতেন, তাই এই তন্ত্র, তান্ত্রিকসাধু, তন্ত্র-সাধনা ও শাক্ত-ধর্মের মহিমাটি সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বীরভূমে এই লৌকিক, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের ধারা সমান্তরাল-ভাবে প্রবাহিত হয়ে রাঢ়ের জনজীবনকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করেছে। এই ধর্মসংস্কৃতিগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, কোনটিই অন্যটির দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তারাশঙ্করের উপন্যাসেও এই ত্রিধারা প্রবাহিত হয়েছে, জনতা ও জনপদ সহ আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির সার্থক সমাবেশ ঘটেছে।

রাঢ়ের অন্য আর একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করলে এই লোকসংস্কৃতির বিবরণ পূর্ণাঙ্গ হবে না। "পশ্চিমবাংলায়

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ধাত্রীদেবতা পৃঃ ১১২।
২। " " ঃ ধাত্রীদেবতাঃ পৃঃ ১.৩।

বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলের মেলাগুলো পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের জীবন্ত আলেখ্য। তারাশঙ্করের মত মেলার এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ একটা কেউ দিতে পারেননি।"[১] বাস্তবিকই সাংস্কৃতিক জীবনে এই মেলার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কারণ এক একটি মেলায় বিশেষ অঞ্চলের জনসমাবেশের মধ্যে সে অঞ্চলের বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যময় ধ্যানধারণা, ধর্ম-সংস্কৃতি, আমোদ-আহ্লাদ ইত্যাদির প্রকাশ স্পষ্ট-রূপে অনুভব করা যায়। বাংলার লোকসংস্কৃতির উৎস পল্লীজীবন, তার প্রকাশ পল্লীর পূজাপার্বনে, মেলায়, উৎসবে। তারাশঙ্কর নিজে রাঢ়ের অনেক মেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে উপন্যাসেও এই স্বাক্ষর রেখেছেন।

'কবি' উপন্যাসে চামুণ্ডার পূজা উপলক্ষে মেলা ও রাসের মেলার বর্ণনা আছে। "আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও তুই মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে···কেবল আলো, আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্যসম্ভার ভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক—লোক আর লোক, মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর—যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর। চারি পাশে কাতারে কাতারে দর্শক।"[২] রাসোৎসবের মেলায় "একটি প্রকাণ্ড দীঘিকে মাঝখানে রাখিয়া দীঘির চারিপাশে মেলা বসিয়াছে। রাসপূর্ণিমার রাসোৎসবের মেলা, দীঘির পূর্বদিকে রাধাগোবিন্দের

১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য: তারাশঙ্কর ও রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি (কালি কলম তারাশঙ্কর স্মৃতিসংখ্যা) পৃঃ ৫৪২।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: কবি, পৃঃ ১০৮।

মন্দির, পাশেই সেবাইত বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া"[১] চড়কের মেলার বর্ণনা আছে 'গণদেবতায়'—"চণ্ডীমণ্ডপ ঘিরিয়া মেলা বসিয়াছে খানবিশেক দোকান। তেলেভাজা, মিষ্টির দোকানই বেশী। বেগুনী, ফুলুরি, পাঁপড় ভাজা হইতেছে। ছেলেরা দলে দলে আসিয়া কিনিয়া খাইতেছে। খানচারেক মণিহারী দোকান। সেখানে তরুণী মেয়েদেরই ভিড় বেশী—ফিতা, টিপ, আলতা, গন্ধ কিনিতেছে। গাছতলায় ছোট আসর পাতিয়া বসিয়াছে তিনজন চুড়িওয়ালী। একটা গাছতলায় বৈরাগীদের নেলোও বসিয়াছে কতকগুলা মাটির পুতুল লইয়া ··বয়স্কেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অলস পদক্ষেপে।"[২] এই গ্রামে রথযাত্রায়ও মেলা বসে—ছোটখাটো মেলা বসে। আশে-পাশের লোকজন ভিড় করিয়া আসে। কাগজের ফুল, রঙীন কাগজে মোড়া বাঁশী, কাগজের ঘুর্ণীফুল, তালপাতার তৈরী হাত পা নাড়া হনুমান, তুমপটকাবাজী, তেলেভাজা, পাঁপড়, বেগুনী, ফুলুরী ও অল্পস্বল্প মণিহারীর জিনিষ বিক্রী হয়।"[৩]

মহাগ্রামে ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রার অনুষ্ঠানেও একটা মেলা বসে। "আগে মেলাটা বেশ বড় হইত। বিশেষ করিয়া লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের টুকরা, বাবুই ঘাসের দড়ি, তৈয়ারী দরজা জানালা এবং কামারের সামগ্রী অর্থাৎ লোহার বড় গজাল, ফাল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারী, হাতা, খন্তা কিনিতে কয়েকখানা গ্রামের লোকই এখানে ভিড় করিয়া আসিত। কিন্তু এখন আর সেসব জিনিষ কেনাবেচা হয় না। স্থানীয় ছুতার কামারেরা এখন সাহস করিয়া এসব জিনিষ মেলায় বিক্রীর জন্য তৈয়ারী করে না। তাহাদের পুঁজির অভাবও বটে, আবার লোকে কেনে না বলিয়াও বটে। একমাত্র

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি পৃঃ ১১৪

২। " " গণদেবতা পৃঃ ২৪৪

৩। " " পঞ্চগ্রাম পৃঃ ১

লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের কেনাবেচা এখনও কিছু হয় এবং বাবুই ঘাস এবং বাবুই দড়িও এখনও কিছু বিক্রী হয়, তবে অন্য কেনাবেচা কম হয় নাই, দোকানপাটও পূর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় আসে, লোকের ভিড়ও বাড়িয়াছে।"[১] তারাশঙ্করের রচনায় বিভিন্ন উৎসবের বিশেষ আকর্ষণসূত্রে এমন নানা মেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মেলাতে বিভিন্ন ধরণের জিনিসের এবং পল্লী অঞ্চলের মানুষের সমারোহের কথা উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু মেলাতে অনুষ্ঠিত নৃত্য-গীত, আমোদ-আহ্লাদের মধ্য দিয়ে লোক সংস্কৃতির রূপটিকেও পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

এইভাবেই আঞ্চলিকতা তারাশঙ্করের উপন্যাসে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করেছে। রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, রাঢ়ের ভূপ্রকৃতি তাঁর অভিজ্ঞতা-জাত ভাবধারাকে কেন্দ্র করে তাঁর রচনায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

"তারাশঙ্কর রাঢ় জনপদের গোটা জীবনকে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। রুক্ষ রাঢ়ভূমি, ময়ূরাক্ষীর বান, ঘেটুর গান, নবান্ন উৎসবের ঢাকের শব্দ, ঘন আঁধারে ডাকাতের সঙ্কেতধ্বনি—সমস্ত মিলে এক চমৎকার পরিবেশ গড়ে উঠেছে, গণদেবতা পঞ্চগ্রামে গোটা সমাজ অবয়ব পেয়েছে, ।

পঞ্চগ্রাম—গণদেবতা জনপদজীবনের প্রথম সামগ্রিক আলেখ্য। গোটা মানুষ, সজীব প্রকৃতির আর সমাজ পরিবর্তনের খরস্রোত চিত্রণে তারাশঙ্করের নৈপুণ্য তাঁকে তাঁর কালের 'ক্রনিক্লার' করে তুলেছে। বাংলা উপন্যাসে এটি নতুন ধারা।"[২]

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পঞ্চগ্রাম পৃঃ ২।

২। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' তারাশঙ্কর সংখ্যা বৈশাখ—আষাঢ় (তারাশঙ্কর রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডের 'পরিশিষ্ট' অধ্যায় থেকে গৃহীত।)

এই নতুন ধারা প্রবর্তনের জন্য বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে, অন্তত এইক্ষেত্রে তাঁর কালজয়ী আসন থেকে যাবে। ভাবীকালের সাহিত্য-রসিকরা এই আঞ্চলিক জীবনের রসমাধুর্যকে যখন আস্বাদন করবেন, রাঢ়ের বিলুপ্ত লোকসংস্কৃতি, রাঢ়ের জনজীবন, রাঢ়ের অজয়, কোপাই আর বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তরের অন্তরঙ্গ বিবরণ তাদের কাছে চিরকালীন আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। রাঢ়ভূমির লোকায়ত কৃষ্টির তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ তারাশঙ্করের উপন্যাস, বিশেষ করে 'কবি', 'রাইকমল', 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' আঞ্চলিক জীবনের রূপে রসে গন্ধে মাধুর্যে ভরপুর। কেবলমাত্র স্বকীয় সাহিত্যমূল্যেই নয়, লোকজীবনের সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসাবে এসব উপন্যাসের চিরন্তন মূল্য অনস্বীকার্য।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

অধ্যাত্ম-চিন্তা

অধ্যাত্ম-চিন্তা বা ঈশ্বর-চিন্তার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের ঐতিহ্যানুরাগী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম রচনাগুলিতে প্রধানত জীবনের ও সমাজের সমস্যাজর্জরিত নানা বিষয়বস্তু অবলম্বন করেছেন তিনি এবং সযত্নে সচেতনভাবে মানবজীবনের বৈচিত্র্য উদ্ঘাটনে আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবচেতন ব্যক্তিসত্তায় ঈশ্বরবিশ্বাসের সূত্রটি বরাবরই প্রচ্ছন্ন ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় ঈশ্বরবিশ্বাস প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাঁর রচনাকে পরিচালিত করেছে। এমন কি কখনো কখনো লেখক মানবজীবনের নানা সুখ-দুঃখ, সমস্যা-যন্ত্রণা, আশা-নৈরাশ্যকে ঈশ্বরবিশ্বাসের অতীন্দ্রিয় ভাবধারায় অনুরঞ্জিত করে বাস্তবজগত ত্যাগ করে ক্রমাগতই ভাবানুভূতিলোকে আশ্রয় অন্বেষণ করেছেন। এতে অবশ্যই বাস্তব-সমস্যার সমাধান হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরানুভূতি দিয়ে বাস্তবজগত থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টায় এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ তিনি পেয়েছেন।

তারাশঙ্করের এই ঈশ্বরবিশ্বাসের জন্ম তাঁর পারিবারিক জীবনে। তাঁর সাহিত্যজীবনের পটভূমিকা বিশ্লেষণকালে গ্রাম্য সমাজের ধর্ম-প্রাণ মানসিকতা, তাঁর পরিবারের ধর্মীয় আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও ভক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারাশঙ্কর যে তাঁর পরিবেশ ও পরিবার থেকেই ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণা পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেকালে দুর্বল জমিদাররা মনোস্কামনা সিদ্ধির আশায় দেবতার দুয়ারে মানত করতেন, নানা ব্যর্থতায় অপমানে লাঞ্ছিত হয়ে দেবতার নিকট সান্ত্বনাভিক্ষা করতেন—বাল্যে তারাশঙ্কর তা

স্বচক্ষে দেখেছেন। এই সমস্ত নানা ঘটনা, গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত নানা বিশ্বাস, ক্রিয়াকর্ম, বিধি-বিধান তাঁর মানসিকতায় তখনই ঈশ্বরবিশ্বাসের পটভূমিকা তৈরী করে রেখেছিল ও পরিণত বয়সে তারাশঙ্করের চিন্তাজগতে এই ঈশ্বরবিশ্বাস বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে তারাশঙ্করের পরিণত বয়সের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করলে, তিনি জীবনে কিভাবে এই ভাব-ধারাকে গ্রহণ করেছিলেন, তার বিচার সহজতর হবে। তারাশঙ্কর লিখেছেন ঃ—

"ঈশ্বরকে মানা নিয়ে আমাকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। এযুগে ঈশ্বরকে না মানাটাই ধর্ম বা যুগধর্ম, এই যুগধর্মটিকে বা ঈশ্বরকে অস্বীকার করার দণ্ডটিকে ধরে বা ওইটেতে ভর দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে একালের মানুষ, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ এ প্রশ্ন করতে পারেন।

আমি আমার সম্পর্কে জবাব দিতে পারি। এ সংসারে আর সকলে যাঁরা ঈশ্বর মানেন, তাঁদের কথা আমি বলতে পারি না। কারণ সংসারে আস্তিক হোক, নাস্তিক হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক, কম্যুনিষ্ট হোক, অকম্যুনিষ্ট হোক, কংগ্রেস হোক, জনসংঘ হোক, স্বতন্ত্র হোক—এদের মধ্যে তুটি মানুষের ধর্মতত্ত্ব দর্শন নামে এক হলেও তার প্রকাশ বা তার উপলব্ধি মানুষের মধ্যে একরকম নয়।

আমি ঈশ্বরকে মানি কারণ সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে সকল বিচারের মধ্যে তিনি আমার হয়ে সত্যকে আবিষ্কার করে দেন, আমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন, এবং সর্ব সময়ে আমাকে বিনত অনুদ্ধত রাখেন। সহ্যের শক্তি দেন, শোকে তুঃখে সান্ত্বনা দেন। আমি তাকে চোখে দেখি না, কিন্তু অন্তরে অনুভব করি। যদি কেউ বলেন এ নিতান্তই একটা আপিং খাওয়া অভ্যাসের মত

একটা অভ্যাস, আপিংয়ের নেশায় যেমন একটা ঝিমুনি আসে, তেমনি ধরনের একটা মানসিক পঙ্গুতাকে বিনয় বলে ভ্রম করি ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে তা নিয়ে মারামারি তকরার করব না। তবে তা মানব না।···আমার ঈশ্বর কোন বস্তু দিয়ে আমার কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না, তবে মনকে এই চাওয়ার দুর্বলতা থেকে রক্ষা করতে শক্তি সঞ্চারিত করতে থাকেন। আমার ঈশ্বর পবিত্র, তাই পবিত্র থাকতে আমি চেষ্টা করি ; আমার ঈশ্বর প্রসন্ন তাই মানুষের প্রতি অপ্রসন্ন হওয়ার আমার অধিকার নেই।···
ঈশ্বর স্বীকৃতির পথে যেখানে অসহিষ্ণুতা যেখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, সেদিক দিয়ে আমার ঈশ্বর স্বীকৃতির পথটি প্রসারিত নয়। ··পূজা, উপাসনা, কিছু কিছু জপ যৌগিক ক্রিয়া এও আমার নিত্যকর্মের মধ্যে আছে, তাতে আমার এই ধারণার পথকে সরল করে, সমতল করে, সহজ করে সম্মুখে প্রসারিত করে এইমাত্র। এখানে বলব এতে আমি বিশ্বাস করি।
আমার ঈশ্বরবিশ্বাসের নীতি অনুসারে আমি কারো থেকে শ্রেষ্ঠ নই, আমি কারো থেকে নিকৃষ্টও নই। আরও বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি মানুষই কোনও না কোনও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বিশ্বাসের ন্যায়ের সঙ্গে আমার বিশ্বাসের ন্যায়ের এমনকি তাঁর সত্যের সঙ্গে আমার সত্যের বিরোধও থাকতে পারে। সেখানে বিরোধটাই ভ্রম এবং দুই সত্য এবং দুই ন্যায়ই সমান সত্য, সমান নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।”[১]

তারাশঙ্কর যে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, এখানে তা স্বীকার করেছেন। এই বিশ্বাস, জপতপ, উপাসনা, যৌগিক ক্রিয়াকর্মের আচরণ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি. চৈত্র ১৩৭৩) পৃ: ৩৮৯—৩৯০।

ইত্যাদি তাঁকে বিপদে দুঃখে-শোকে সান্ত্বনা দেয়, স্থৈর্যবান ধৈর্যবান করে এবং নম্র-বিনীত রাখে। প্রথম জীবন থেকেই যে তিনি পূজাপাঠে অভ্যস্ত ছিলেন তা নয়, এই পূজারও প্রারম্ভিক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন—

"১৯৪৭।৪৮।৪৯।৫০ সনে আমার চিত্ত তখন অত্যন্ত অধীর, নাস্তিক্যবাদ ও আস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্বে তখন ক্ষতবিক্ষত, ঈশ্বর নেই আর ঈশ্বর আছেন—এ নিয়ে কোন প্রশ্ন না তুলে যুগের প্রভাব অনুযায়ী কোন আচরণবাদকে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সম্ভবতঃ, তাই বা কেন, নিশ্চিত রূপেই এ আমার প্রকৃতির বিরোধী। এই চিন্তায় তখন আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটত, এই সময় একদিন ভোরবেলা ঘুমভেঙে বাইরে উঠলাম, রাত্রি তখন সাড়ে চারটা হবে। বাইরে থেকে ফিরে এত ভোরবেলা বলেই আবার শুলাম। তন্দ্রাও এল, এর মধ্যে একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন দেখলাম লাভপুরের বাড়ীতে আমার পিতৃদেব আসনে বসে নিত্য পূজা উপাসনা করছেন। আমি, সে ছোট আমি নয়, বড় বয়সের আমি তাঁর পাশে বসে পূজা দেখছি। আমার বাবার মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিল আটবছর, তবু তাঁর ছবি আজও আমার স্পষ্টই মনে রয়েছে। কতকগুলি বিশিষ্ট ছবির মধ্যে তিনি আমার মনে আঁকা আছেন এবং তাঁর সংখ্যা পাঁচ-সাতটি। তারমধ্যে তাঁর এই উপাসনারত ছবি একটি।… সেদিন দেখলাম তিনি পূজা উপাসনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে বললেন, বাবা, চণ্ডীটি তুমি নিত্য পাঠ করো তো।…স্বপ্ন আমার জীবনে বড় বেশী প্রভাব ফেলে। আমি ভেবে দেখি, কেন এ স্বপ্ন দেখলাম। আমার মা তখন এখানে ছিলেন।…তাঁকে গিয়ে স্বপ্নের কথাটা বললাম। মা বললেন,

বেশ তো বাবা, তুমি তো বই অনেকরকম পড়ে থাক। আর চণ্ডী গীতা বইগুলি তো খারাপ বই নয়। তা পড় না কেন? ভাল না লাগে ছেড়ে দেবে।

এই চণ্ডী ও গীতা পাঠ থেকেই পূজা। পূজায় একটা স্বাদ পেলাম। স্বাদটা যে, দৈনন্দিন জীবনে যেখানে অন্যায় করি, পূজার সময় সেইটেই এসে সামনে দাঁড়ায় এবং আমাকে যেন কোন অদৃশ্য বিচারকের সামনে খাড়া করে দেয়। নিজের বিচার নিজে অল্পবিস্তার প্রায় সকলেই করে, এটি বোধহয় মানব বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ এ বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন আমরা ফৌজদারী উকিলের ওকালতির ধারায় করে থাকি। কিন্তু পূজার আসনে বসে এই ধারাটি যেন বোবা হয়ে যায়, ন্যায় অন্যায়ের বোধ ক্রমশঃ মনের মধ্যে প্রহরীর মত কাজ করে। ক্ষুদ্র একটি মিথ্যাকেও সে প্রশ্রয় দেয় না।

শুধু তাই নয়, আরও কিছু যেন উপলব্ধিতে আসছিল। সুতরাং এই পূজা আমি কোনদিনই বাদ দিইনে।···এই পূজার কল্যাণেই জীবনের সকল কর্মই একদা পূজা হয়ে দাঁড়ায়। এসব তত্ত্ব যার বিচারে যাই হোক, আমার বিচারে সত্য”[১]।

বাল্যকাল থেকে তাঁর পিতার ধ্যানরত মূর্তিটি তারাশঙ্করের স্মৃতিতে অত্যন্ত জাগ্রত ছিল। তিনি স্বপ্নেও পিতার এই বিশিষ্ট রূপটি দেখেন এবং ধর্মাচরণের নির্দেশ লাভ করেন। সুতরাং তাঁর ধর্মাচরণের মূলেও এই পারিবারিক প্রভাবই বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। এছাড়া স্বপ্ন দেখে তা গ্রহণযোগ্য কিনা, এ বিষয়ে তাঁর যদি সামান্যতম দ্বিধা উপস্থিত হয়েও থাকে, তাঁর মা সেইটুকুও মুছে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আমার কথা (শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৭১) পৃঃ ৩—৪।

দেন তাঁকে নিয়মিত গীতা চণ্ডীপাঠের পরামর্শ দিয়ে। এই গীতা চণ্ডীপাঠই ক্রমশ পূজা ধ্যান ইত্যাদিতে বিস্তার লাভ করে এবং তিনি পুরোপুরি জপতপ, পূজা-সন্ধ্যায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তারাশঙ্করের পরিবারজাত, পরিবেশজাত যে ধর্মাচরণস্পৃহা ছিল, একটি বিশেষ স্বপ্নাদেশের ফলে তা দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হল। মানুষের জীবনে সাধারণতঃ স্বপ্নকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্বপ্ন স্বপ্নই এতে নিদ্রিত অবস্থায় অবচেতন মনের নানা চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন ঘটে, সুতরাং বাস্তব জগতে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই।—তারাশঙ্করের অবচেতন মনে ধর্মানুরাগ অনুপস্থিত ছিল না, পিতার ধর্মাচরণের প্রতিও সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ছিল, যা নিদ্রিত অবস্থায় প্রতিফলিত হয়ে উঠল তাঁর স্বপ্নে। এ সম্পর্কে যথেষ্ট মানসিক দুর্বলতা ছিল বলেই এই আদেশ পালন করা নিয়েও প্রশ্ন উঠল তাঁর মনে এবং তিনি গীতা-চণ্ডীপাঠ দিয়ে ধর্মাচরণ শুরু করলেন। এই পূজা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে নাকি সমালোচনাও করেছেন তাঁর—

> "পূজো ? এ যুগে পূজো ? কেন ? এবং কিসের ? এবং সাহিত্যিক কেন পূজো করবেন ?
>
> এর জবাব আমি সেদিন দিইনি। পরে অবশ্য দিয়েছি দুচারজনকে। জবাব আমার এই যে, পৃথিবীতে সাহিত্যিক বলে বিশেষ মানবেতর বা মানবোত্তর কোন জাতি নেই। সেও মানুষ এবং আর সব মানুষের মতই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে উপনীত হওয়াই তার লক্ষ্য। সে কেউ সন্ন্যাসের পথে করেন, কেউ পাণ্ডিত্যের পথে করেন, কেউ বিজ্ঞানের পথে করেন, কেউ সাহিত্যের পথে করেন। পূজা বা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা সবারই আছে, থাকা উচিত, নচেৎ মানুষের সংজ্ঞাটি স্পষ্ট হয় না; আদর্শ নির্মাণে বা কল্পনায় বিভ্রান্তি ঘটে। এই চিন্তাও

নানাজনে নানাভাবে, নানাপথে করেন। পূজা তার অন্যতম পথ, সুতরাং আমি পূজা করি।”[১]

এখানে দেখা যায় মনুষ্যত্বে উপনীত হওয়ার বিভিন্ন পথের মধ্যে এই পথও অন্যতম একটি বলে তারাশঙ্কর দাবী করেছেন। আর অন্যান্য পথ অপেক্ষা এইপথে জগৎ জীবনকে উপলব্ধি করার প্রেরণা তাঁর অধিক ছিল কারণ পারিবারিক পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাঁকে এই পথটি অবলম্বন করার উপযুক্ত করে রেখেছিল আগেই। তাই সকল কর্মকে পূজা হিসাবে এক-নিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রহণ করেই তিনি জীবন-সাধনা বা পরিপূর্ণ-মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী হতে আগ্রহী হয়েছিলেন, এই পূজার আসন অতন্দ্র প্রহরীর মত তাঁর ন্যায় ও সত্যের উপলব্ধিকে বিশুদ্ধ রাখতে পারে—সব কলুষতা গ্লানির অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করে। সেজন্য তারাশঙ্কর এই তত্ত্বকে সত্য হিসাবেই জীবনে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু এই পথটিকে অনুসরণ করা মাত্রই আনুষঙ্গিক আরও অনেক ক্রিয়াকর্ম, আচার অনুষ্ঠান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তারাশঙ্করের জীবনে দেখা দেয়। ব্যক্তিগত জীবনেও নাকি কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায় তখন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ভাবজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়—মার্কসবাদের নাস্তিকতা তখন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে কারণ তাঁর অন্তরে এর বিপরীত প্রশ্নও নূতন উপলব্ধি এনেছে—

“আমার চৈতন্য আমাকে বলে—বুদ্ধির অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আছে। বুদ্ধি যেখানে অন্ধের মত হাতড়ায় সেখানে চৈতন্যই আমাকে চক্ষুর অগোচর, অ-দৃষ্ট অনেক

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি ১৩৭১ কার্তিক) পৃঃ ৩—৪।

কিছুর আভাস দেয়। বুদ্ধি অঙ্ক কষে যে উত্তর বলে দেয় বুঝিয়ে দেয় কেমন করে এ উত্তর পাওয়া গেল এবং সে উত্তরের সঙ্গে মিলিয়েও দেয় জগতের সংঘটনগুলিকে ; সে উত্তর হল কেন…সেই কেনর উত্তর তো বলতে পারে না।… মানুষ সৃষ্টি কেমন করে হয়েছে—সে কথা সে জানে, সে বলেছে নির্ভুলভাবে। কিন্তু মানুষ কেন হল ?…সুতরাং এই 'কেন' জানতে গেলে খুঁজতে হবে সেই সকল 'কেন'র উৎসকে। যা বা যিনি জগতের উৎস—জীবনের উৎস, এমনকি ওই নাস্তিই যদি অস্তির উৎস হয়—তবে ওই নাস্তির উৎসকেই খুঁজতে হয়।

এমন ক্ষেত্রে এতদিনের 'ঈশ্বরতত্ত্বই হাতে ঠেকে, চোখে পড়ে। একালে ঈশ্বর নেই বলে যত জোরে মানুষ ঘোষণা করুক—তবুও সেই তত্ত্ব বা বাদ আজও নিঃশেষে মুছে যায় নি।"[১]

এই নূতন উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্করের স্বপ্নাদেশ নির্দেশিত পূজা তখন 'ঈশ্বরবাদ'-এ পৌঁছেছে। এ জগতে সকল 'কেন'র উৎস খুঁজে 'ঈশ্বরতত্ত্ব'ই তাঁর চোখে পড়েছে এবং সন্দেহাতীত হয়ে তিনি অস্তিবাদকেই গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থায় সম্ভবত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার জন্যও তাঁর মনে আকুল তৃষ্ণা জেগেছিল এবং তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কিছু খুঁজেও বেড়াচ্ছিলেন। সেসময় কাঁদীতে যেতে হল তাঁকে গান্ধী জয়ন্তীর উৎসবে এবং সেখানে পর পর ক'টি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাঁর ব্যক্তি-মানসে বিরাট পরিবর্তন এল।

মুর্শিদাবাদ জেলার এই কাঁদীর কিছুটা স্থান-মাহাত্ম্যও আছে। কয়েকমাইল দক্ষিণে পাঁচথুপি নামে স্থান আছে, অনেকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৭১) পৃঃ ৪৪২—৪৪৩।

মনে করেন পাঁচটি বৌদ্ধস্তূপ (পঞ্চস্তূপ—পাঁচথুপি) ছিল বলে স্থানের নাম পাঁচথুপি হয়েছিল। স্তূপের কোন আভাস আশেপাশের কোন ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায় না এখন। না পেলেও বৌদ্ধ প্রাধান্যের যুগে এই স্থানে একাধিক স্তূপ থাকা আশ্চর্য নয়, স্থানটিও প্রাচীন। কাঁদীতে রুদ্রদেবের যে মন্দির আছে তাকে রুদ্রের মূর্তি (বিরোচন) মনে হয়।"[১] এই কাঁদীতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরও আছে। এখানে তিনি বিচিত্র ও বিস্ময়কর কিছু দেখেছিলেন বলে মনে করেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আমি তাঁকে এই অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি তার উত্তরও দিয়েছিলেন। ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে, তারাশঙ্কর বলেছিলেন, তিনি নাকি প্রত্যক্ষ করেছেন—ঠাকুর হাত পা নেড়ে জীবন্ত মানুষের মত তাঁর সাথে কথা বলছেন।[২] ইতিপূর্বেও তাঁর নাকি আর একবার অলৌকিক অনুভূতি কিছু হয়েছিল। সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা জেনে তাঁর গুরুবংশীয় একজন বলেছিলেন—"বাবা তোমার জীবনে সেদিন একটি পরমলগ্ন এসেছিল। তোমার দীক্ষা থাকলে তুমি সেদিন পরমবস্তু পেতে পারতে।" কিন্তু সে সময় দিব্য বস্তুর প্রতি তারাশঙ্করের তেমন আস্থা ছিল না।

> "আমি তখন নব্যপথের পথিক। তন্ত্রেমন্ত্রে বিশ্বাস করি না। কিন্তু জীবনে বংশগত শিক্ষায় অতীতকে, পুরাতনকে অসম্মান করতে কোনকালেই পারি না বা পারতাম না। জানতাম, বুঝতাম—অতীতই এখানে এনে পৌঁছে দিয়েছে। পিতৃ-পিতামহের পথই এসে আমার পথে নবকলেবর লাভ করেছে··· তিনি আমার মনোভাব অনুমান করেই বলেছিলেন—বাবা,

১। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৮৮।

২। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার—১৬।৫।৬৯।

এসব তুমি বিশ্বাস কর না তা আমি জানি। কিন্তু বাবা—রামকৃষ্ণদেব যখন নিজের গলায় খড়্গাঘাত করতে গিয়েছিলেন তখন সাক্ষাৎ মা এসে দেখা দিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন, এঘটনা তোমার কাছে, বস্তুবাদীর কাছে মিথ্যা হলেও তাঁর কাছে তো মিথ্যা নয়। সে ঘটনা তাঁর কাছে পরম সত্য। যাকে তোমরা বস্তুবাদীরা বলবে—ভ্রান্তি, ভ্রম—তাই থেকে তো তিনি পেলেন পরম সত্যের ও পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ···আজ এতকাল পরে একথা মানতে কোন সঙ্কোচ নেই।···সেদিন মনের প্রস্তুতি—সে তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রদীক্ষার ফলেই হোক আর জীবনানুশীলনের অন্যপথে অন্যমতেই হোক, আরও অগ্রসর হয়ে থাকলে সেদিন অরূপের সাক্ষাৎ আমি পেতাম··· তারপর কতদিন কতসন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছি ওইখানে। প্রতীক্ষা করেছি দীর্ঘক্ষণ। কিন্তু কাউকে দেখিনি। সে বিচিত্র সেই একলগ্নে এসেছিল, হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, মাঝপথ থেকে আমার অযোগ্যতা অনুভব করে—মৃত্যুভয়ে ভীত করে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

তার কিছু ফল সে আমাকে দিয়ে গিয়েছে। সে ফল তন্ময়তা-যোগতার আস্বাদ আমি পেয়েছি। আমার সাহিত্য জীবনে, সাধনকর্মে সেই আমার সবচেয়ে বড় সম্বল।”[১]

তারাশঙ্করের মনে এসব অলৌকিক ঘটনার নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এক সময় ব্যক্তিগত জীবনে এসব অনুভূতি তাঁকে তন্ময়তায় আবিষ্ট হতে, অধ্যাত্মবাদে নিবিষ্ট ও বিশ্বস্ত হতে শিখিয়েছে বলেও তাঁর ধারণা। এই অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত হয়েই তিনি বলেছিলেন—

“আমি ভারতবর্ষের মানুষ—ভারতবর্ষের লেখক—আমার কণ্ঠ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: বিচিত্র—পৃঃ ৩০—৩১।

দিয়ে, আমার লেখনী মুখে কি করে উচ্চারিত হবে জীবনের শেষ মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে সত্য ভ্রান্তি, অমৃত ভ্রান্তি, ঈশ্বর অলীক।··· অন্ন আমি চাই—কিন্তু তাই সব নয় আমার কাছে, আমি চাই অমৃত। সম্পদ চাই জীবনকে সমৃদ্ধ করতে, কিন্তু জীবন চাই—অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত হবার জন্য, বস্তুজ্ঞান আমি চাই আত্মজ্ঞানে উপনীত হবার জন্য।"[১]

এখানে দেখা যায়, অমৃত, অজ্ঞেয় ঈশ্বর ইত্যাদিতে ক্রমশই তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করছে—পরবর্তীকালে এই ঈশ্বর মাহাত্ম্য প্রভৃতিরই ব্যাখ্যা করেছেন নানা নিবন্ধে, এবং আত্মকথায়। তারাশঙ্কর এই ভগবৎ ভক্তি নিয়েই বিশ্বনাথ দর্শন করেছেন, দীক্ষা নিয়েছেন, ভারতের নানা তীর্থপরিক্রমা করেছেন, এই ভারতের রূপটিও ঈশ্বর মহিমালোকিত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে—

"ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি ভারতবর্ষ আছে।···একটি তীর্থময়, ঈশ্বর-মাহাত্ম্যময় ভারতবর্ষ, অন্যটি ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ চলমান এবং পরিবর্তনশীল—কিন্তু ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় এই ভারতবর্ষ সনাতন। ইতিহাস ও খণ্ডকালের যুগধর্ম অনুযায়ী শিক্ষাদীক্ষা, চলমান পরিবর্তনশীল মানুষের মন এবং তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্যায় ঝঞ্ঝায় ঝঞ্ঝায় ভূমিকম্পে ও কালের চাপা দেওয়া মৃত্তিকাস্তূপের রীতিনীতির নির্দেশে কত পাহাড় সমতল হয়েছে, কত সমতল উচ্চ হয়েছে, কত নদী দিক পরিবর্তন করেছে · কিন্তু এই ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় ভারতবর্ষ হারায়নি।···হরিদ্বারে সেই গঙ্গাবতরণ। প্রয়াগের যতস্থানই পরিবর্তন করে থাক সেখানকার সঙ্গম-

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ শিল্পীর স্বাধীনতা (দেশ ১৯৬২) পৃঃ-

তীর্থের সেই স্থান, পুণ্য বৃন্দাবনের সেই লীলামাহাত্ম্য, সেই বংশীধ্বনি, যমুনার জলে সেই বিরহবেদনা, কাশীতীর্থে, হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে, দশাশ্বমেধ ঘাটে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাহাত্ম্য—সেই পুরাতন সনাতন ভারতবর্ষকে খুঁজতেও হবে না, তুমি যাবামাত্র আহ্বান করে বলবে, এস ; জন্মান্তরে কতবার এসেছ, এবারেও এস।··· এই তো ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় ভারতবর্ষ। কে পেরেছে একে বদলাতে?···আমি তো যেটুকু দেখেছি তাতে তার অমর আত্মার স্পর্শ পেয়েছি।"[১]

তারাশঙ্কর এইভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্য ও সনাতন ভারতভূমির অমর আত্মার স্পর্শ পেয়েছেন নানা তীর্থে তীর্থে—প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতের ঈশ্বর মাহাত্ম্যময় সনাতন আত্মাকে। ফলে আধুনিককালে প্রগতিশীল নগরসভ্যতার লীলাভূমিতে বসেও তিনি ঐতিহ্যানুরাগী হয়ে রইলেন—ঐতিহ্যের প্রতি মুগ্ধ লেখক বাস্তব জীবনের অনেক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আস্তিক্যবাদকে আশ্রয় করে শান্তিলাভে সচেষ্ট হলেন।

ভারতীয় ভক্তিমার্গে একান্তভাবে বিশ্বাসী তারাশঙ্কর মানবতাবাদের মূল শক্তি ও 'ঈশ্বরবিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত আছে বলে মনে করেছেন— "···একজন সাহিত্য সাধক হিসাবে মানবতাবাদীরূপে আমি উপলব্ধি করেছি, দুটি যুদ্ধ পৃথিবীর বুকে একটি বিরাট অভিসম্পাত এনে দিয়েছে। পৃথিবীর উভয়খণ্ডেই মানুষের ভগবৎ বিশ্বাস শিথিল হয়েছে। এটাকে একটা বিরাট অপঘাত বলতে পারি এবং তা বলাই যথার্থ। গতযুদ্ধে ব্যাপক বোমাবর্ষণের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কতলোক হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই, সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: আমার কথা (শনিবারের চিঠি, ১৩৭২ কার্তিক) পৃঃ ৫—৭।

ধ্বনিত হয়েছে – নাই, নাই, নাই, দেখছি না, পাচ্ছি না। কেন নেই, কেন দেখছি না—তার কোন সদুত্তর কোন মানুষ পায়নি বলেই সে আজ বিভ্রান্ত, ঈশ্বরে তার বিশ্বাস শিথিল। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে মানুষের দয়া, প্রেম, ধর্ম। এই কেন্দ্রবিচ্যুত হলেই মানুষের হৃদয়ে হাহাকার ধ্বনিত হয়। বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ, এখানেও ঈশ্বরের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরা আজ যদি সম্ভবপর না হয়, তাহলে মানুষের ইতিহাস মানুষকে কোন অতলে তলিয়ে দেবে তা ভাবতেও শিউরে উঠি।"[১] মানুষের জীবনে দয়া, প্রেম, ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন—এখানে তারাশঙ্কর স্পষ্টই তা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তারাশঙ্করের ঈশ্বরবিশ্বাস ক্রমশ মনুষ্য ধর্মের কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছে এবং মানবজীবনে তিনি 'ঈশ্বরবিশ্বাস'কে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় সংস্থাপন করেছেন।

তারাশঙ্করের রচনায় এই ভাবধাবা কতটুকু প্রতিফলিত দেখা যাক। 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী' থেকে আরম্ভ করে এই বিশ্বাসের সূত্রটি কিভাবে ক্রমশ তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে স্থাপিত হয়েছে বা হয়নি তা আলোচনা করলেই, এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'পাষাণপুরী' এবং 'নীলকণ্ঠে' তাঁর ঈশ্বরচেতনা বা অধ্যাত্মচেতনা কোন বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হয়নি। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ নিয়েই অধিক ব্যস্ত। সমাজচেতনা দেশচেতনা তাই সেখানে অগ্রাধিকার লাভ করেছে। 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে বরং অতি ক্ষীণস্বরে হলেও দেবতার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাই দারিদ্র্য অত্যাচার-ক্লিষ্ট গোষ্ঠ বাউলের গান 'শ্মশান ভালবাসিস বলে' শুনে বলছে—"শ্মশান তো বুকে বুকে ঘরে ঘরে, কিন্তু মা আসে কই, নাচে কই মহাস্ত ? ফাঁকি, ওসব ফাঁকি ওসব মানুষের মন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সাহিত্যের নবরাগিণী (সংস্কৃতি, চৈত্র সংখ্যা ১৩৭৩)।

গড়া কথা।"[১] এখানে ঈশ্বরবিশ্বাস বাস্তবের পীড়নে ছিন্ন। 'রাইকমল' (১৯৩৪) তো একেবারে অন্যসুরে বাঁধা। এ উপন্যাসে বাংলার বৈষ্ণবীয় সাধনার বিচিত্র রূপ এবং মানবজীবনের বিচিত্র লীলা-কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাই মানবহৃদয়ের রহস্যময়তা এবং জীবনরসসমৃদ্ধ নরনারীর কাহিনীই জীবন্ত। কোন বিশেষ নীতিবাদ বা আধ্যাত্মিকতা দিয়ে তারাশঙ্কর তা আচ্ছাদিত না করলেও পরিসমাপ্তিতে রাইকমলের বিরহ পরমপ্রেমের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। পার্থিব প্রেম সেখানে পরাজয় মেনেছে।

পরবর্তী উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজনে'ও কোন আধ্যাত্মিক ভাব তারাশঙ্করের সাহিত্যচিন্তাকে প্রভাবিত করেনি। দেশপ্রেম, মানবতাবাদ ও সংস্কারহীন জীবধর্মকে অনুসরণ করতেই তিনি অধিক যত্ন নিয়েছেন, ঈশ্বরের তুলনায় মানুষের সৎ আচারের মূল্যই অধিক বলে মনে হয় সেখানে—যেমন সঞ্জীবের মায়ের উক্তি "···ভয় কি বাবা, ঈশ্বর আছেন তিনি কখনও সৎকাজে কারো অনিষ্ট করেন না।" সঞ্জীব বলে "ভগবান তো জানিনে মা, আমি তোমাকেই আমার ভগবান বলে মানি।"[২]

'আগুন' উপন্যাসেই তারাশঙ্করের ঈশ্বর বিশ্বাস বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। সম্ভবতঃ কামনার উল্লাস (হীরু), ক্ষমতার লিপ্সা (চন্দ্রনাথ) এবং ভগবৎপ্রেমের (নিশানাথ) আদর্শকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করেছেন তিনি। কামনার দহন ও ক্ষমতার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি আনে কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনা মানুষকে বিমল প্রশান্তি দান করে—একথাই এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের বক্তব্য। ধর্মপ্রাণ নিশানাথ সংসারে নিস্পৃহ। ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎকে উপলব্ধি করাই যেন তার জীবনের একমাত্র

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : চৈতালী ঘূর্ণি—পৃঃ ৪২

২। ,, ,, : প্রেম ও প্রয়োজন—পৃঃ ৬২—৬৩।

উদ্দেশ্য। তার স্ত্রীর মতে—"রাগ হ'ল তো জপে বসলেন, দুঃখ হ'ল তো জপে বসলেন···এসব মানুষের ঘর সংসার করতে নেই, বনে গিয়ে তপস্যাই করতে হয় মুনিঋষির মত।"[১] এই নিশানাথের "ধর্মে অপরিসীম নিষ্ঠা, ক্রোধ দুঃখ এমনকি কোন আনন্দের অনুভূতি প্রবল হইলেও নিশানাথ তাঁহার ঠাকুরঘরে গিয়া জপে বসেন।"[২] সংসার দুঃখ দারিদ্র্যের চরমসীমায় পৌঁছেছে—অথচ স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্তব্য না করে নিশানাথ তীর্থ পরিভ্রমণ করছেন কারণে অকারণে। তাঁর ধারণা এ সংসারের ভার বইবেন স্বয়ং ঈশ্বর। তারাশঙ্কর নিশানাথের এই কর্তব্যচ্যুতি, বাস্তববিমুখতাকে সমর্থন করেছেন—তাই নিশানাথের মৃত্যুর পর দেখা গেল শ্মশানে মেলা বসেছে—শতশত দর্শনার্থী এসেছে—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে জনতার জয়ধ্বনি নিয়ে। এখানে তারাশঙ্কর বাস্তব জীবনকে অবহেলা করে আধ্যাত্মিকতাকে মহিমময় করেছেন, মানুষের লীলায়িত রসসমৃদ্ধ বাস্তবজীবনের চেয়ে অধ্যাত্মসত্যই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে এবং এতে তাঁর অধ্যাত্ম প্রেরণারই প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়।

"···১৯৩২ সন থেকে সাহিত্যের পথে পা দিয়ে 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে 'ধাত্রী দেবতা' 'কালিন্দী' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতি রচনার মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ ও মহিমাকে প্রকাশ করেছি,"[৩] তারাশঙ্করের লিখানুযায়ী তিনি এই কটি উপন্যাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্রাঙ্কন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত ভাবধারার মধ্যে অস্তিবাদও অন্যতম। ঈশ্বরচিন্তা প্রধান বক্তব্যে সমুন্নীত না হলেও তারাশঙ্কর যে নাস্তিক নন—একথা অতি সহজেই ঐ সময়

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আগুন—পৃঃ ৭।

২। " " পৃঃ ৭।

৩। " : আমার কথা (শনিবারের চিঠি, ১৩৭১ আষাঢ়), পৃঃ ২০৯।

বোধগম্য হয়। তাই 'মন্বন্তর' উপন্যাসের শেষে বিজয়দা কম্যুনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের সত্যধর্মকে সুস্বাগতম জানাচ্ছেন। বিজয়দার এই সনাতন ভারতীয় সত্য ধর্ম ঈশ্বর-বিশ্বাসরহিত নয়। সত্য, ন্যায় ইত্যাদি এই ধর্মবোধ ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়েছে। তারাশঙ্করের এই জীবন দর্শন সনাতন ধর্মকেন্দ্রিক, কেবলমাত্র রাজনৈতিক চেতনাসর্বস্ব নয়। অবশ্য তাঁর রাজনীতি-চিন্তাও যে ঐতিহ্যানুসারী, এবং ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী নয়, সেকথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে'ও এই ঈশ্বর বিশ্বাসের স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে। দেবু 'গণদেবতা'র নায়ক। সে দেশোদ্ধার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পঞ্চগ্রামের জনগণের মঙ্গল চিন্তায় কালাতিপাত করলেও তার সত্যন্যায়বোধ ঈশ্বরবিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে সুদৃঢ় হয়নি। প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আচার আচরণ সে কিছুতেই বর্জন করতে পারে না—সে বিশ্বাস করে, নাস্তিকতা মানুষের জীবনে সুখশান্তি দিতে পারে না। "তাহার মনে আছে চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া সে যতবার যাইত প্রণাম করিয়া যাইত। আজকাল মানুষ প্রণামও করে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, দেবতাকে - ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে। দেবু নিত্য নিয়মিত তিন সন্ধ্যা এখানে প্রণাম করে। 'আপনি আচরি ধর্ম' নীরবে সে পরকে শিখাইতে চায়। নাস্তিকতার পরিণাম সম্পর্কে একটি ঘটনার কাহিনী তাহার অন্তরে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"[১] এই ঘটনাটি ন্যায়রত্ন পুত্র শশীশেখরের আত্মহত্যা-কাহিনী। সনাতন ধর্মবিরোধী শিক্ষা গ্রহণের জন্য পিতার অসন্তোষের কারণ হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তারই ছেলে বিশ্বনাথও ধর্মবিরোধী, প্রচণ্ড নাস্তিক। দেবুর তাই দুশ্চিন্তা ছিল, আদর্শের সংঘাত পুনরায়

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গণদেবতা - পৃঃ ৭৭।

যদি কোন অশুভ ডেকে আনে! ন্যায়রত্ন দেবুর ধর্মবোধে প্রসন্ন ছিলেন, দেবুর মধ্যেই তিনি তাঁর সযত্নলালিত ধর্মবিশ্বাসকে ভবিষ্যতেও জীবিত দেখতে চাইছিলেন, বোধ করি। তাই আশীর্বাদ করেছিলেন, "কল্যাণ হোক, ধর্ম যেন তোমাকে কোনকালে পরিত্যাগ না করেন।"[১] কর্মী দেবু তার বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে—বিশুভাইয়ের প্রভাবে কখনও কখনও বিচলিত হলেও ধর্মে পুণ্যে তার অগাধ আস্থা। পুত্রের মৃত্যুর আগে তাই সে আশা করে—"সে বারবার মনে করিল—বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য নয়। এ সংসারে আর একটা পরমতত্ত্ব আছে। সে পুণ্য, সে ধর্ম। তাহার ধর্ম তাহার পুণ্য তাহাকে রক্ষা করিবে, সেই অমৃতের আবরণ খোকাকে মহামারীর বিষ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবে"[২] কিন্তু কার্যত তা হল না "বৈজ্ঞানিক সত্য ধর্ম বিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করিয়া শেষে কি তাহার গৃহেই রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল"[৩]? এরপরও বিশু যখন বংশীধারী হরিকে কটাক্ষ করে, বলে "হরি যদি ন্যায় বিচার না করে মারতেই চায় তবে এ হরিকে পাল্টে অন্য হরিকে পূজো করব আমরা।"[৪] তখন সে শিউরে ওঠে। ঈশ্বরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশুভাইয়ের সাম্যবাদও সে গ্রহণ করতে পারে না। অথচ মানুষের দুঃখও সে চায় না, তাই সে নীরবে ঈশ্বরের দুয়ারে কাতর মিনতি জানায়—"কিন্তু ভগবান, তোমার পৃথিবীতে এত পাপ কেন? কেন মানুষের এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পরিণতি। কেন তুমি মানুষকে পেট পুরিয়া খাইতে দাও না? তুমিই তো নিত্য নিয়মিত প্রতিটি জনের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা কর, মহামারীতে, ভূমিকম্পে,

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গণদেবতা—পৃঃ ২১

২। „ „ পৃঃ ২৫৮।

৩। „ „ পৃঃ ২৫৮।

৪। „ পঞ্চগ্রাম পৃঃ ১০।

জলোচ্ছ্বাসে, অগ্নিদাহে, ঝড়ে তুমি নিষ্ঠুর খেলা খেল,—তুমি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠ—বুঝিতে পারি, তখন তোমাকে হাত জোড় করিয়া ডাকি হে প্রভু তোমার এ রুদ্ররূপ সংবরণ কর। সে ডাক তুমি না শুনিলেও সে বিরাট মহিমময় রুদ্ররূপের সম্মুখে নিতান্ত অসহায় কীটের মত মরিয়া যাই, তাহাতে আক্ষেপ করিবার মত শক্তিও থাকে না। কিন্তু মানুষের এ ভয়ঙ্কর প্রকাশকে তো তোমার সে রুদ্ররূপ বলিয়া মানিতে পারি না। এ যে পাপ। এ পাপ কেন? কোথা হইতে এ পাপ মানুষের মধ্যে আসিল?"[১] মানুষের এই দুঃখদুর্দশার জন্য দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থাই দায়ী- ঈশ্বর বলে কেউ নেমে এসে পৃথিবীর সর্বপ্রকার ত্রাণ কার্য সংগঠন করা বাস্তবজীবনে বা সাধারণ মানুষের জগতে সম্ভব নয়। কিন্তু দেবু সমাজহিতে ব্রতী হয়েও সে সত্যকে যথার্থ-ভাবে গ্রহণ করতে পারছে না—উপরন্তু নিজের ক্ষমতায় যা করা সম্ভব নয়—নিজের দুর্বলতা তাকে যে কাজে বাধা দেয় তা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সমর্পণ করে ভাবজগতে বিচরণ করছে। এই দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাসহীনতার জন্যই সে ন্যায়রত্নের কাশীযাত্রা কালে বিশ্বনাথকে বলছে—"কিন্তু রোগে শোকে দুঃখে বিশুভাই মরণে পর্যন্ত আমাদের ভরসা ছিলে—তোমরা। ঠাকুরমশায়ের পায়ের ধুলো নিলে মনে হত সব পাপ আমাদের ধুয়ে গেল, সব দুঃখ আমাদের মুছে গেল। মনে মনে যখন ভাবতাম, একদিন ভগবান আসবেন, পৃথিবীর পাপীকে বিনাশ করে আবার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করবেন—তখন মনে পড়ত ঠাকুর মশায়ের মুখ।"[২]

দেবু ভগবানের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধীয় সেই পুরানো মতবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। ,পাপের দমন, পাপীর বিনাশ করবেন

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পঞ্চগ্রাম—পৃঃ ৪৯।
২। " " ঃ পৃঃ ৮০।

তিনি স্বহস্তে—সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন, এমন সব প্রাচীন ধারণাও তার আছে। অথচ সে রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবক। বাস্তব সমস্যা কি এ তার না জানার কথা নয়। কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতি তাকে ন্যায়রত্নের প্রতি এমন এক ভক্তিতে আচ্ছন্ন করেছে যে সে কোন যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তায়ই অভ্যস্ত হতে পারছে না, বৈজ্ঞানিক সত্য সত্য হয়েও তার কাছে নির্বাসিত হয়ে আছে। এই দেবু তারাশঙ্করের প্রতিভূ—তার চিন্তাধারাও তারাশঙ্করেরই চিন্তাধারা। তাই ধর্ম এবং ঈশ্বর এখানে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী অনেক চিন্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

'সন্দীপন পাঠশালা'য় সীতারাম চরিত্রে এই ঈশ্বরবিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আদর্শ শিক্ষাব্রতী সীতারাম ধীরানন্দের আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে তাই পূর্ণ সমর্থন করেনি। মা তার ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, তার ঈশ্বরবিশ্বাস, দীক্ষা, জপতপ ইত্যাদি দ্বারা সীতারামকে অনেক বেশি আকর্ষণ করেন, মায়ের পরামর্শে সে ইষ্ট-দেবতার মন্ত্রকেই তার শেষজীবনের সঙ্গী করেছিল। জীবনে, প্রেমে, সংসারে যখন শূন্যতা এল, তার মানসিক দৃঢ়তা আর রইল না। সে তখন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে—"অন্ধচোখে আমি ভগবানকে দেখবার চেষ্টা করব। আপনার মা বলেছিলেন—আমি পাব দেখতে, দেখি পাই কিনা।"[১] এই ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা বা ঈশ্বরবিশ্বাস থাকার ফলে সে চোখের চিকিৎসা করে আর সুস্থ হতেও চায় না। কন্যার বিধবামূ্র্ত সে এ চোখ দিয়ে দেখতে অনিচ্ছুক, তার চেয়ে দৃষ্টিহীন অবস্থায় ঈশ্বর উপাসনা তার কাছে অধিক শ্রেয়, তারাশঙ্কর ঈশ্বরমহিমার প্লাবনে বাস্তবজীবনকে এভাবেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। নতুবা অসুস্থ সীতারামের পক্ষে চোখের চিকিৎসা করিয়ে আরোগ্যলাভের বাসনা থাকা অত্যন্ত

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : সন্দীপন পাঠশালা, পৃঃ ১৯।

স্বাভাবিক ছিল। কেবলমাত্র কন্যার বিধবামূর্তি দেখার বেদনায় দৃষ্টিহীন চোখ নিয়ে ঈশ্বরলাভের প্রচেষ্টা সাধারণতঃ কোন বাস্তব মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। এখানেই ঈশ্বরবিশ্বাস বা ভগবৎ-ভক্তির আধিক্য তারাশঙ্করকে বাস্তববিমুখ করেছে।

১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসেও ঈশ্বরবিশ্বাসী তারাশঙ্করের ভাবাবেগের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গল্প আরম্ভ—কাল তার পূর্বের এবং পরের। নায়িকা আরতির বাবা অত্যন্ত আধুনিক—তার মতে,—"ভাগ্যে ইংরাজ এসেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসে ইংরিজী শিখে জাতটা বাঁচল। ওই ব্রাহ্মরা ভাগ্যে ইংরিজী শিখেছিল আর হিন্দুসমাজ থেকে কেটে বেরিয়েছিল, তাই রবিঠাকুরকে পেয়েছে।"[১] "আবার এসেছে এই এক গান্ধী। গুজরাটি বৃদ্ধ, দেশটাকে একেবারে কপ্‌নি পরিয়ে ছাড়বে। বঙ্কিম করেছিল—মা, মা। এ করছে—রাম, রাম! শেষ পর্যন্ত দেশের এনার্জিকে রাম নাম সত্‌ হ্যায়, হাঁক দিয়ে নিমতলায় পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।"[২] এ হেন পিতার কন্যা নায়িকা আরতি নিজেও ছিল আধুনিকা। নায়ক প্রবীর চ্যাটার্জীও একালের আধুনিক শিক্ষিত যুবক। তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে এল কিন্তু জীবনের নানা দুর্ঘটনা তাদের আবার বিচ্ছিন্ন করে দিল। গান্ধীবিদ্বেষী পিতার কন্যা শেষ পর্যন্ত গান্ধীর শরণাগত হল, যুদ্ধাগত এঞ্জিনীয়ার প্রবীরের জীবন মেকানিক রতনের সুন্দরী স্ত্রীর অবাস্তব প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত হল। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদ, ঈশ্বরতত্ত্ব উপন্যাসের মূল বক্তব্য হয়ে উঠল। তারাশঙ্করের নায়িকা এবং নায়ক—দুই একান্তভাবে বাস্তববিমুখ—তাই জীবনের সকল সমস্যাকেই ঈশ্বরচিন্তায় মহিমান্বিত করার প্রয়াস তাদের,

---

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরায়ণ, পৃঃ ১৮।
২। " " " পৃঃ ১৯।

রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে যা করা উচিত ছিল, তার কোন প্রচেষ্টাই নেই। ফলে গল্পের বাঁধুনি অনেকাংশে শিথিল হয়ে উঠেছে।

রতনের সেকেলে স্ত্রী তার জীবনের দুঃখ ভগবৎ ভক্তির আতিশয্য নিয়ে বিস্মৃত হবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শাশুড়ীর মনে বেদনা সৃষ্টি হবে ভেবে সে বা প্রবীর যে ছলনার পথ গ্রহণ করল, তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আর প্রবীর চরিত্রটিকে তো অত্যন্ত অবাস্তব করে তোলা হয়েছে। একালের আধুনিক যুবক প্রবীর হঠাৎ অপরের দুঃখ দেখে, সংস্কারাচ্ছন্ন এক অশিক্ষিতা কুলবধূর নিকট কলের পুতুল হয়ে যাবে কেন? রতনকে গুলি করা নীতির দিক থেকে অনুচিত মনে হলেও যুদ্ধনীতির দিক থেকে দোষনীয় ছিল না। সুতরাং এ পাপবোধই বা কেন? আর এই হত্যাকে পাপ ভাবলেও এই পরিবারটিকে বাঁচাবার, সাহায্য করবার অনেক পথই ছিল যে পথে প্রবীরের মতো বাস্তববাদী মানুষ এদের সাহায্য করতে পারত। সুতরাং ছদ্মবেশে থেকে অভিনয় করার প্রয়োজন ছিল কোথায়? প্রবীর রতিকে যদি প্রাণভরে ভালবাসত, তবে তার সব সংস্কারকে, ধর্মবিশ্বাসকে মেনে নিয়ে জীবনটাকে তারই কাছে সঁপে দেওয়ার মধ্যেও কিছু যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু কেবল তার আচার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে, তাদের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে জীবনযাত্রা পদ্ধতি পুরোপুরি পালটে দেওয়াটা অস্বাভাবিক লাগে এবং এতে কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এই আত্মসমর্পণটাও অত্যন্ত সস্তা হয়ে যায় এবং এর কোন গাম্ভীর্য বা গুরুত্ব বজায় থাকে না। বরং মনে হয়, তারাশঙ্কর এখানে ঈশ্বর বিশ্বাস ও গান্ধীবাদ মাহাত্ম্যকেই প্রধান বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ফলে এখানে বাস্তবজীবনের সব বাসনা সমাধিস্থ এবং জীবন-রসের চিহ্নমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই।

রতি যখন প্রবীরের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে সংসার করছে, তখনও সে এ যুগের ভক্তি ভালবাসার কঠোর সমালোচনা

করছে—"আমরা ছেলেবেলায় বেরতো করেছিলাম রামের মত, শিবের মত স্বামী পাব, তার মানে—বাবা বলেছিলেন আমি তা মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে বুঝেছিলাম, তার মানে হল পৃথিবীর সবকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুরুষোত্তমকে স্বামী পাব, পুরুষোত্তম বহুকালে একজন আসেন, তাকে যে পায় সে হয় সীতা, নয় সতী, নয় রুক্মিণী, নয় গোপা, নয় বিষ্ণুপ্রিয়া, বাকী মেয়ের মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই থাকে, তাইতো সব মেয়েই ষোল আনা সুখী হয় না। সে আপনাদের কালে, আপনাদের মধ্যে আমাদের চেয়ে আরও অনেক বেশি। সে অসুখের পুরানো ওষুধ আমরা মানি। আপনারা মানেন না, আপনারা যার সঙ্গে বনলো না, তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে আর একজনের হাত ধরেন, তার সঙ্গে না বনলে আর একজন। ও নিয়মটা ভাল বলে জানলে জনের পর জন। কিন্তু শেষে বহুজনকে ধরেও মনে মনে যাকে চাই তাকে পাওয়া হয় না। সব শূন্যই থেকে যায়। তাই আমরা যাকে পাই সেই পুরুষের মধ্য দিয়ে ভজি পুরুষোত্তমকে। ঘর আমরাও অবশ্য ছাড়ি। সে হল মীরার ঘরছাড়া।"[১]

ঔপন্যাসিক এখানেও জীবনের শূন্যতাকে ঈশ্বরবিশ্বাসের বা ঈশ্বরানুগত্যের মহিমা দিয়ে পরিপূর্ণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন যা বাস্তবজীবনে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। আধুনিকা আরতির মনেও নানা প্রশ্ন জাগে এই রতিকে কেন্দ্র করে। জেনে শুনে মেয়েটি এইভাবে দিন কাটাচ্ছে? আবার মনে হয়েছে—"না, আশ্চর্যই বা কিসের? যে দেশে হরিনাম জপ করতে করতে অপরকে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধির উপায় চিন্তা করে, এক নিঃশ্বাসে মিথ্যা কথা বলে, যে দেশে ভগবানের মন্দিরের গায়ে অজস্র ব্যভিচারের চিহ্নের অলঙ্করণ, যে দেশে পরকীয়াসাধন ধর্মের অঙ্গ, সে দেশের

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরায়ণ, পৃঃ ১০৮-১০৯।

মেয়ে ওই ভটচাজ কন্যাটির পক্ষে এই বা অসম্ভব কিসের ?"[১] কিন্তু নাস্তিক প্রবীর কেন এতে মজল ? সে কি এখন এই মেয়েটির সঙ্গে বসে ভগবানের নাম করছে ? মেয়েটির রূপে মজে সে কেন মিথ্যে অন্য ব্যাখ্যা দেয় তার আচরণের ? কেন 'ভগবানে'র নাম উচ্চারণ করে ? বলে—"আমি দেবীর মত দেখি, সে আমাকে দেবতার মত দেখে।"[২] এই হৃদয় যন্ত্রণায় যখন আরতি কাতর, তখন তার মধ্যেও এক নূতন অনুভূতি জন্ম নিল—"ক্ষণ মুহূর্তে চলমান পরিবর্তনশীল জীবনসত্তার গভীরে এক নিত্যকালের জীবন-সত্তার অবস্থান আছে তাই শাশ্বত। মনে মনে যদি কখনও অনুভব করে থাক—সকল জনের মধ্যেও তুমি একা, যাকে চেয়েছ তাকে পাওনি, সকল সম্পদের মধ্যে থেকেও তুমি রিক্ত অর্থাৎ ওর মধ্যে যা চাও তা তোমার নেই, তবে কখনই সেই নিত্যকাল এবং সত্তাকে অনুভব করতে পারবে, এই বিষণ্ণ বেদনার মধ্যে নীরবে নিঃশব্দে তুমি যদি ধ্যানমগ্ন হতে পার তবে সেই স্তিতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, তার মধ্যেই পাবে অমৃত, তার মধ্যেই পাবে পরম সত্য। কারণ কোন কালেই কেউতো যা চেয়েছে তা পায়নি, তাই বেদনাই তো চিরন্তন, সেই বেদনাতেই সকল মানুষে শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গেছে।"[৩]—এই দার্শনিক ভাবনার অনুপ্রেরণাতেই আরতি নব উপলব্ধিতে পৌঁছাল এবং আত্মনিয়োগ করলো সেবাব্রতে। গান্ধীর আশ্রয়ে থেকে নোয়াখালি ত্রিপুরায় যাবার সঙ্কল্পও করল—"ওই নোয়াখালি ত্রিপুরায় আমি যাব —আর্তপীড়িত মানুষকে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সাহস অবলম্বন করতে বলবার জন্য যাব ; উগ্রতায়, আক্রোশে আত্মসম্বিৎহারা আক্রমণ-

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরায়ণ পৃঃ ১১৩

২। " " " পৃঃ ১১৬।

৩। " " " পৃঃ ১২০-১২১।

কারীদের বলতে যাব—ক্ষান্ত হও, ঈশ্বরকে স্মরণ কর, মনুষ্যত্বে ফিরে এস।"[১] এতেই তার অন্তর্জ্বালার উপশম হল ক্রমশ। প্রবীরও এই অভিনয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল বৃদ্ধার মৃত্যুর পর। কিন্তু এতোদিনের এই জীবনযাত্রার ফলে তার মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে—"ভগবানকে আজ আমি বিশ্বাস করি" একথা সে এখন স্বীকার করছে। রতির নির্দেশমত সেও যাচ্ছে গান্ধীজীর কাছে রতনকে গুলিবিদ্ধ করার অপরাধ বিচার করাতে—"আমি মহাত্মাজীর কাছেই যাচ্ছি আরতি দেবী, আত্মসমর্পণ করতে। ওই বিচিত্র মেয়েটা এই সাহস আমায় দিয়ে গেছে। তাই বা শুধু বলি কেন, আমি দিল্লীর রাজকর্মচারীর ছেলে, ক্লাবের স্বাদ পাওয়া অতি আধুনিক—সবকিছুতে অবিশ্বাসী, পুণ্যের নামে হেসেছি, সতীত্ব সততাকে ব্যঙ্গ করেছি, প্রেমকে স্বীকার করিনি ; আমাকে সে এক আশ্চর্য দিব্য পৃথিবীতে উত্তরায়ণ করিয়ে দিয়ে গেছে।"[২] রতির প্রভাবে প্রবীর এখন বাস্তবজগতের প্রতি উদাসীন হয়ে দিব্যজগতের অনুসন্ধানে মগ্ন। দীর্ঘদীন ধর্মাচরণ, ঈশ্বরনিষ্ঠা, ভগবৎপ্রেম দেখে সেও এখন ঐ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। উপন্যাসে এইভাবেই রতি-চরিত্র মুখ্য হয়েছে—প্রবীর আরতি উভয়েই রতির চিন্তাধারাকে জীবনে গ্রহণ করেছে। বাস্তবজীবন এখানে গৌণ, প্রধান হয়েছে আধ্যাত্মিক জগত এবং ঈশ্বরচিন্তা। এর ফলে সাহিত্যরসও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এর পরই 'আরোগ্যনিকেতনে'র উল্লেখ করতে হয় কারণ তখন তারাশঙ্করের ঈশ্বরবিশ্বাস নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছে। এই উপন্যাস রচনাকালে দীর্ঘদিন তারাশঙ্কর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন ছিলেন। নানাভাবের আলোড়ন চলেছিল

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরায়ণ, পৃঃ ১২২।
২। ,, ,, ,, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

তাঁর মনে, এবং তখন দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটেছে বলেও তাঁর ধারণা—"এতকালের আমির মধ্যে সেই আমি আর রইলাম না। এতকালের জগৎ সেই জগৎও রইল না···আমার কামনা বদলাল, আমার ধারণা বদলাল, আমার হৃদয় বদলাল, এই পুরাতন জগতের মধ্যে এক নূতন জগৎকে পেলাম···পরম অস্তিবাদের বা অস্তিত্বের একটি আভাস আমাকে ঘিরে ঘিরে ফিরতে লাগল।···এই সময়ে আমার রচনা একমাত্র 'আরোগ্যনিকেতন'।"[১] "এরপর জীবনে আমার বেদনা বাড়ল। সামনে ইঙ্গিত বলে যাকে আমি মনে করি এতকালের বুদ্ধি বিচারে তাকে ভ্রম বলে মনে হয়। আবার সে ইঙ্গিতে, এক অনির্দেশের মধ্যে ওই ইঙ্গিতের উৎসকে খুঁজবার জন্য অন্ধের মত এগিয়ে না গিয়েও পারি না।

জীবনে এর থেকে বড় যন্ত্রণা বোধ হয় আর হয় না। সুখ পাই, না—সুখ নয়, সান্ত্বনা বা শান্তি পাই কেঁদে···এতকালের সত্য একটা মেঘের মধ্যে ধ্রুবতারার মত ঢেকে গেল। আমি যেন দিক. হারালাম।"[২] তারাশঙ্করের নিজ অনুভূতির বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় তারাশঙ্কর তখন ঈশ্বরতত্ত্ব বা অস্তিবাদ নিয়ে এক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন—যার ফলে তাঁর মধ্যে এক অতৃপ্তি বা বেদনার সৃষ্টি হয়। আরোগ্যনিকেতনে এই চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়—"আমার এই সময়ের যে মন এবং অন্তরের যে বেদনা তা জীবনমশায়ের চরিত্র ও জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছি এইটুকু আমি বলব।"[৩]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। বিকশিত বিজ্ঞানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষ ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কথা (শনিবারের চিঠি, ১৩৭১ চৈত্র), পৃঃ ৪৪৪।

২। ,, ,, ১৩৭২ বৈশাখ, পৃঃ ১।

৩। ,, ,, ১৩৭২ ,, পৃঃ ২।

সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণা শুরু করে। পদার্থবিজ্ঞান ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন অবধি পৌঁছে দেখে বস্তুর ভিতর ঈশ্বর নেই, রসায়ন যাদুমন্ত্রের মত পদার্থের রূপ পরিবর্তিত করে, তার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন পড়ে না। জীববিজ্ঞান প্রাণতত্ত্ব আবিষ্কারের স্পর্ধা প্রকাশ করে এবং তারপর সদম্ভে ঘোষণা করে যে প্রাণ ম্যাটার—প্রোটিন ম্যাটারের উদ্বর্তিত রূপ, ঈশ্বর এখানে অবান্তর। ভূবিজ্ঞানী পৃথিবীর তল পর্যন্ত অন্বেষণ চালিয়ে প্রমাণ করে নরক বলে কিছু নেই—কোনদিনই ছিল না। জ্যোতিষশাস্ত্র ও মহাকাশবিজ্ঞান নূতন আবিষ্কারে বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করে প্রমাণ করে স্বর্গের অস্তিত্বহীনতা। অর্থশাস্ত্র রাজনীতি বিজ্ঞান মানুষের সুখদুঃখের জন্য বিধিলিপি বা ঈশ্বরের স্থলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দায়ী করে—অর্থাৎ এ যুগের মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খুঁজে পায় না কোথাও। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত তারাশঙ্করের মনে ঈশ্বরতত্ত্ব বা আস্তিক্যবাদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগে এবং তিনি নিরন্তর এই ভাবনায় উৎপীড়িত বোধ করেন। 'আরোগ্যনিকেতন' সৃষ্টিকালেই তারাশঙ্করের মনে এই চিন্তাধারাটির পূর্ণ অবস্থান ছিল এবং উপন্যাসেও এই ঈশ্বরতত্ত্ব, অলৌকিক ভাবধারা মৃত্যুভাবনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানা মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিভাবে আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরচিন্তা একত্র মিলিত হয়েছে—'আরোগ্যনিকেতনে' তা লক্ষ্যণীয়। জীবনমশাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিকট পরাজিত হয়ে বেদনাহত—সর্বশেষে পার্থিব জগতে অধিক মনোযোগী না হয়ে 'পরমানন্দ মাধব'কেই একান্তভাবে মন-প্রাণ-দেহ সমর্পণ করেছেন। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ঈশ্বর বিবর্জিত এটা তাঁর কাছে পীড়াদায়ক—তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী তাই জন্মমৃত্যুর মধ্যে এই পরমানন্দ মাধবের লীলাই প্রত্যক্ষ করেন। মৃত্যুর মধ্যে তাই 'অমৃত'কে আস্বাদন করা যায়, আনন্দকে অনুভব করা যায় বিশ্বাস করেন। এই 'অমূর্ত'

আনন্দ' প্রভৃতির উপলব্ধি দ্বারা তারাশঙ্করও তাঁর জীবনদর্শনকে খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়েছেন। বলাবাহুল্য তাঁর এই জীবনদর্শন সনাতন আধ্যাত্মিকতাপুষ্ট ভারতীয় দর্শন।

> "ভারতে ধর্ম ও দর্শন একই সঙ্গে চলেছে। আমাদের দর্শন অতীতকে বর্জন করে অগ্রসর হতে পারেনি—অতএব তার মধ্যে টিঁকে থেকেছে প্রাচীন এমনকি আদিম পর্যায়ের বহু ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাস, ফলে ভারতীয় দর্শনের একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য বলতে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও পৌরাণিক কল্পনা—এমনকি সাধনপদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানাদি থেকে অসম্পূর্ণ মুক্তি এবং অন্তত আপাতদৃষ্টিতে যা অত্যাশ্চর্য প্রতীত হয়—জটিল গভীর এবং অত্যন্ত সুউন্নত দার্শনিকতার সঙ্গে এগুলির সহাবস্থান।"[১]

তারাশঙ্করে আরোগ্যনিকেতনের দর্শন ও ধর্মবিশ্বাস পৌরাণিক ধ্যান-ধারণা, সাধনপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদি সম্বলিত দার্শনিকতত্ত্ব। এখানে ঈশ্বর, অস্তিবাদ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত এবং জীবনমৃত্যুর দর্শনটি ঈশ্বরদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আরোগ্যনিকেতনে তারাশঙ্করে ঈশ্বরচিন্তায় গভীরতার স্পর্শ আছে—কারণ এ উপন্যাস তাঁর তৎকালীন মানসিকতার ফসল এবং এই নবলব্ধ উপলব্ধি রূপায়নকালে তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না।

আরোগ্যনিকেতনের পর 'বিচারক' ও 'রাধা' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে মোটামুটি নিঃসংশয় হয়ে একই ঈশ্বরতত্ত্বকে তুলে ধরেছেন।

'বিচারক' উপন্যাসে জ্ঞানেন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর ন্যায়-অন্যায়ের যথার্থ বিচারভঙ্গী বিশ্লেষণ করেছেন এবং

১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতীয় দর্শন, ভূমিকা, পৃঃ ৪।

এখানেও ঈশ্বরকে মূল বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। বিচারক তাঁর প্রথমা স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকে গভীর অন্তর্পীড়নে ভুগছিলেন। অবশেষে আত্মবিশ্লেষণ করে নিজের অন্যায়কে আবিষ্কার করলেন। নিজ অপরাধ অনুভব করে দণ্ড চাইলেন ঈশ্বরের কাছে। কোন রাষ্ট্র বা সমাজের দণ্ডবিধি অনুসরণ করলেন না তিনি। কারণ এ দণ্ডবিধি সকল দেশের সকল সমাজের অতীত, ঈশ্বর ভিন্ন এর বিচারক নেই। অনন্ত আকাশের পানে চেয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন বিচার ও শাস্তি এবং এরপর তিনি মানসিক শান্তি ফিরে পেলেন। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে মানুষের বিবেক জেগে উঠে ন্যায়-অন্যায় বোধটি স্পষ্ট হয় এবং মানুষ সত্যকে অনুভব করতে পারে—মনে হয় তারাশঙ্করের বক্তব্যের এখানে এই ভাবার্থ। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁকে আত্মসমালোচনায় সক্ষম করে, ন্যায়-অন্যায়-বোধটি স্পষ্ট করে, একথা ইতিপূর্বে আত্মকথায় বলেছেন, সুতরাং তাঁর নিজস্ব অনুভূতিকেই এখানে প্রকাশ করেছেন। সুরমার পিতাও তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলেও ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে তার বিশ্বাস আছে—"ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে আমি বিশ্বাস করি. সেখানে পৌঁছতে চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্র, সব মানুষ করে, সব মানুষ ঐ ঈশ্বরত্ব। একটি পবিত্র, একটি মহিমময় মানুষের মানসিক সত্তায় তার প্রকাশ।"[১] "এখন আমার উপলব্ধি হচ্ছে ঈশ্বরত্বই নিজেকে প্রকাশ করছে মানব চৈতন্যের মধ্য দিয়ে, ··গান্ধীর মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। বুদ্ধের মধ্যে তা প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে তার ছটা আছে।"[২] এখানে তারাশঙ্কর ঈশ্বরত্বের প্রকাশ দেখাচ্ছেন মানুষের মনুষ্যত্বে। অর্থাৎ দেবতার দেবত্ব মানবস্বভাবের নানা সদ্‌-গুণের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে ও মানুষকে দেবমহিমায়

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিচারক, পৃঃ ৫১।

২। " " পৃঃ ৫২।

মহিমান্বিত করে। সুতরাং এই ঈশ্বরতত্ত্বকে তিনি মানুষের মনুষ্যধর্ম অর্জনের সহায়করূপেই বিবেচনা করেছেন।

'রাধা' উপন্যাসের ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মমতবাদ-সংঘর্ষের কাহিনীকে লেখক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সংস্থাপিত করেছেন। এই উপন্যাসে বিভিন্ন ধর্মসাধনা তার সামাজিক মূল্য রাজনৈতিক মূল্যের ঔচিত্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ আছে এবং কৃষ্ণদাসী কন্যা মোহিনীর মানবপ্রেম কিভাবে ঈশ্বরপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মোহিনী মাধবানন্দকে ভালবেসে কোন প্রত্যুত্তর পায়নি—জীবনে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। তখন তার মানবপ্রেম কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়েছে—লেখক তার প্রেমকে আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বল করেছেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে প্রেমিককে স্বল্পকালের জন্য মাত্র পেল—এবং তাতেই নিহিত আছে তার অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ।

'সপ্তপদী' উপন্যাসেও মানবপ্রেমে-বঞ্চিত প্রেমিক ঈশ্বরে আশ্রয় করে অলৌকিক আনন্দ লাভ করেছে দেখা যায়, তবে সপ্তপদীর পটভূমিকাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং তারাশঙ্করের মানসিকতা বিশ্লেষণকালে এ গল্পটির পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নাস্তিক কৃষ্ণেন্দু প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেবাব্রত গ্রহণ করল—প্রেম না পেয়ে ঈশ্বরের আশ্রয় নিল। কৃষ্ণেন্দু ধর্ম মানে না। "ঈশ্বরও মানে না। সে মানে নূতন কালের নূতন সত্যকে। ঈশ্বর নেই, সত্যই তার কাছে আজ একমাত্র সত্য।"[১] কিন্তু রীনা যেহেতু তার কাছে বাস্তব সত্য, তাই রীনার জন্য সব করতে পারে সে। ধর্ম না মানা সত্ত্বেও প্রেমিকার জন্য কৃষ্ণেন্দু ধর্মান্তরিত হল—হিন্দু থেকে ক্রীশ্চান। মনে তখন তার প্রশ্ন জেগেছিল—"ধর্ম যদি ঈশ্বর দেয় তবে এত অনুদার কেন? প্রেমহীন করে কেন—মানুষকে? এক

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: সপ্তপদী, পৃঃ ৭৮।

মুহূর্তে এতকালের প্রীতিস্নেহ সব মুছে গেল? ঈশ্বর কি প্রেমহীন প্রীতিহীন স্নেহহীন? সেকি বিদ্বেষপরায়ণ? সেকি আঘাত করে? মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম সে মানে না, ঈশ্বরকে সে নেই বলে ধ্রুব জানে। তবু হিন্দুধর্ম ছেড়ে ক্রীশ্চানধর্ম গ্রহণ করে কেমন যেন হয়ে গেল মনটা।" কিন্তু রীনা এই ধর্মান্তরকে সহজ ভাবে নিল না, সে পাল্টা আক্রমণ করল—"তুমি আমার জন্যে তোমার সেই ধর্ম, তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে কৃষ্ণেন্দু? ···একটি নারীর জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরকে ছাড়তে পার।"[২] ফলে কৃষ্ণেন্দুকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল, কৃষ্ণেন্দু যদিও সকল ধর্মকে অতিক্রম করে সর্বজনীন মানবধর্মে পৌঁছোবার যুক্তি দিল, কিন্তু ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন রীনা তা গ্রাহ্য করল না। ঈশ্বর ও ধর্মের দোহাই দিয়ে সে প্রেমকে উপেক্ষা করল। পরিণামে কৃষ্ণেন্দু নিল সন্ন্যাস। —'যে ধর্ম আর ঈশ্বরের জন্য তার জীবন ব্যর্থতায় ভরে উঠল, সে ঈশ্বরকে সে এবার খুঁজবে—' যে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করার জন্য রীনা তাকে ভয় করেছিল, সে ঈশ্বরকে তাকে পেতে হবে, তাকে খুঁজেছে, তার সন্ধান সে পেয়েছে।

মানুষের বস্তুময় দেহের মধ্যে তাঁকে সে তপস্যারত দেখেছে। চিদ্ বিভ্রান্তিকর মহাসভা। বিরাট মহাসভায় উপনীত হবে মানুষ। শুদ্ধ, পবিত্র মমতায় কোমল, সত্যে নির্মল, প্রেমে পরিশুদ্ধ অহিংস।"[৩] অবশ্য কৃষ্ণেন্দু চরিত্রের এই পরিবর্তন খুব যে অস্বাভাবিক তা নয়, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মানুষের জীবন নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এখানে কৃষ্ণেন্দু রীনাকে হারিয়ে সেবাব্রতকে বেছে নিল—সকল মানুষকে আপনার করে পাবার জন্য সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হয়ে কুষ্ঠরোগীর

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : সপ্তপদী, পৃঃ ৮২।
২। " " পৃঃ ৮৪—৮৬
৩। " " পৃঃ ৮৮।

সেবায় আত্মনিয়োগ করল। এই সেবাব্রতের জন্যও নাস্তিক কৃষ্ণেন্দুর সন্ন্যাসী না হলেও চলত—ঈশ্বরকে না খুঁজলেও চলত। কিন্তু তারাশঙ্করের 'ঈশ্বরবিশ্বাস' তাঁর সৃষ্ট নায়ক চরিত্রে এভাবেই আরোপ করাকে তিনি যথার্থ ভেবেছেন। তাই কৃষ্ণেন্দু ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদির পথে অগ্রসর হয়ে জীবনটাকে নূতন করে পরিচালিত করল। রীনা যখন তার ঈশ্বরকে সমাধিস্থ করে উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত জীবন যাপন করছিল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী তখন তাকে বলছে :

> —রীনা, ঈশ্বরের সমাধি বার বার রচনা করবার চেষ্টা করেছে ঈশ্বরের বিপরীত শক্তি। আলো আর কালো, ভালো আর মন্দ। কিন্তু বারবার মন্দ হেরেছে, ভালো জিতেছে, ঈশ্বর সে সমাধি বিদীর্ণ করে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন। হায় রীনা অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, অনেক বেদনা। আমার দুর্ভাগ্য আমি তখন অনেক দূরে চলে গেছি। আমি জানলে এ দুঃখ তোমাকে পেতে দিতাম না। বলতাম জীবন, সে ঈশ্বরের অংশ। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের জীবনেই ভগবান কথা কন, হাসেন, কাঁদেন, ভালোবাসেন, নিজেকে নিজে বলি দেন, বিশ্বের কাছে বিলিয়ে দেন, মানুষের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ, মানুষের মধ্যে জীবন, সে যেখান থেকেই উদ্ভূত হোক, সে সমান পবিত্র। ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই, ক্রিশ্চান নেই, হিদেন নেই, ধনী নেই, দরিদ্র নেই, গোত্রকুল ইতিহাস পরিচয় থাক, না থাক, মানুষ সমান পবিত্র, তার মধ্যে ঈশ্বর সমান মহিমায় আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল। তোমাকে নিয়ে আমি মহা আনন্দে এই তপস্যা করতাম।"[১]

কৃষ্ণেন্দু ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে ঈশ্বরপ্রেমের মধ্য দিয়েই মানবপ্রেমে দীক্ষিত হল। মানবতাবাদে উপনীত হবার জন্য ধর্ম

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : সপ্তপদী, পৃঃ ১০১-১০২।

কিংবা ঈশ্বরকে নির্ভর করাই একমাত্র পন্থা নয়, কিন্তু তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি তাদের স্রষ্টার মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বারে বারে ঈশ্বরকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছে। তারাশঙ্কর এখানেও তাই প্রেমিক কৃষ্ণেন্দুকে সন্ন্যাসী সাজিয়ে মানবধর্মকে অনুভব করালেন—জগৎ হিতায় তাকে সমর্পণ করলেন ঈশ্বরের নিকট। ঈশ্বর সান্নিধ্যে কৃষ্ণেন্দু প্রায় মহামানবের স্তরে পৌঁছাল—আধ্যাত্মিকতা তাকে ঋষিতুল্য করে তুলল—কেবল জীবনের কামনাবাসনা হল নির্বাসিত, অবহেলিত। জীবনের রিক্ততা থেকে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরের করুণার মহিমা অনুভব করল সে।

'বিপাশা' উপন্যাসে সংসারসুখে বঞ্চিতা লাবণ্যকে উন্মাদ অবস্থায় পথে পথে না ঘুরিয়ে, বা কোন উন্মাদ চিকিৎসালয়ে (পাগলাগারদে) না পাঠিয়ে তারাশঙ্কর পাঠালেন পুরীতে সেখানে সে জগন্নাথদেবকে স্বামী ভেবে, শেষ দিনগুলি কাটিয়ে গেল এবং অপরাধী শরদিন্দুও সন্ন্যাস নিল। বাস্তবজগতে সাধারণ মানুষেরা যেকোন দুঃখকষ্টে শোকেতাপে বা অপরাধবোধে এভাবে কেবল ঈশ্বর-সান্নিধ্যই কি কামনা করে? বা কেবল সন্ন্যাস নেবার কল্পনাই করে? বরং বাস্তবজগতের সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রচেষ্টাই তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুতঃ মানুষের অফুরন্ত জীবনীশক্তি সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের মধ্যেও জীবনের প্রতি তাকে বিশ্বস্ত রাখে—জীবন থেকে পলায়ন করে বাঁচতে চায় না। সংসারের দুঃখকষ্টের সঙ্গে এমনভাবে সংগ্রামবিমুখ হলে মানুষ সংসারে 'মানুষ' হয়ে বাঁচতে পারত না এবং জীবনধর্ম তাতে ক্ষুণ্ণ হত। তারাশঙ্করের উপন্যাসে কিন্তু জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জীবনটাকে উপেক্ষা করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। তারাশঙ্কর ঈশ্বরপ্রসঙ্গ দিয়ে এ পরিণতিকে যতই মহিমান্বিত করার চেষ্টা করুন না কেন, এতে জীবনের মূল্য খর্ব করেছেন এবং পলায়নী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। না হলে, সব শূন্যতা, সব দুঃখবেদনাই সন্ন্যাস

দ্বারা, আধ্যাত্মিকতা দ্বারা, অস্তিবাদ দ্বারা এমনভাবে অলৌকিকতায় উন্নীত করার প্রয়োজন কি ?

'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসে 'ঈশ্বরচিন্তা' নিয়ে তারাশঙ্করের মর্মযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে আবার। ভূমিকায় লিখেছেন—

> "আমার জীবনের অণুপরমাণুতে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে, অতীত সংস্কার বিশ্বাসে ও নূতন শিক্ষার বুদ্ধিতে যে আমি মর্মান্তিক প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনুভব করছি—যার ফলে আজ সব ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সেই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আজ যে মনে হচ্ছে জীবনের দিক নেই, সূর্য ক্ষণজীবি, চন্দ্র একটা বুদ্বুদ, সব মরুভূমি, শুধু বালু, কোন বিশ্বাস নেই, আশ্বাস নেই, এখানে সত্যটা কি ? এখানে আজ উলঙ্গ প্রশ্ন—আমি কে ? আমি কেন ? আমি কি ? একদা বিশ্বাস করেছিলাম সৃষ্টির মূলে এক স্রষ্টাকে। ঈশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে গড়েছিল মনোরাজ্যে সুপ্তস্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, নন্দনকানন, পারিজাত, মন্দাকিনী। গড়েছিল আদর্শ কর্তব্য···আজ জগতে এসেছে নাস্তিবাদ, ঈশ্বরবাদ আজ জীর্ণ পিতার শবদেহের মত পড়ে রয়েছে। কোথাও আমরা সর্বময় উত্তরাধিকারী কর্তা বলে চিৎকার করছি। কোথাও মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করছি, শুধু তাই নয়—আজ ঐ ঈশ্বরের উপাধানের তলদেশে একটা চিরকুট পেয়েছি যাতে লেখা আছে—ঈশ্বর চিরকালই এই শবের মত। আমরা কি ? আমরা কেন ? জন্তুর পুত্র ? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু ? আমরা কি শুধু মরবার জন্য এবং যতদিন বাঁচি ততদিন শুধু ভোগের জন্য ? বিশ্ব-সংসারের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু—তাকে ভেঙেও মহানাস্তিতে পৌঁছুতে পারি না। পৌঁছুই এক মহাশক্তির প্রকাশে। সেকি অস্তি ? না সে নাস্তি ? সেই তো যবনিকা। এ

প্রশ্ন অজ্ঞানে হোক, সজ্ঞানে হোক প্রতিটি মানুষকে আজ একটি মর্মযন্ত্রণায় অধীর করে রেখেছে। অস্তিবাদে হোক আর নাস্তিবাদে হোক, সে খুঁজছে সেই পরম উত্তর অর্থাৎ একটি পরম বিশ্বাস।"[১]

এ উপন্যাসে এ যুগের প্রতিটি মানুষের না হোক তারাশঙ্করের নিজ মর্মযন্ত্রণাটি রূপায়িত হয়েছে। যেহেতু এই জিজ্ঞাসাই এ উপন্যাসে মুখ্যাধিকার পেয়েছে, তার ফলে চরিত্রগুলোকে এই বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঔপন্যাসিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি ততটা নজর দেওয়া হয়নি। জীবনের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে লেখক এই সমস্যাকে মূল ধরে নিয়ে—এতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। নীল, শান্তি ও সুদর্শনের চরিত্র মাধ্যমে এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন লেখক—অন্যান্য বাস্তবপ্রয়োজন তাই তাঁর তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সুদর্শনের জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে যখন প্রশ্ন জাগল, সে ঈশ্বর সন্ধানে তীর্থে তীর্থে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে ঘুরতে থাকল তখন সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ করল কিন্তু উত্তর পেল না। সে আবিষ্কার করল এপথ ভ্রান্ত—এখানে আত্মজিজ্ঞাসার জবাব নেই। দেহকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ব বাস্তবজীবনে সে এবার ফিরে এল কিন্তু তার এই বিশ্বাস সংক্রামিত হল নীল-নলিনীর হৃদয়ে। সে তাই সুদর্শনের এই নাস্তিকতা সহ্য করল না। বহু বেদনার ভার বহন করে—সুদীর্ঘকাল দুঃখের দহন সহ্য করে সে যেন ঈশ্বরের করুণাধারায় অবগাহন করল, ঈশ্বর-বিশ্বাসের ফলে জীবনে শান্তিস্বস্তি ফিরে এল। এবার সে এই উন্মত্তপ্রায় মানুষটির সঙ্গ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিল—হিমালয়ে আশ্রম করল। "তোমার গেরুয়া কাপড়ে রুদ্রাক্ষের মালায় কিছু ছিল। সেদিন ভোরে সেই নির্জন পাহাড়ে ওই গেরুয়া কাপড় পরার সঙ্গে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : যোগভ্রষ্ট (ভূমিকা), পৃঃ [৫]-[৬]

সঙ্গে তার স্পর্শ আমি পেয়েছিলাম, তুমি তাকে বিসর্জন দিয়েছ কিন্তু আমাকে তা পেয়ে বসেছে। তা হারাতে পারব না। তাই আমি চলছি। তোমাকে স্বীকার আজীবন করব। কিন্তু আমাকে খুঁজো না। তোমাকে আমার ভয় করছে। তোমার জন্য আমার ভয় হচ্ছে।"[১] নীল এই কথা কটি জানিয়েই সুদর্শনকে পরিত্যাগ করে চলে যায় তার 'গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা'র প্রেরণাজাত-মানসিকতাকে আশ্রয় করে। সুদর্শন তার ভালবাসার মানুষটির অনেক অন্বেষণ করেছিল কিন্তু তাকে আর পায়নি। সে তখন পাপপুণ্য, ভালমন্দকে এ সংসারের লীলাক্ষেত্রে নানারূপে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে ব্যস্ত হল। তারাশঙ্কর তাঁর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো রাজনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার প্রতিও আলোকপাত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের জীবনে সমাজ-জিজ্ঞাসা ও রাজনৈতিক চেতনাই অধিক—ঈশ্বর কে এই নিয়ে খুব কম মানুষকেই চিন্তাগ্রস্ত দেখা যায়। তবু তারাশঙ্করের নায়ক সুদর্শন এই চিন্তা নিয়ে জীবন কাটিয়েছে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই উত্তর প্রত্যাশা করেছে, অবশ্য ফাঁসির পূর্বে নীলনলিনীর সান্নিধ্য লাভ করে তার উত্তপ্ত মনের জ্বালা নিবৃত্ত হতে দেখা যায় এবং তার আত্মজিজ্ঞাসার উত্তরপ্রাপ্তিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"খোঁজ আরও খোঁজ, পাবে বই কি উত্তর। আমি নেই তো তুমি কি করে সম্ভবপর হলে!"[২] এতে প্রচ্ছন্নভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের আভাস দেওয়া হয়েছে এবং আস্তিক্যবাদকেই সমর্থন জানান হয়েছে। এই আস্তিক্যবাদের স্বরূপ উদঘাটনে তারাশঙ্কর অন্যভাবেও সচেষ্ট। "ধীরেনবাবুর নাস্তিক্যবাদী মত ও পথকে ব্যঙ্গ করি, ঘৃণা করি, কারণ তার মধ্যে

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : যোগভ্রষ্ট, পৃঃ ১৩৫।
২। " " পৃঃ ২১১।

ধীরেনবাবুর প্রচ্ছন্ন স্বার্থ আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। এদের দলবদ্ধ নাস্তিক্যবাদীদের মধ্যে এ ওকে ধরিয়ে দেয় শিবনাথ। কিন্তু এই বিচিত্র আস্তিক্যবাদী খাঁতুবাবুর পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত থেকেও ভগবানকে ডাকতে দেখে ব্যঙ্গ করতে পারিনি।···আমি নাস্তিক—অন্য ধরণের। শিবনাথ, নাস্তিক্যবাদে জন্মের আগেও নেই—মৃত্যুর পরেও নেই। সুতরাং থাকার মধ্যে আছে বেঁচে থাকার কয়েকটা দিন। চরম সত্য—বেঁচে থাকা। পরম শব্দটা রাখতে যদি চাও তবে পরম সত্য সুখে বেঁচে থাকা। তার মধ্যে যে নাস্তিকেরা মানব কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ, ইতিহাসে নাম থাকার অমরত্বের লোভ দেখায়, তারা হয় ভ্রান্ত, নয় ভণ্ড মিথ্যুক।"[১] সুদর্শন নাস্তিক ও আস্তিকদের এই জাতীয় নানা রূপ দেখেছে এবং নাস্তিক্যবাদের চেয়ে আস্তিক্যবাদ যে অধিক কাম্য, সম্ভবত সেকথাই বলছে। তাই মৃত্যুর পূর্বে নীলের ঈশ্বরবিশ্বাস দ্বারাই সুদর্শন আবার প্রভাবিত হল— নীল সুদর্শনের মৃত্যুর পর শিবনাথকে বলছিল—

> "যুগ-যুগের কোন এক যোগভ্রষ্ট আত্মা। জন্মে জন্মে খুঁজে আসছে। তাঁকে দেখলাম, তখনও ভাবছেন। বললাম—আর ভেবো না, আত্মসমর্পণ কর। ভয় করো না, বললেন—ভয়? না, ভয় আমার ছিল না, উদ্বেগ কিছু হয়েছিল, সে তুমি মুছে দিয়েছ। কিন্তু না ভেবে কি পারি? ঠিক ভাবিনি। মনে মনে বলছি—তুমি যদি থাক, তবে তোমাকে ডাকছি আমার জীবনমূল্যে, উত্তর দাও। তুমি শুনতে পাচ্ছ কি না জানি না—বিংশ শতাব্দীর মানুষের আর্তনাদ, তার আকুতির! অণুপরমাণু ভেঙে সে তোমাকে খুঁজছে। আমি বললাম—তাঁকে মনে খোঁজ, প্রেমে খোঁজ, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খোঁজ। বললেন কি জানেন? বললেন—না, তাঁকে

[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : যোগভ্রষ্ট, পৃঃ ২১১

বাইরে খুঁজব, মনে খুঁজব, প্রেমে খুঁজব, হিংসায় খুঁজব, জীবন দিয়ে খুঁজব, জীবন নিয়ে খুঁজব, পাপে-পুণ্যে, আলোয়-অন্ধকারে—সবকিছুতে খুঁজব। দেহ চিরে চিরে খুঁজব, পৃথিবী ভেঙে ভেঙে খুঁজব। উত্তর চাই। বিংশ শতাব্দীতে তাঁকে উত্তর দিতে হবে। না পাই উত্তর, ধ্বংস করব নিজেই নিজেকে। কী প্রয়োজন এই জন্মের, এই জীবনের—যেখানে নিজেই জানি না আমার পিতা কে?' আমি মনে মনে বলছি—আমার ফাঁসির পূর্বে যেন যবনিকা ছিঁড়ে বা ওপার থেকে তার একটা উত্তর আমাকে দিয়ো।[১]

মানুষের জীবন মনুষ্যত্বে সার্থক, পিতার অন্বেষণে কি বা প্রয়োজন? এ জীবনে পিতা কে এ দার্শনিক তত্ত্বের অন্বেষণ না করেও মনুষ্যত্ব অর্জনের পরিতৃপ্তি অনায়াসেই মানুষ পেতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী লেখকের মর্মবেদনা পিতার প্রশ্নে—উপন্যাসের ভূমিকায় তাই বলেছেন—'এ আমার অন্তরের যন্ত্রণার সঙ্গীত'—সুতরাং সুদর্শনের হৃদয়যাতনা লেখকেরই হৃদয়যাতনা। এ যন্ত্রণার পূর্ণ উপশম না হলেও উপন্যাসে তার উত্তরপ্রাপ্তির একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে "আমি নইলে তুমি কি করে সম্ভবপর হলে" এবং এতে মনে হয় সুদর্শন শেষ সময়ে অস্তিবাদের অনুভূতি লাভ করতে পেরেছে—নীলের সাহচর্য তাকে সেই অনুভব শক্তি এনে দিয়েছে। সুতরাং তারাশঙ্করের অস্তিবাদ বা ঈশ্বরবাদ এখানেও যথারীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক মর্মবেদনা সয়েও শেষকালে সুদর্শনকে নাস্তিকতা নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হয়নি। 'যোগভ্রষ্টে' তারাশঙ্করের নাস্তিবাদ ও অস্তিবাদের সংশয়-সন্দেহ এভাবেই পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ যোগভ্রষ্ট, পৃঃ ২১০।

'নিশিপদ্ম' উপন্যাসের 'মুক্তামালা' জীবনের শূন্যতাকে ঈশ্বরের করুণা দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছে। দয়িতের কাছে স্ত্রীর সম্মান পায়নি, অথচ সে সন্তানের জননী হয়েছে স্বামীর স্বীকৃতি না পেয়েও, জীবনে এসেছে নানা বিপর্যয়। তাই সন্ন্যাসীর কাছে সে তার কলঙ্ক কাহিনী খুলে বলে—"আপনি গুরু, মীরা গানে ভজনা করে জীবন পূর্ণ করেছিল। সে হয়ত সেকাল, একালেও আমি আনন্দের মধ্যে, পবিত্র পুণ্যের মধ্যে এই সাধনাতেই জীবন পূর্ণ করব। আর আমার অভিযোগ নেই।"[১] সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য একালের মুক্তামালাও (যত অবাস্তবই মনে হোক) ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন হল মীরাবাঈয়ের মত। এই ঈশ্বরবিশ্বাসই তাকে ক্ষমা ও উদারতা শেখাল, পৃথিবীর কারো প্রতি কোন অভিযোগ রইল না আর।

'কান্না'র ফাদার ন্যাথানিয়েলও জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে নির্মল বৈরাগ্য নিয়ে দিনাতিপাত করেছিলেন। স্ত্রী তাকে ত্যাগ করেন, দুটি সন্তানের মৃত্যু হয় চোখের সামনে, তারপর সংগীত আর সেবাধর্মই তার জীবনের সংগী হল। তিমি অনাথ দুটি ছেলে-মেয়ে লনা ও জনকে প্রতিপালন করেছিলেন পিতৃস্নেহে, ন্যায়, সংযম, সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ দিয়ে তাদের চরিত্রগঠন করতে চেষ্টাও করেছিলেন। পঙ্গু লনা সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, মনপ্রাণ দিয়ে তা পালন করেছিল। কিন্তু জন প্রবৃত্তির তাড়নায় বারবারই পথভ্রষ্ট ও সঙ্কল্পচ্যুত হয়েছে। যার ফলে একসময়ে পিতৃসম ফাদারকে তারই জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়, লনাকে পার্থিব বাসনা বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু এ উপন্যাসেও লনা ও ফাদার চরিত্রদুটো যেন ঈশ্বর মহিমা প্রচারের জন্য সৃষ্ট। মনে হয় বরং সে তুলনায় জনের চরিত্র অনেক স্বাভাবিক।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ নিশিপদ্ম, পৃঃ ১৬০

শত অন্যায় অপরাধ বাসা বাঁধলেও তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। তারাশঙ্কর অবশ্য জনকে অবশেষে ঈশ্বরবিশ্বাসে আগ্রহী দেখিয়েছেন, অন্ধত্বের অভিশাপে সে অনুতপ্ত হয়েছে তখন লনাকে সে অভিযোগ করছে, তাকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার না করার জন্য বলছে—"ঈশ্বরের তপস্যা করছ? তাঁকে বলো—তোমার মত পবিত্রতার মূর্তি যারা তারা কি একটু উত্তাপ নিয়ে আবেগ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে না?"[১]

'বসন্তরাগ' উপন্যাসেও একইভাবে ঈশ্বরচিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেমকে উপেক্ষা করে স্বামী রঙ্গনাথন যখন অনুতপ্ত, স্থানে স্থানান্তরে প্রেমিকা লল্লার অন্বেষণ করছেন ব্যাকুল হয়ে তখন আম্মা বলছেন - "তার থেকে তুমি ঈশ্বরকে খুঁজো, না পেলেও দুনিয়া তেতো হবে না। তাঁকে শুধু জীবনেই মেলে না, মরণেও মেলে।" রঙ্গনাথন তখন এলেন জগন্নাথধাম পুরীতে—তিনি এখানে জগন্নাথদেবকে তার সঙ্গীত শোনান এবং পরম তৃপ্তি লাভ করেন, লল্লার সঙ্গেও তার দেখা হল একসময়, তখন কিন্তু লল্লা তপস্বিনী কল্যাণী। মানুষের প্রেমে বঞ্চিত হয়ে সে ভগবানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে। সুতরাং পার্থিব প্রেমের সাফল্যে তার কোন প্রয়োজন নেই। তারাশঙ্কর এইভাবেই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে পার্থিব জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে, দুঃখবেদনা, ব্যর্থতা, নিরানন্দ আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরবিশ্বাসের অনুভূতি সোচ্চার হয়ে উঠেছে—বঞ্চিত ব্যর্থ মানুষেরা এ পৃথিবীতে জীবনটাকে পরিপূর্ণ করার আর কোন পথই খুঁজেনি—একমাত্র ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করেছে। প্রথম কটি উপন্যাস ছাড়া অধিকাংশ উপন্যাসেই

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কান্না, পৃঃ ২৬৬।
২। " : বসন্তরাগ, পৃঃ ৯২।

এই চিন্তাধারা মুখ্যস্থান অধিকার করাতে সময় সময় রচনা অত্যন্ত প্রচারধর্মী বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের বাঁধুনি শিথিল হয়ে ঔপন্যাসিক গুণগুলিও যথাযথ বিকাশের পথ পায়নি। ফলে, বিশেষত শেষের দিকে, উপন্যাসের কাহিনীগুলি একঘেয়ে এবং তাতে জীবনের উত্তাপ একেবারেই নেই বলা চলে। প্রথমদিকে যে উপন্যাসগুলিতে তারাশঙ্কর মানবজীবনের বিচিত্র সংঘাতের রূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছিলেন, সমাজজীবনের রাজনৈতিক-জীবনের সে ভাঙাগড়া তিনি অতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছিলেন, তা সমাপ্তিপর্বের রচনায় একেবারেই অনুপস্থিত এবং এখানে সর্বসমস্যার একমাত্র সমাধান ঈশ্বর-মহিমা বলেই মনে হয়। এটা নিঃসন্দেহে পলায়নী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক—এতে জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয় না।

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতেও কোন না কোন প্রকারে এই ঈশ্বরবিশ্বাসকে প্রচার করেছেন তিনি। ‘শক্করীবাঈ’ ও ‘গন্নাবেগমে’ তার প্রমাণ রয়েছে। ‘শক্করীবাঈ’ উপন্যাসে তারাশঙ্করের ঈশ্বর-বিশ্বাস, ন্যায়, সত্যবোধের ব্যাখ্যা করেন ফকীর সাহেব—“দুনিয়া খোদাতয়লার, এ দুনিয়া পয়দা হয়েছে তাঁরই হুকুমতে, তাঁরই ইচ্ছায়। দিন-দুনিয়ার মালিক তিনি, শয়তানও তাঁরই পয়দা তাঁরই সৃষ্টি।”[১] কিন্তু শয়তান দুনিয়ার মানুষের উপর খোদার মালিকানি ঘুচিয়ে দিয়ে নিজে মালিক হতে চায়। সেইজন্য সে মানুষের আত্মাকে কেনে। “যে দাম সে চায়, সেই দামই সে দেয়। এ দুনিয়ার যে কোন দুর্লভ বস্তু হোক, তার বদলে শয়তানের কাছে খত্ লিখতে হবে মানি না, দয়া না, প্রেম না, ক্ষমা না, সত্য না, কুরান না—সবকিছুর মূল বলে থাকে মানুষ মানে সেই খোদাকেও না। ঝুট বিলকুল ঝুট, ঈশ্বর ঝুট – মানি না।”[২] কালাশের এখানে সেই শয়তান যে কিছু মানে না।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: শক্করীবাঈ, পৃঃ ১।
২। " " পৃঃ ১-২।

সে ধর্মকে, ঈশ্বরকে, ন্যায় সততাকে, লোভের দায়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, ফলে সে নিজে শেষ হল। শক্করবাঈ ছিল ঈশ্বরবিশ্বাসী—সততা, প্রেম ও পবিত্রতার প্রতীক। তাই নিজে মৃত্যুবরণ করেও সে কালাশেররূপী শয়তানকে, অধর্মকে শেষ করল, গোলাম কাদেরকে লোভ ও কামের অধর্ম থেকে রক্ষা করল। সুতরাং উপন্যাসের শেষে ন্যায় সত্য ও সততার জয় হল, ঈশ্বরবিশ্বাস জয়ী হল। কালাশের কোনমতেই আর ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না। 'গন্নাবেগম' উপন্যাসের আদিল ও গন্না চরিত্রেও এই ঈশ্বরবিশ্বাস স্পৃষ্ট। সারাজীবন ধরে দুজনে কঠোর নির্যাতন সহ্য করেও কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেনি—বরং এই দুঃখের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করেছে, আদিল সর্ব অবস্থায়ই ভগবানে বিশ্বাসী—"নসীবের সঙ্গে লড়তে লড়তে আর খোদার কি মর্জি বুঝতে বুঝতে আমি হিমশিম খেয়ে গেলাম জনাব।···আমার ভাল লাগে ওই কোরাণ. ওই পড়ি আর নকল করি। ওতেই দিন কেটে যায়।"[১] তার মসনভিতে তাই লেখা ছিল—"দুনিয়াতে যত ফুল ফোটে তার সুরত্‌ আর খুসবু সবই সেই খোদার মহিমা। দুনিয়াতে যত মহব্বতি—মানুষের সঙ্গে মানুষের, মায়ের সঙ্গে বেটার, তার মধ্যেও সেই খোদারই মহিমা।"[২] অন্ধ হয়েও সে গন্নাকে বলে—"চোখ থাকলে ফকীর আমি হতে পারতাম না। চোখ গিয়ে অন্ধ হয়ে দেখি কি জান—না তোমাকে দেখি না, তোমার মুখ বিলকুল ভুলে গেছি। দেখি—অন্ধকারই দেখি, তবে মনে হয় খোদা আছেন, খুব কাছে আছেন।"[৩] গন্না তাকে হজরত বলে নিজেকে তার শিষ্যা মানে—"আপনি ফকীর—আপনি বলছেন—আঁধিয়ারার মধ্যে আপনার মনে হয় খোদা আপনার খুব কাছে আছেন,

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গন্নাবেগম, পৃঃ ৮০।
২। " " পৃঃ ১০৮।
৩। " " পৃঃ ১৭৩।

আমি আপনার শিষ্যা, আপনি গুরু, আপনি কি বলতে পারেন হজরত আমরা কি তেমন অনুভব করতে পারি না? না হলে কি করে কি নিয়ে বাঁচব?" অন্ধ ফকীর বলেন,—"তুমি তা পারবে গন্না। খোদাকে মনের মসনদে বসিয়ো। যিনি খোদা, যিনি আল্লাহতায়লা তাঁর মূর্তি নাই। কাফের যে সেই তাঁর মূর্তি কল্পনা করতে চায়। তবু তাঁকেই রাখবে মনের মসনদে। তাঁকে ডেকো।..."[১] গন্না সারাজীবন এই খোদাকে স্মরণ করে নানা নির্যাতন ভোগ করল, দয়িতকে হারিয়ে তারই আংটি নিয়ে সে দিন কাটাল। অবশেষে বাঁদীবৃত্তি থেকে মুক্তি পেল এবং চোখের জলে তার জীবন সমাপ্ত হল। তারাশঙ্কর এখানেও তাঁর নায়িকার ব্যর্থ-প্রেমকে ঈশ্বরপ্রীতি দিয়ে সহনীয় করেছেন। নিষ্ঠা, সততা দিয়ে এই প্রেমানলকে মহৎ করে তুলেছেন।

তারাশঙ্কর তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনা "সুতপার তপস্যায়" এই ঈশ্বরচিন্তার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ১৯৬৭তে বাংলাদেশের সমাজে, রাজনীতিতে যখন চরম সংকটকাল—নকসাল্, মার্কসবাদী, কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যখন প্রতিহিংসার রাজনীতি বিস্তার লাভ করেছে—সেই পট-ভূমিকায়ই এ উপন্যাসের কাহিনী সংস্থাপিত হয়েছে। এই পরিবেশের জটিলতা তাঁর নায়িকার জীবনেও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করল—তার জীবনে সংঘর্ষ দেখা দিল নানা মতাদর্শ নিয়ে। ফলে তার দাম্পত্যজীবনও দ্বন্দ্বমুখর রাজনীতির স্পর্শে ছিন্নভিন্ন হয়ে সুখশান্তিতে ভাঙ্গন ধরল। তারাশঙ্কর তখন সুতপাকে সব জটিলতা থেকে উদ্ধার করলেন ঈশ্বরবিশ্বাসের সূত্র ধরে—সে বাস্তব জীবনের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গেল চমৎকারভাবে। একদিকে ঈশ্বরবিশ্বাস, উদার মানবীয় স্বীকৃতি, ঐতিহ্যানুরাগ—অন্যদিকে মানুষের দুঃখদুর্দশাপূর্ণ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গন্নাবেগম, পৃঃ ১৭৩।

যন্ত্রণার প্রতি সহানুভূতি, নূতন সমাজচিন্তা উপন্যাসের কাহিনীতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। সমস্যাকণ্টকিত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিগত সাতষট্টির নির্বাচনোত্তর কাল থেকে অধুনাতন কালটিকে আশ্রয় করেছেন তারাশঙ্কর কাহিনীর বিস্তারপর্ব হিসাবে। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে যুক্তফ্রণ্টের শাসনভার গ্রহণের পর আন্তর্দলীয় মতবিরোধের বিষময় ফলস্বরূপ শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সূত্র ধরে যে খুন-জখম হত, সেরকমই একটি ঘটনাকে তারাশঙ্কর পারিবারিক অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কাহিনীর নায়ক সুব্রত খুন হওয়ার পর তারই একটি দীর্ঘ চিঠি নিয়ে পুলিশ এল সুতপার সঙ্গে দেখা করতে। সুতপা ব্যারিস্টার কন্যা, সুব্রতের স্ত্রী। সম্প্রতি স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য হয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে এবং এই বিচ্ছেদের মূলে আছে আদর্শগত বিরোধ। সুতপার দাদারা বামপন্থী, সুতপার উপর তাদের মতাদর্শের প্রভাব আছে। সুব্রতের ধ্যানধারণা কিন্তু ভিন্ন। সে আত্মিক-শক্তির উদ্বোধনে বিশ্বাসী, গ্রাম সংগঠন ও অহিংস পন্থায় আত্ম-নিয়োজিত, নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতি বিশ্বস্ত। অবশ্য সুতপা-সুব্রতর বিচ্ছেদ এই রাজনীতিগত মতভেদ থেকে হয়েছে কিনা বলা দুষ্কর, কারণ উপন্যাসে তা খুব স্পষ্ট নয়। তবু উপন্যাসে লেখকের ঈশ্বরবিশ্বাসের মধ্যে কোন অস্বচ্ছতা নেই, তাঁর ধর্মনিষ্ঠাটি অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইন্দ্রিয়সংযমী, ভোগবিলাসহীন সুব্রতের যখন পরিবর্তন হল, তখন সে ভোগাসক্তির উন্মাদনায় মেতে উঠল। সুতপা তখন তার শিশুপুত্র ও শালগ্রামশিলা নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে।—অথচ এই সুতপাই শালগ্রামশিলা, পূজো, আহ্নিক ইত্যাদি সম্পর্কে একসময়ে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করেছে, সন্দেহ প্রকাশ করেছে। শেষে সুব্রত বলছে—"বদ্রীনারায়ণ থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত ঘুরেছি সুতপা, শাস্ত্র পড়েছি। চারবছরের দুটো বছর ঘুরেছি, ঘুরেছি, কিন্তু পাইনি কিছুই। সত্যকথা তোমাকে

বলব—মিথ্যা মনে হয়েছে ঈশ্বর, ধর্মশাস্ত্র, তীর্থ সব। সব। আবার পৃথিবীর সংসার আমাকে টানলে, টানলে রাজনীতি। ঈশ্বর কাউকে রাজা হতে দেন না—রাজা হতে হয়—রাজ্য জয় করতে হয়। সারা ভারতবর্ষের যেখানেই গেলাম সেখানেই দেখলাম—মানুষ এতেই পাগল হয়েছে। তার সঙ্গে আমার মনে যোগ দিলে আমার অতীত। তোমাকে পাইনি—তোমাকে পেতে হবে—আর এখানে হেরেছি ইলেকশনে আমাকে জিততে হবে ইলেকশনে।"[১] সুতপা যখন বৈধব্য বেশ নিয়ে স্বামীর স্মৃতিপূজা করছে, একনিষ্ঠভাবে গোপাল পূজা করছে তখন সুব্রত (যাকে ভুল করে মৃত ভাবা হয়েছিল) এসে সুতপাকে তার নূতন অভিজ্ঞতার কথা বলছে। কিন্তু সুতপার পথ যে এখন ভিন্ন। জীবনের নতুন অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে বাস্তব আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে সেই নতুন পথেরই সে অনুগামিনী।

> "তাই সে পথেরই অনুসরণ করল সুতপা—রাত্রি তখন গভীর, আকাশে চাঁদ নেই, অস্ত গেছে অনেকক্ষণ, শুধু ঝিঁঝির শব্দ শোনা যায়। মানুষ ঘুমুচ্ছে, প্রাণীকুল ঘুমুচ্ছে। এরই মধ্যে ঘরের দোর খুলে ছেলেকে বুকে তুলে বেরিয়ে এল সুতপা। কাঁধে একটি ঝোলা, সে পালাচ্ছে, পালাতেই হবে তাকে। ওই যে সুব্রত ফিরে এসেছে—ওই যে নিষ্ঠুর বৃত্রাসুরের মত দুর্দান্ত, দুরন্ত নিষ্ঠুর রক্তপিপাসায় অধীর মানুষ—ওর হাত থেকে শিব্বাকে আর তার শ্বশুরকুলের সব পুণ্যের এবং তপস্যার স্পর্শমণির মত এই যে ঠাকুর—একে যে রক্ষা করতেই হবে।"[২]

সুতপা নিষ্ঠুর, হিংস্র মানুষের হাত থেকে তার সন্তান ও কুল-

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সুতপার তপস্যা, পৃঃ ১১৭।
(উল্টোরথ, বিংশবর্ষ সপ্তম সংখ্যা, ১৮৯৩ শকাব্দ)

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : সুতপার তপস্যা, পৃঃ ১১৮।

দেবতাকে বাঁচাতে এভাবে গৃহত্যাগ করল। কিন্তু এখানে সুব্রত কেন যে নিষ্ঠুর হল—কেন নরহত্যা করল এবং কেন তার এই পরিবর্তন এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। আর এই বৃত্রাসুরের মত মানুষের হাত থেকে পালিয়ে কোথায় আত্মরক্ষা করতে গেল সুতপা ? 'নূতনকাল' বলতে কোনকালের প্রভাত সে চায় ? একালই তো নূতন কাল একালেই তো নূতন বিশ্বাসের জন্ম হচ্ছে ? সে তার প্রাচীন ঐতিহ্য অর্থাৎ ঠাকুর, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ধর্মনিষ্ঠা নিয়ে কোথায় গিয়ে তবে আত্মরক্ষা করতে চায় ? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই এখানে। তারাশঙ্কর একালের মতবাদকে গ্রহণ করতে পারছেন না তাই কি তার নায়িকা ঈশ্বরবিশ্বাস, ধর্মনিষ্ঠা, ভগবৎ প্রীতি নিয়ে এই সংসার ত্যাগ করে গেল ? এতে আর যাই হোক, তার ঈশ্বরবিশ্বাস ও আচারনিষ্ঠাকে তো আর কেউ আক্রমণ করবে না—তাকে তা ত্যাগও করতে হবে না—এটুকুই কেবলমাত্র স্পষ্ট হয়। উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বা উপসংহারে এই গৃহত্যাগ ইত্যাদি সঙ্গতিহীন হয়েছে নিঃসন্দেহ—কিন্তু ঔপন্যাসিকের ঈশ্বর-বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ও অটুট হয়ে রয়েছে। বাস্তবজগতের ঘটনাবলীর সঙ্গে এ জাতীয় উপসংহার যোগসূত্রহীন হয়ে লেখকের ভাবাবেগকে এখানে অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবেই উল্লেখযোগ্য করেছে। তারাশঙ্করের রচনায় এভাবেই ঐতিহ্যানুরাগী অস্তিবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে না এসে আরোপিত হয়েছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সাহিত্যরসের হানি হয়েছে।

তারাশঙ্করের 'মানবতাবাদ', 'সত্যন্যায়বোধ', এই ঈশ্বরচিন্তার উৎস থেকেই উৎসারিত। ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সংস্কার, সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে সত্য, এবং বর্তমান জগতে প্রগতিশীল আধুনিক চিন্তার বিচারে এ তেমন অর্থবহ কিছু নয় যে সেকথাও সত্য। বরং অনেকক্ষেত্রে এই ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি কেন্দ্র করে নানা অনুদারতা সৃষ্টিরই আশঙ্কা দেখা

দেয়। কিন্তু এই ঈশ্বর-চিন্তা যদি সত্যন্যায়বোধের নিয়ন্ত্রণে সাহায্যকারী হয় তবে আপত্তি কিসের? এ ধর্ম যদি মানব ধর্ম হয় তবে বাধা কোথায়? আজ মানবসমাজে মানবকল্যাণ উদ্দেশ্যেই নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সুতরাং ধর্ম যদি মানবকল্যাণে নিয়োজিত কোন শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে তবে, আপত্তির কোন কারণ নেই। তারাশঙ্করের ধর্মের স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, এই 'ধর্ম' মানবকল্যাণকামী, সমাজহিতকর নিঃসন্দেহ। তাই অহিংসা, সত্য, ন্যায় ও সততার আদর্শ এই ধর্ম-নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি এই ধর্মকে ন্যায়-অন্যায় বিচারের মানদণ্ড হিসাবেই গ্রহণ করেছেন— একথা প্রথমেই বলা হয়েছে। অনেক সময় এই মানবতাবাদ ছাড়াও তিনি ঈশ্বরবিশ্বাস বা ধর্মনিষ্ঠাকে আশ্রয় করে তাঁর ভাবাবেগসর্বস্ব মনোভাব প্রকাশ করেছেন—সেজন্য দায়ী তাঁর কাল, তাঁর পরিবেশ। ঐ পরিবেশের প্রভাবে, ঐ কালের প্রভাবে তাঁর মানসিকতায় এই ধরনের সংস্কার বা বিশ্বাস থাকা খুবই স্বাভাবিক। তারাশঙ্কর সেই সংস্কার ও বিশ্বাসকে যথাসময়ে বর্জন না করে রচনাকে দুর্বল করেছেন এবং এতে তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

———

উপসংহার

উপন্যাস এমন একটি সাহিত্য-রীতি যেখানে শিল্পীমনের সচেতন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনের প্রতিরূপ অঙ্কিত হয়। জীবন থেকে খণ্ড খণ্ড উপাদান সংগৃহীত হয় এবং তাতে ভাবগত সংহতি প্রদান করে সৃষ্টি হয় এক অখণ্ড রসের। এই রসসৃষ্টি যেমন ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য, তেমনি জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততাও একটি আবশ্যকীয় লক্ষণ। এই বিশ্বস্ততা ঘটনার গতানুগতিক বিবরণে সীমিত রাখলেই চলে না, ঔপন্যাসিক সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আবিষ্কারকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তার বিচারবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি তাকে জীবনের সেই বিশিষ্ট উপাদানের প্রতি সদাজাগ্রত রাখবে, যেখানে কার্য-কারণ পরম্পরার মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে হৃদয়ের চিরন্তন ভাবানুভূতি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও কালকে অতিক্রম করে জীবনের গূঢ় রহস্য-চর্চার অবকাশ পেতে হয় ঔপন্যাসিককে, কারণ আঘাত-সংঘাত-সঙ্কুল বাস্তব জগৎ থেকে জীবনসত্যের উদ্ঘাটনই তার অন্বিষ্ট। সেইহেতু ঔপন্যাসিকমাত্রই দার্শনিকও বটে। ঔপন্যাসিকের আর একটি আবশ্যকীয় গুণ তাঁর ইতিহাসচেতনা। যে দেশকাল মানুষ তার উপন্যাসের উপজীব্য হবে তা ঐতিহাসিক বাস্তবাশ্রিত হওয়া চাই। ইতিহাসের চলমান ছন্দটিকে যথার্থ অনুধাবন করার ক্ষমতা না থাকলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী সমষ্টির ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের জটিল গ্রন্থিচ্ছেদ করা সঠিক না হতে পারে। রসবিস্তারের ক্ষেত্রে কল্পনার সাহায্য নিলেও তা বাস্তবকে অস্বীকার করবে না। বাস্তবকে ভিত্তি করেই যেহেতু ঔপন্যাসিকের কল্পনা বস্তুমূর্তি পরিগ্রহ করে, সেজন্যই দেশকাল সমাজ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের জ্ঞান ও সচেতন দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, গজদন্তমিনারে সমাসীন থেকে এই দেশ ও কাল চেতনার

তত্ত্বগত রূপ সম্বন্ধে অবগতিই যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষের সাহচর্যে, অন্তরঙ্গতায় যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের অংশীদার হয়ে সুখে-দুঃখে-দুর্ভিক্ষে-রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, মানবচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বৈচিত্র্য ও সত্য সম্পর্কে ধারণা তাতে স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভব হয়। সর্বোপরি ঔপন্যাসিককে হতে হয় সংবেদনশীল প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন। যে লেখক পাঠককে কাঁদাবেন, তাঁর নিজেরও প্রথমে কাঁদবার ক্ষমতা থাকা চাই।[১]

বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্বে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনাটিতে এই কালচেতনা বা বাস্তব সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের চিত্রটি স্পষ্ট না হলেও উল্লিখিত হয়েছে, বাঙালী সমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া প্যারীচাঁদ বাস্তবচিত্রের মাধ্যমে অঙ্কিত করেছিলেন এবং তাতে পরিবর্তনের ধারাটি প্রদর্শন করা তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' অন্যান্য ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হয়েও এই সমকাল সচেতনতা এবং বাস্তববোধের জন্য বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। সেদিক থেকে তারাশঙ্কর এই ধারাটিরই অনুসরণ করেছেন, বলা চলে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের অন্যান্য লক্ষণ-সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর রচনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত রোমান্স এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাই উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে সমকালীন ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতীত ইতিহাসের স্থান-কাল-পাত্রকে নির্ভর করেছেন। সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মুখ্যত

১। R. A. Scott-James—The Making of Literature, p. 371.

তিনি রোমান্সকে প্রাধান্য দিয়েছেন, বৃহত্তর দেশ-কাল-চেতনা তাতে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর সমাজভিত্তিক উপন্যাসগুলি সার্থক রচনা হলেও তাঁর পরিধি নূতন মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ, বৃহত্তর সমাজজীবন সেখানে রূপায়িত হয়নি। তাই তাঁর intensity-র একটা ব্যাপক পটভূমি আমাদের চোখে পড়ে না যা ডিকেন্স, বালজাক ও টলস্টয়ের লেখায় পাওয়া যায়।

অতীত বা অলীক পটভূমিকায় জীবনের চিত্রায়নের এই বঙ্কিমী-রীতি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বর্জন করেছিলেন এবং রোমান্স ও ইতিহাসের আক্রমণ থেকে মুক্ত রেখে বাস্তবজীবনের ভিত্তিভূমির উপর তিনি উপন্যাসকে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সমসাময়িক দেশকাল চেতনাও তাঁর উপন্যাসে, বিশেষ করে 'গোরা'তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট যুগের সন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ আলোড়ন—দেশাত্মবোধের বিকাশকালের সমস্ত চাঞ্চল্য, ধর্মবিপ্লবের উদ্দীপনা, একাগ্রতা সমস্তই এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজজীবন—কৃষিভিত্তিক বিশাল গ্রামীণসমাজের সামগ্রিক রূপটি, তার ভাঙ্গাগড়া, উত্থান-পতনের মূল নিয়ন্তা-শক্তির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও চিত্রিত হয়নি বলা চলে।

বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। সাধারণ, নিম্নবিত্ত বা অন্ত্যজ সমাজ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জনের পথে তাঁদের নানা প্রতিবন্ধক ছিল। ফলে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিচিত্র মানবজীবনধারা তাঁদের রচনায় স্থান পায়নি। শরৎচন্দ্র অবশ্য সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতাও ছিল। কিন্তু তবু মানুষের নানা পারিবারিক সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যাই তাঁর উপন্যাসে মুখ্যতম স্থান পেয়েছে। অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, পথের দাবী বা এই জাতীয় অন্যান্য উপন্যাসে সমাজের বিভিন্ন অত্যাচার-অনাচারের, সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠলেও

শরৎচন্দ্র এর মর্মমূলে যে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে, সে সম্পর্কে সোচ্চার নন। তাই সমাজজীবনের বিভিন্ন শক্তিগুলি কিভাবে, কত গভীরে মানবজীবনকে আন্দোলিত করছে তার কোন সুস্পষ্ট পরিচয় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও পাওয়া যায় না।

সমাজচিত্র থাকলেই কোন উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস বলা চলে না। সমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস, যথার্থ অর্থে আমাদের ভাষা বা অন্যান্য ভাষায় কমই রচিত হয়েছে। এই জাতীয় উপন্যাসে প্রবহমান জীবনধারার গতি ও প্রকৃতির স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা প্রয়োজন। বর্তমানকালে উপন্যাসে সেইজন্যই সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অধিকতর ও সুস্পষ্ট জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়. এই ধরনের রচনায় বিশেষ যুগের, বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক আলেখ্যচিত্রণের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে জীবনের ভাঙ্গাগড়ার দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অনুসন্ধান করতে হয় ঔপন্যাসিককে।[১] মানুষের জীবন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে না, নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্র ধরে ক্রমাগত তা বিকশিত হতে থাকে এবং এই বিকাশ সমাজ-নিরপেক্ষ কোন ব্যাপার নয়। তাই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দেশকাল ও সমাজের সচলতার রূপরেখা অঙ্কনই সামাজিক উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ বলা চলে এবং এই অর্থেই তারাশঙ্করের উপন্যাসকে যথার্থ সামাজিক বা সমাজ-কেন্দ্রিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যায়।

ব্যক্তিজীবনকে আশ্রয় করে তারাশঙ্কর সমগ্র সমাজের সচল রূপটি আত্মস্থ করেছেন। গ্রাম্যসমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নানাবিধ অন্তঃশক্তি ও বহিঃশক্তি কিভাবে কত গভীরে সমাজকে প্রভাবিত করেছে বা করছে, তারাশঙ্কর তার কার্যকারণ সম্পর্কটি আবিষ্কার করতে সর্বদাই সচেষ্ট। গ্রামীণ-

১। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর, পৃঃ—৫৬৮-৫৬৯ (কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮)।

সমাজের চলিষ্ণুতা যে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, দেশকাল ও বিশ্বের বৃহত্তর পরিবর্তন যে এই গ্রামীণ-জীবনকে বা অন্ত্যজ সমাজকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে, তিনি সে সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ। তাই বিশ্ব মহাযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ যে গ্রামীণ-জীবনে নানা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তাঁর উপন্যাসে তাও স্পষ্ট রূপায়িত হতে দেখা যায়। তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে মতভেদের অবকাশ থাকলেও গতিশীল সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র হিসাবে তাঁর সাহিত্য-মূল্য অবশ্যই স্বীকৃত ও সমাদৃত হবে। উপরন্তু শৈলজানন্দ ধানবাদ রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলিকামিন বাউড়ীদের জীবনকথা দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে নবীন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, তারাশঙ্কর সেই ধারাকে গ্রহণ করে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেলেন, "তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের পন্থী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন।"[১]

রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ সমাজকে মর্যাদার সঙ্গে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন তারাশঙ্কর। তাঁর সমগ্র সাহিত্য রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অবজ্ঞাত জনসমাজের কলরবমুখর। এই প্রাকৃত জনকে তিনি বৃত্তি অনুযায়ী উপাস্থত করেছেন। সমাজের যে অবস্থায় তাদের বসবাস সেই পারিপার্শ্বিকসহ ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আচার-আচরণ সমস্ত অর্থাৎ পূর্ণ জীবনধারা নিয়ে এরা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষুদ্রগোষ্ঠীভুক্ত এই মানুষেরা তাঁদের সংস্কৃতির পসরা নিয়ে প্রবেশ করেছে তাঁর রচনায়—বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির বর্ণনা তাই তাঁর উপন্যাসকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাঁর অনুসন্ধিৎসা নৃতত্ত্ববিদ কিংবা সমাজ-

১। ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ৩৪২

তত্ত্ববিদের চেয়ে কম নয়। সাহিত্য তো বটেই উপরন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাস সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মর্যাদা দাবী করতে পারে।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের মূল্যায়নকালে তাঁর উপন্যাসের যে অন্যতম সাধারণ সূত্রটি পাওয়া যায়, তা হল জীবনের দ্বন্দ্বময় রূপটি সম্পর্কে তাঁর সতর্ক সচেতনতা এই দ্বন্দ্বের সামগ্রিক রূপটি অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ, দেশ সর্বত্র যে এই দ্বন্দ্বেরই নানা প্রকাশ, ঔপন্যাসিক সেই সত্যটিকে নানাভাবে বিবৃত করেছেন। ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্বের পশ্চাতে থাকে দেশ, সমাজ ও কালের দ্বন্দ্ব, অর্থনীতি, রাজনীতির দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর এই দ্বন্দ্বটিকে বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করে এর উৎস অনুসন্ধান করেছেন। সেকাল ও একালের দ্বন্দ্ব বা যুগসন্ধির দ্বন্দ্ব বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে তারাশঙ্কর কাহিনী-নির্বাচনে বরাবরই সেই দ্বন্দ্বটিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। যে পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক পটভূমি শিল্পী তারাশঙ্করের নেপথ্যে রয়েছে, এরই সহায়তায় অতি স্বাভাবিকভাবেই দ্বান্দ্বিক রূপটি তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়েছে। যে কালের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর তাঁর চরিত্রগুলি সংস্থাপন করেছেন সেকালের এই পটভূমিকায় নবোদিত নানা শক্তি এবং অস্তমিত বহু ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বটি ছিল অতি বাস্তব সত্য। এই দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের ব্যক্তি-মানসের সত্য, দেশকাল যুগের সত্য। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেও নূতন যুগের আবির্ভাবে ও গ্রাম-জীবনে যে উত্তাল আলোড়ন (সনাতন সমাজের ক্ষয়, পতন আর নূতন সমাজের ভিত্তি রচনা) সৃষ্টি হয়েছিল, তারাশঙ্কর তার প্রত্যক্ষদর্শী। বিবর্তনকালের এই অতি বাস্তব সত্যের নিখুঁত চিত্রটি ইতিহাস হয়ে থাকবে ভাবী-কালের পাঠকের কাছে। এই সন্ধিলগ্নটি সমাজ, দেশ ও জন-সাধারণকে যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করেছিল, তারাশঙ্কর তার সার্থক কলাকার।

কৃষি-নির্ভর গ্রাম-জীবন, সমাজ-জীবন, লোকজীবন কিংবা দেশ-কাল সম্পর্কে বাস্তব সচেতনতা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের মানসিকতা স্ববিরোধ মুক্ত নয়। তাঁর একদিকে ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিপন্ন, নিরীহ, কৃষিজীবীদের দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশার উদ্ঘাটন; তাদের প্রতি অপরিসীম সহমর্মিতাবোধ; সামাজিক-রাজনৈতিক মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আন্তরিক ক্ষোভ; অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় জমিদারতন্ত্রের অস্তগামী আভিজাত্যকে মহিমান্বিত করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা। ধর্ম ন্যায় সত্যকে অবলম্বন করে পুরাতন সমাজব্যবস্থার প্রতি অহেতুক আকর্ষণও তাঁকে সংশয়ান্বিত ও দুর্বল করেছে বলেই মনে হয়। তাই তারাশঙ্করের মধ্যে এক ধর্মীয় আবেশগ্রস্ত প্রজাহিতৈষী জমিদার সন্তান মাঝে মাঝেই মাথা তুলে দাঁড়ায়, শ্রমজীবী জনগণের প্রতি নিপীড়নে সে কাতর অথচ যে সমাজ-ব্যবস্থা এই উৎপীড়নের জন্য দায়ী তাঁর সম্পূর্ণ পতনে সে বিষাদগ্রস্ত। শ্রমজীবী মানুষের জন্য সমবেদনা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করতে সম্ভবত দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন—এবং ওই শ্রেণীগত দুর্বলতা থাকার ফলে নবীন ধনতন্ত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রহণ করেই তারাশঙ্কর কেবল তাদের নগ্ন রূপটির উদ্ঘাটন করেছেন। নতুবা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে সামন্ততন্ত্র কিংবা ধনতন্ত্র কোনটিই কাম্য নয়। তারাশঙ্কর সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের কল্যাণকর রূপটিকে উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি অথচ ধনী ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তিনি নীরব। সুতরাং এই পক্ষপাতিত্বটুকু তাঁর সামন্ততন্ত্রের প্রতি দুর্বলতার নামান্তর। তারাশঙ্কর কখনো জমিদারী শোষণকে তীব্র কশাঘাত করেননি একথা বিস্মৃত হলে চলবে না। অথচ সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ যে বাংলা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল এবং ইতিহাসের গতি অনুসরণ করে ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্র অপেক্ষা প্রাগ্রসর অবস্থা—তারাশঙ্কর এসব সত্যকে গুরুত্ব দেননি। শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি তারাশঙ্করের যে

সহানুভূতি বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা গেছে সেটা সম্ভবত যতটুকু শ্রমজীবীদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বশত, তারচেয়ে অনেক বেশি ব্যবসায়ী পুঁজির প্রতি বিরাগহেতু। বণিক অর্থনীতি শোষণ রূপটির উদ্ঘাটনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তারাশঙ্করের উপন্যাসে শ্রমিকজীবন ততটুকুই পরিস্ফুট হয়েছে।

আবার শোষণের অন্যতম সহযোগী যে ধর্ম, তারাশঙ্করের শ্রদ্ধাবোধ সেই ধর্মের প্রতি কখনোই শিথিল হয়নি। ধর্ম যদিও তাঁর কাছে নীতিবোধের সূত্র ছিল বলে তিনি বারংবার উচ্চারণ করেছেন, তবু প্রজাদের প্রচণ্ড দুঃসময়েও তাঁর সৃষ্ট নায়ক দেবু ন্যায়রত্নের প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ অনুভব করেছেন, ধর্মহীনতার জন্য বিশুভাইয়ের আদর্শ বা নির্দেশ কোনকালেই সে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেনি। এই অবস্থায় গান্ধীবাদী প্রত্যয়ের আড়ালে আত্মগোপন করা ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে?

অবশ্য ত্রিশের দশকে এই ছিল আমাদের সমাজের রূপ। ধর্ম-চেতনা ও রাজনীতি চিন্তার নানা সংশয় সেখানে স্পষ্ট ছিল। কৃষক সমাজ ও কৃষি অর্থনীতির যে ভিত্তি গ্রামীণ সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে তীব্রবেগে তাতে পরিবর্তন শুরু হয়—লোভী মূলধনী ও ব্যবসায়ী ধনতন্ত্রের লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এই কৃষিসমাজ। শোষণ উচ্ছেদ আর পীড়নের শিকার হয়েও গ্রামীণ সমাজের পক্ষে এই অত্যাচার প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য একথাও সত্য যে, কৃষকদেরও একটি বৃহৎ অংশ রাজনৈতিক অচেতনতাহেতু বণিকতন্ত্রকে যত শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে, সামন্ততন্ত্রকে ততখানি শত্রু মনে করেনি। দীর্ঘকাল ধরে জমিদারদের অত্যাচার সইবার পর গ্রাম্য সমাজে সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গন ধরেছে, আবির্ভূত হয়েছে নব্য ধনিক শ্রেণী—যারা আপেক্ষিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগামী শক্তি। কিন্তু এই ধনিক সভ্যতা ও যন্ত্রশক্তি এক রহস্যময় শত্রুরূপে প্রতিভাত হয়েছে পল্লীসমাজে।

অতএব নবীন সমাজ-ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতে তারাও
তারাশঙ্করের রচনায়ও এই কুণ্ঠা—পুঁজিবাদের প্রতি তিনি প্রতিবাদ-মুখর—শোষণের প্রতি রুষ্ট কিন্তু সহিংস প্রতিরোধে, বলিষ্ঠ প্রতিবাদে তাঁর অনীহা। সেই সময়ে গ্রাম্য সমাজে যদিও বা কখনো সামন্তবাদী অত্যাচারের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে, তবু এই সচেতনতা সেখানে ক্ষণস্থায়ী। সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েও তারা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারত না। এছাড়া কৃষিজীবী সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাদের বৃহত্তম অংশ কেবল ঈশ্বর, ধর্ম, নীতিকে আশ্রয় করেই অশ্রুমোচন করেছে, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সব কর্মফল হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারাশঙ্করও হিংসার দ্বারা অন্যায়কে দমন করতে নারাজ—বরং নীতিবাদের দ্বারা পরিবর্তিত সমাজকেই তাঁর অলীক কল্পনার পরিবর্তিত সমাজ বলে চিন্তা করেন। বস্তুত সমাজ সম্পর্কের যে সকল নূতন বিধি-বিধান বিধ্বস্ত কৃষি ও কৃষককে মুক্তি দিতে পারত—পথ প্রদর্শন করতে পারত, সে সম্পর্কে তারাশঙ্কর আশ্চর্য রকম উদাসীন। অবশ্য এতে তাঁর উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য খর্ব হয়নি—যেহেতু সেকালের বাস্তব অবস্থাও তেমনি ছিল। বরং স্বীকার করতে হয়, সামন্তবাদী ব্যবস্থার দুঃসময়ে ধনতন্ত্রের বিকাশ কালে তিনি বিস্তৃতভাবে সমাজের সঙ্গে পুঁজির প্রাধান্যের সম্পর্ক, অর্থের ভূমিকা, কৃষক আন্দোলন বিভক্তিকরণে সাম্প্রদায়িকতার আমদানী ইত্যাদি যাবতীয় প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সর্বদা সহমত হতে না পারলেও, এতে ইতিহাসের ক্রান্তিশীল চরিত্রটি অনুধাবনে কোন অসুবিধা হয় না।

তারাশঙ্করের মধ্যে যে স্ববিরোধ তা কেবলমাত্র তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিমানসের স্ববিরোধ নয়। তারাশঙ্কর যে পরিবারের সন্তান, যে পরিবেশে লালিত-পালিত, যে রাজনীতিতে বিশ্বাসী—স্ববিরোধ সেখানে অনিবার্য, এই স্ববিরোধ তখন সমগ্র দেশের সমাজ, সংস্কৃতি,

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পরিব্যাপ্ত। সমকালীন রাজনীতি সচেতন ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনও তখন এই স্ববিরোধমুক্ত নয়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আকুতিকে স্বীকৃতি দিয়েও চেষ্টা হয়েছে পরিবর্তনের গতিটিকে শ্লথ করার, শিল্প-যুগকে স্বাগত জানিয়েও প্রচেষ্টা চলেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে সুরক্ষিত রাখার—প্রাচীন অনুশাসনের সঙ্গে নবীন প্রত্যয়ের সংমিশ্রণের। সমাজের যে শ্রেণীতে তারাশঙ্করের অধিষ্ঠান ছিল, তাতে প্রাচীনের কঙ্কালের উপর নবীনের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে আমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠিত হওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় তাঁর ঐতিহ্যানুরাগের নানা কারণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি প্রশান্ত সহিষ্ণুতায় এক অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম হিসাবেই তা মেনে নিয়েছেন—তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষক কলে খাটতে গেছে দারিদ্র্যের তাড়নায়। কিন্তু তবু স্বীকার করতে হয়, যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি দেশকালের সমস্যার মূলটিকে আবিষ্কার করেছিলেন, স্ববিরোধমুক্ত না হওয়ার জন্যই যথার্থ প্রগতিশীল উপায়ে তিনি তা উপস্থাপিত করতে পারেননি। যে যুগটিকে তিনি তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি নিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তাঁর ঐতিহ্যানুরাগী চিন্তা, তাঁকে সে কালের সমস্যাগুলির মূল্যায়নকালে যথাযথ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে দেয়নি।

এই সকল স্ববিরোধী মনোভাবের ফলেই তারাশঙ্কর যুগযন্ত্রণাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেও এর নিরসনের কোন যুক্তিগ্রাহ্য ইঙ্গিত দেননি উপন্যাসে। অনুভব করে, দ্বন্দ্বটিকে রূপায়িত করেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। ফলে তিনি হয়েছেন ইউটোপীয়ান। বাস্তববাদী লেখক হয়েও তাঁর ভাবাদর্শের অন্তর্বস্তু হয়েছে রক্ষণশীল। দীর্ঘদিন ধরে লালিত-পালিত সংস্কার ও ন্যায়বোধের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। তাই দেখা যায়, কেবলমাত্র অহিংস প্রতিরোধেই

তাঁর প্রত্যয়, হিংসার নামে বিরাগ, যা কিছু বস্তুগত তাই মিথ্যা, এই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। এছাড়া পরমাত্মার কাছে আবেদন-নিবেদন, নৈতিক আত্মশুদ্ধি ইত্যাদির উপরও তিনি অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরবিশ্বাস এবং এই ঈশ্বরবিশ্বাসের নামেই অনেক সময় তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করে ভাবলোকে বিচরণ করেছেন। যুক্তিবাদী, বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তাধারাকে বর্জন করে তাঁর মত দেশকাল-সমাজ-সচেতন শিল্পী শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের নামে সব উৎসর্গ করতে ইতস্তত: করেননি। বাস্তবজীবনের সকল সমস্যাকে ঈশ্বরবিশ্বাস বা ঈশ্বর-নির্ভরতার অন্তরালে রেখে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে—বাস্তবজীবন থেকে যেন আত্মরক্ষা করেছেন মনে হয়।

কিন্তু সমস্ত দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেও তারাশঙ্করকে মহৎ শিল্পীর মর্যাদা দিতে হয়। ভাবের যথাযথ প্রকাশ সৎ সাহিত্য হিসাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে, কিন্তু মহৎ শিল্প হওয়ার জন্য ভাব-কল্পনার সমৃদ্ধি ও বৃহত্তর ব্যঞ্জনা থাকা চাই। "মানবহৃদয়, বিশ্বের ব্যাপ্তি যাহার মধ্যে যতখানি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, mind এবং soul উভয়ই যাহার ষ্টাইল পুষ্ট করিয়াছে, যে রচনায় অতিশয় জটিল বিষয় বিস্তার যেমন সুসমৃদ্ধ আকারে পরিণত হইয়াছে তেমনই colour ও mystic perfume বাদ পড়ে নাই এবং যাহার মধ্যে soul of humanity, বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রস-সৃষ্টি, তাহাই Great art—অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল।"[১] বলতে দ্বিধা নেই মহৎ শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য তারাশঙ্করের সকল রচনায় না হলেও বেশ কয়েকটি রচনায় উপস্থিত। ভাব-কল্পনার বৃহত্তর ব্যঞ্জনা ও বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন তাঁর রচনাকে এই মহত্ত্ব দান করেছে। জীবনকে তিনি কেবল তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের

১। মোহিতলাল মজুমদার: সাহিত্যের ষ্টাইল (সাহিত্য বিচার), পৃঃ ১০৮

মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেননি, জীবনের অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটিকে এবং জীবনের বিশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে অখণ্ড জীবনধারাকে তিনি অন্বেষণ করেছেন। আত্মমগ্ন শিল্পী বহির্বিশ্বের বাস্তবসত্যকে যেমন নিরীক্ষণ করেছেন, তেমনি অন্তরের অন্তঃস্থলেও জীবনসত্যের অনুসন্ধান করেছেন। তাই মানবজীবনের, মানবহৃদয়ের বিশ্বজনীন অভিব্যক্তিটি পরিস্ফুট হয়েছে, সর্বকালের বিশ্বজনের হৃদয়মুকুলটি প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। মানুষকে তাঁর পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রচেষ্টাই তাঁর উপন্যাসকে মহিমান্বিত করেছে বলা চলে।

তারাশঙ্কর কিংবা যে কোন মহৎ সাহিত্যিকের নিকটই বোধহয় —"সাহিত্যিক ও শাস্ত্রকারে কোন প্রভেদ নেই। যাঁর ভাবনা, যাঁর দৃষ্টি, যাঁর সৃষ্টি জীবনের সহিতে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে চলে তিনি সাহিত্যিক। ব্যক্তিগত জীবনে, নিদ্রায়, জাগরণে মানুষের জীবনকে পীড়িত করে নিজের অন্যায় প্রলোভন পীড়িত করে ক্রোধ, পীড়িত করে হিংসা, পীড়িত করে মৃত্যুভয়, সমষ্টিগত জীবনে পীড়িত করে বিকৃত সমাজশাসন, বিকৃত রাষ্ট্রশাসন, অত্যাচারীর অত্যাচার—সাহিত্য এই সকলপ্রকার শাসনের পীড়ন থেকে পরিত্রাণের প্রেরণা জোগায়।"[১] তাই তারাশঙ্কর বলেছেন "সাহিত্য আমার কাছে চায়ের পেয়ালার মত অবসর ও ক্লান্তিবিনোদনের পানীয় সামগ্রী নয়, সে আমার কাছে প্রাণরসদায়ী সঞ্জীবনীসুধা।"[২] তারাশঙ্কর কেন, যে কোন শিল্পীর পক্ষেই এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এমন আন্তরিকভাবে সাহিত্যকে বরণ করলেই তো সাহিত্য-সাধনা জীবন-সাধনার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সাহিত্য তখন জীবনের সর্বপ্রকার পীড়ন থেকে মুক্তিদানেও সক্ষম হয়, জীবনে পরম আশাবাদ ও পরম প্রত্যয় সঞ্চারিত করে, আত্মসম্ভ্রমবোধের জন্ম দেয়।

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যের সত্য, পৃঃ ২০।
২। " " " পৃঃ ৩৮।

তারাশঙ্কর এইজন্যই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আশাবাদী, জাগতিক সকলপ্রকার বিরূপতার মধ্যেও তিনি আশাবাদকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, প্রশান্ত সহিষ্ণুতায় সকল বিরূপতাকে গ্রহণ করে। জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন এবং কালের দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন। বরং অনির্বাণ আশার আলো তাঁকে অবাস্তব স্বপ্নরাজ্য সৃজনেও উদ্বুদ্ধ করেছে, তবু জগতের প্রতি জীবনের প্রতি কোন বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেনি।

এই কল্যাণবোধের আদর্শই তাঁকে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী করে তুলেছে মনে হয়। কারণ তারাশঙ্করের ঈশ্বর ন্যায় শুদ্ধতার প্রতীক, কল্যাণের প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ঈশ্বরচিন্তা একদিকে তাঁকে যেমন বাস্তববিমুখ করেছে, অপরদিকে তাঁকে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে অনুপ্রাণিত করেছে, মানুষের প্রকৃত সত্তাটিকে আবিষ্কার করতে আগ্রহান্বিত করেছে। তাঁর মতে এই ঈশ্বরবিশ্বাসই তাঁকে অন্যায়ের, অনাচারের, হিংসা-কুটিলতায় তমসাচ্ছন্ন হতে দেয়নি—তাঁর বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করে রেখেছে। তারাশঙ্কর ঈশ্বর বিশ্বাসের আলোকে আপ্লুত হয়ে মানুষকে অবলোকন করেছেন—বিকশিত হয়েছে তাঁর মানবপ্রেম। তাই অন্ত্যজ, অভিজাত, অপরাধী-অবিশ্বাসী, প্রতারক-প্রবঞ্চক, দরিদ্র-ধনী, দুশ্চরিত্র-সচ্চরিত্র —সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল। যে নিঃস্ব কাহার, বাগ্দী, মুচি, ডোম জনগণ তাঁর সাহিত্যের বিশেষ উপজীব্য, কেবল সহানুভূতি কিংবা অনুকম্পার অশ্রুজলেই তাদের অভিষিক্ত করেননি, তর্পণ করেছেন তাদের তাঁর শ্রদ্ধার নির্মল জলে। তাই 'কবি'র বেশ্যা মেয়ে বসন, 'পাষাণ পুরী'র খুনী কালী কামার, 'সপ্তপদী'র দুশ্চরিত্রা রীনা-র মত অসংখ্য চরিত্র তাঁর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে ও মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পী তারাশঙ্কর তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে উদার মানবপ্রেমকেই অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিয়ে মানুষের মহিমান্বিত মূর্তিটিকে চিরন্তন মর্যাদা দিয়েছেন।

পরিশিষ্ট

: গ্রন্থপঞ্জী :

গ্রন্থ	লেখক
আমার ধ্যানের ভারত	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
আধুনিক উপন্যাসে মানব প্রত্যয়	অরবিন্দ পোদ্দার
উপন্যাসের কথা	ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়
উপন্যাসের কথা	ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য
একালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল	সত্য গুহ
ঔপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে	মার্কস এঙ্গেলস
কল্লোল যুগ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলা-দেশের কৃষক	বদরুদ্দিন উমর
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (শিক্ষা গ্রন্থে সংকলিত)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারাশঙ্কর রচনাবলী (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর	হরপ্রসাদ মিত্র
তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন	লেনিন
দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য	ডঃ গোপীকামোহন রায়চৌধুরী
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	বিনয় ঘোষ
বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়	ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৫ম সংস্করণ)	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ	লেখক
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)	ডঃ সুকুমার সেন
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড ২য় সংস্করণ)	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড :ম সংস্করণ)	ঐ
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	সুপ্রকাশ রায়
ভারতীয় দর্শন	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র রচনাবলী (৩য় খণ্ড)	রবীন্দ্রনাথ
স্ব-নির্বাচিত গল্প	প্রেমেন্দ্র মিত্র
সাহিত্য বিজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	মোহিতলাল মজুমদার
সাহিত্য বিচার (২য় সংস্করণ)	ঐ
1. A Readers Guide to Literary Terms	Karl Beckson and Arthur Ganz.
2. Asia and Africa : Fundamental Changes	Editorial Board : B. C. Gafurov, G. F. Kim. S. N. Rostovsky, R. A. Ulyansky, V. D. Solo Dovrikov.
3. An Acre of Green Grass	Buddhadev Basu
4. Aspects of the Novel	E. M. Forster.
5. Critiques and Essays on Modern Fiction	J. W. Aldridge.
6. Indian Philosophy (Vol. I)	S. Radhakrishnan
8. do (Vol. II)	do
9. History of the Freedom Movement in India	Tarachand

গ্রন্থ	লেখক
10. Lenin on Literature and Art	V. I. Lenin
11. Poets and Story-tellers : a book of Critical Essays	David Cecil
12. Social Background of Indian Nationalism	A. R. Desai
13. Treatise on the Novel	Robert Liddell
14. The Cultural Approach to History. (Edited for the American History Association)	Caroline F. Ware Columbia University
15. The Novel and the People.	Ralph Fox
16. Ten Novels and their Authors.	W. Somarset Maugham
17. The Making of Literature	R. A. Scott James
18. The Novel and the Modern World	David Daiches
19. The Psychological Novel	Leon Edel
20. The Art of Writing	Andre Mourois

: পত্র-পত্রিকা :

	নাম	সংখ্যা
১।	অমৃত	৪৯ সংখ্যা
২।	এক্ষণ	নবম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা
৩।	কথাসাহিত্য	ত্রয়োবিংশ বর্ষ,দ্বিতীয় সংখ্যা
৪।	কম্পাস	শারদীয়া সংখ্যা
৫।	কম্পাস	ঐ
৬।	কালি ও কলম	তারাশঙ্কর স্মৃতি-সংখ্যা
৭।	চিত্রাঙ্গদা	তারাশঙ্কর সংখ্যা
৮।	দেশ	সাহিত্য সংখ্যা
৯।	দেশ	....
১০।	নন্দন	আষাঢ় সংখ্যা
১১।	বেতার জগৎ	৪১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা
১২।	শনিবারের চিঠি	
১৩।	শনিবারের চিঠি	তারাশঙ্কর সংখ্যা
১৪।	শনিবারের চিঠি	তারাশঙ্কর সংখ্যা
১৫।	Report of Sedition Committee	

: তারাশঙ্করের রচনা :

১।	ত্রিপত্র	(কাব্য)	১৯২৬	১৫ই ফেব্রুয়ারী
২।	চৈতালী ঘূর্ণি	(উপন্যাস)	১৩৩৮	আশ্বিন
৩।	পাষাণপুরী	”	১৩৪০	আষাঢ়
৪।	নীলকণ্ঠ	”	১৩৪০	আশ্বিন
৫।	রাইকমল	”	১৩৪১	”
৬।	প্রেম ও প্রয়োজন	”	১৩৪২	”
৭।	ছলনাময়ী	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৪৩	বৈশাখ
৮।	জলসাঘর	(গল্প গ্রন্থ)	১৩৪৪	শ্রাবণ
৯।	আগুন	(উপন্যাস)	১৩৪৪	”
১০।	রসকলি	(গল্প)	১৩৪৫	বৈশাখ
১১।	ধাত্রীদেবতা	(উপন্যাস)	১৩৪৬	আশ্বিন
১২।	কালিন্দী	”	১৩৪৭	ভাদ্র
১৩।	তিনশূন্য	(গল্প গ্রন্থ)	১৩৪৮	বৈশাখ
১৪।	কালিন্দী	(নাটক)	১৩৪৮	শ্রাবণ
১৫।	দুই পুরুষ	”	১৩৪৯	আষাঢ়
১৬।	গণদেবতা	(উপন্যাস)	১৩৪৯	আশ্বিন
১৭।	পথের ডাক	(নাটক)	১৩৪৯	ফাল্গুন
১৮।	প্রতিধ্বনি	(গল্প গ্রন্থ)	১৩৫০	আশ্বিন
১৯।	বেদেনী	”	১৩৫০	”
২০।	দিল্লীকা লাড্ডু	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫০	কার্তিক
২১।	মন্বন্তর	(উপন্যাস)	১৩৫০	মাঘ
২২।	পঞ্চগ্রাম	”	১৩৫০	”
২৩।	যাদুকরী	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫০	ফাল্গুন
২৪।	স্থলপদ্ম	”	১৩৫০	”
২৫।	কবি	(উপন্যাস)	১৩৫০	”
২৬।	১৩৫০	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫১	অগ্রহায়ণ

২৭।	বিংশ শতাব্দী	(নাটক)	১৩৫১	মাঘ
২৮।	চকমকি	(প্রহসন)	১৩৫২	জ্যৈষ্ঠ
২৯।	দ্বীপান্তর	(নাটক)	১৩৫২	আষাঢ়
৩০।	প্রসাদমালা	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫২	শ্রাবণ
৩১।	হারানো সুর	„	১৩৫২	অগ্রহায়ণ
৩২।	সন্দীপন পাঠশালা	(উপন্যাস)	১৩৫২	মাঘ
৩৩।	ঝড় ও ঝরাপাতা	(কালবৈশাখী)	১৩৫৩	অগ্রহায়ণ
৩৪।	অভিযান কালবৈশাখী	(উপন্যাস)	১৩৫৩	পৌষ
৩৫।	ইমারৎ	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫৩	মাঘ
৩৬।	রামধনু	„	১৩৫৪	বৈশাখ
৩৭।	তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠগল্প	„	১৩৫৪	পৌষ
৩৮।	শ্রীপঞ্চমী	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫৪	মাঘ
৩৯।	সন্দীপন পাঠশালা	(উপন্যাস) (কিশোর সংস্করণ)	১৩৫৪	ফাল্গুন
৪০।	তামস তপস্যা	„	১৩৫৪	চৈত্র
৪১।	কামধেনু	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫৫	ভাদ্র
৪২।	পদচিহ্ন	(উপন্যাস)	১৩৫৭	বৈশাখ
৪৩।	উত্তরায়ণ	„	১৩৫৭	আষাঢ়
৪৪।	মাটি	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫৭	কার্তিক
৪৫।	আমার কালের কথা	(আত্মজীবনী)	১৩৫৮	জ্যৈষ্ঠ
৪৬।	হাঁসুলীবাঁকের উপকথা	(উপন্যাস)	১৩৫৮	আষাঢ়
৪৭।	যুগবিপ্লব	(নাটক)	১৩৫৮	শ্রাবণ
৪৮।	শিলাসন	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৫৮	মাঘ
৪৯।	নাগিনীকন্যার কাহিনী	(উপন্যাস)	১৩৫৯	আশ্বিন
৫০।	বিচিত্র	(নিবন্ধ)	১৩৫৯	চৈত্র
৫১।	আরোগ্যনিকেতন	(উপন্যাস)	১৩৫৯	„
৫২।	আমার সাহিত্য জীবন (১ম পর্ব)	(আত্মজীবনী)	১৩৬০	শ্রাবণ
৫৩।	তারাশঙ্করের প্রিয়গল্প	(গল্প গ্রন্থ)	১৩৬০	কার্তিক

৫৪।	না	(উপন্যাস)	১৩৬০	চৈত্র
৫৫।	স্বনির্বাচিত গল্প	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬১	শ্রাবণ
৫৬।	চাঁপাডাঙ্গার বৌ	(উপন্যাস)	১৩৬১	শ্রাবণ
৫৭।	গল্পসঞ্চয়ন	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬১	পৌষ
৫৮।	বিস্ফোরণ	(„)	১৩৬২	জ্যৈষ্ঠ
৫৯।	কৈশোর স্মৃতি	(আত্মজীবনী)	১৩৬৩	শ্রাবণ
৬০।	পঞ্চপুত্তলী	(উপন্যাস)	১৩৬৩	ভাদ্র
৬১।	কালান্তর (পদচিহ্নর ২য় পর্ব)	(„)	১৩৬৩	ভাদ্র
৬২।	ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৩	ভাদ্র
৬৩।	কবি	(নাটক)	১৩৬৪	আষাঢ়
৬৪।	বিচারক	(উপন্যাস)	১৩৬৪	শ্রাবণ
৬৫।	কালরাত্রি	(নাটক)	১৩৬৪	অগ্রহায়ণ
৬৬।	বিষপাথর	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৪	অগ্রহায়ণ
৬৭।	সপ্তপদী	(উপন্যাস)	১৩৬৪	পৌষ
৬৮।	বিপাশা	(„)	১৩৬৪	মাঘ
৬৯।	রাধা	(„)	১৩৬৪	চৈত্র
৭০।	মানুষের মন	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৫	বৈশাখ
৭১।	ডাকহরকরা	(উপন্যাস)	১৩৬৫	বৈশাখ
৭২।	রচনাসংগ্রহ ১ম খণ্ড	(সংকলন)	১৩৬৫	শ্রাবণ
৭৩।	রবিবারের আসর (বিষপাথর-এর পরিবর্তিত)	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৫	শ্রাবণ
৭৪।	মস্কোতে কয়েকদিন	(ভ্রমণবিবরণী)	১৩৬৫	আশ্বিন
৭৫।	প্রেমের গল্প	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৭	শ্রাবণ
৭৬।	মহাশ্বেতা	(উপন্যাস)	১৩৬৭	আষাঢ়
৭৭।	যোগভ্রষ্ট	(„)	১৩৬৭	শ্রাবণ
৭৮।	পৌষলক্ষ্মী	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৭	শ্রাবণ
৭৯।	আলোকাভিসার	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৭	অগ্রহায়ণ
৮০।	সাহিত্যের সত্য	(প্রবন্ধ সঙ্কলন)	১৩৬৭	„

৮১।	নাগরিক	(উপন্যাস)	১৩৬৭	অগ্রহায়ণ
৮২।	নিশিপদ্ম	(উপন্যাস)	১৩৬৭	মাঘ
৮৩।	চিরন্তনী	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৮	ফাল্গুন
৮৪।	যতিভঙ্গ	(উপন্যাস)	১৩৬৯	বৈশাখ
৮৫।	কান্না	(উপন্যাস)	১৩৬৯	বৈশাখ
৮৬।	এ্যাকসিডেণ্ট	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৯	„
৮৭।	সংঘাত	(নাটক)	১৩৬৫	জ্যৈষ্ঠ
৮৮।	ছোটদের ভালোভালো গল্প	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৬৯	আষাঢ়
৮৯।	আমার সাহিত্য জীবন (২য় পর্ব)	আত্মজীবনী	১৩৬৯	অগ্রহায়ণ
৯০।	তমসা	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭০	বৈশাখ
৯১।	কালবৈশাখী	(উপন্যাস)	১৩৭০	জ্যৈষ্ঠ
৯২।	ভারতবর্ষ ও চীন	(প্রবন্ধ)	১৩৭০	শ্রাবণ
৯৩।	গল্পপঞ্চাশৎ	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭০	ভাদ্র
৯৪।	একটি চড়ুইপাখী ও কালোমেয়ে	(উপন্যাস)	১৩৭০	আশ্বিন
৯৫।	আয়না	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭০	অগ্রহায়ণ
৯৬।	জঙ্গলগড়	(উপন্যাস)	১৩৭০	ফাল্গুন
৯৭।	মঞ্জুরী অপেরা	(”)	১৩৭১	বৈশাখ
৯৮।	চিন্ময়ী	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭১	„
৯৯।	সংকেত	(উপন্যাস)	১৩৭১	আষাঢ়
১০০।	ভুবনপুরের হাট	(„)	১৩৭১	„
১০১।	বসন্তরাগ	(„)	১৩৭১	অগ্রহায়ণ
১০২।	একটি প্রেমের গল্প	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭১	মাঘ
১০৩।	স্বর্গমর্ত্য	(উপন্যাস)	১৩৭২	জ্যৈষ্ঠ
১০৪।	গন্নাবেগম	(„)	১৩৭২	আষাঢ়
১০৫।	অরণ্যবহ্নি	(„)	১৩৭৩	বৈশাখ
১০৬।	হীরাপান্না	(„)	১৩৭৩	„

১০৭।	কিশোর সঞ্চয়ন	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭৩	জ্যৈষ্ঠ
১০৮।	মহানগরী	(উপন্যাস)	১৩৭৩	আষাঢ়
১০৯।	গুরুদক্ষিণা	(„)	১৩৭৩	শ্রাবণ
১১০।	তপোভঙ্গ	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭৩	অগ্রহায়ণ
১১১।	দীপার প্রেম	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭৪	অগ্রহায়ণ
১১২।	নারী রহস্যময়ী	(„)	১৩৭৪	শ্রাবণ
১১৩।	পঞ্চকন্যা	(„)	১৩৭৪	ভাদ্র
১১৪।	শুকসারী কথা	(উপন্যাস)	১৩৭৪	ভাদ্র
১১৫।	শিবানীর অদৃষ্ট	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭৪	„
১১৬।	শঙ্করীবাঈ	(উপন্যাস)	১৭৭৪	কার্তিক
১১৭।	আরোগ্যনিকেতন	(নাটক)	১৩৭৪	ফাল্গুন
১১৮।	গবিন সিংয়ের ঘোড়া	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭৪	„
১১৯।	জায়া	(„)	১৩৭৪	„
১২০।	এক পশলা	(„)	১৩৭৪	„
১২১।	মণিবউদি	(উপন্যাস)	১৩৭৪	শ্রাবন
১২২।	ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭৫	আশ্বিন
১২৩।	মিছিল	(„)	১৩৭৬	জ্যৈষ্ঠ
১২৪।	ছায়াপথ	(উপন্যাস)	১৩৭৬	আষাঢ়
১২৫।	কালরাত্রি	(„)	১৩৭৭	বৈশাখ
১২৬।	রূপসী বিহঙ্গিনী	(গল্পগ্রন্থ)	১৩৭৭	শ্রাবণ
১২৭।	অভিনেত্রী	(উপন্যাস)	১৩৭৭	পৌষ